ব্যাচেলর অব এডুকেশন

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষণ

Teaching Bangladesh and Global Studies

EDBN 1416

রচনা

প্রফেসর হোসনে আরা বেগম
প্রফেসর কানিজ সৈয়েদা বেন্তে সাবাহ
প্রফেসর কমর আরা সুলতানা
প্রফেসর লুৎফর রহমান
প্রফেসর ড. উম্মে আসমা
রওশন আরা বেগম
নাছিমা আক্তার

মূল্যায়ন

প্রফেসর ড. এম. এ মালেক
মো: শওকত আলী খান
খান মো: লুৎফুল কবীর

সম্পাদনা

প্রফেসর কমর আরা সুলতানা
নাছিমা আক্তার

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষণ
EDBN 1416
বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক
মোঃ জহির উদ্দিন বাবর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক
রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

সহযোগিতায়
প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই-২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রন: ডিসেম্বর ২০১৮
পুন:মুদ্রন: মার্চ ২০২০

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর– ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুন:মুদ্রন করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0108-3

মুদ্রণে:

সূচিপত্র

ইউনিট	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইউনিট-১	**মাধ্যমিক স্তরের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও বিষয়ের পরিসর**	১-৩০
১.১	সমন্বিত বিষয় হিসেবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এর ধারণা	০১
১.২	শিক্ষাক্রমের ধারণা	০২
১.৩	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি পাঠের প্রয়োজনীয়তা	০৩
১.৪	ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল	০৪
১.৫	ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে বিদ্যমান বিষয়বস্তু	১৪
১.৬	শ্রেণিভিত্তিক পাঠ পরিসর ও কাঠামো	২৪
১.৭	শ্রেণিভিত্তিক বিষয়বস্তুর শিখনফল ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার আলোকে চিহ্নিতকরণ	২৬
ইউনিট-২	**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল**	৩১-৪৪
২.১	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ, কার্যক্রম নির্বাচন ছক তৈরিকরণ (সামাজিক সমস্যা, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, বাংলাদেশের দুর্যোগ, রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন)।	৩১
২.২	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ, কার্যক্রম নির্বাচন ছক তৈরিকরণ (বাংলাদেশের জলবায়ু, জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সৌরজগত ইত্যাদি)	৩৪
২.৩	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পাঠ পরিচালনার জন্য উত্তম পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন	৩৮
ইউনিট-৩	**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠের বিষয়বস্তু**	৪৫-১৩৮
৩.১	পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের জাগরণ	৪৫
৩.২	বাংলাদেশের অভ্যুদয়	৫৬
৩.৩	বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ	৬০
৩.৪	বাংলাদেশের ভূমিরূপ ও জলবায়ু	৬৭
৩.৫	বাংলাদেশের নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৭৮
৩.৬	বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রশাসনিক কাঠামো	৯২
৩.৭	বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ	১০৮
৩.৮	বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি	১১৩
৩.৯	বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন	১১৯
৩.১০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১২৪
৩.১১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা, করণীয় ও মোকাবিলায় শ্রেণিভিত্তিক ধারণা প্রদান ও অনুশীলন	১২৮

ইউনিট	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইউনিট-৪	**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে কার্যকর পাঠ পরিকল্পনা**	১৩৯-১৫২
৪.১	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় পাঠের জন্য পাঠ পরিকল্পনা কাঠামো বা ছক	১৩৯
৪.২	বিষয়বস্তুভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন	১৪২
৪.৩	পাঠ পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনা	১৪৬
৪.৪	পাঠ পরিকল্পনা প্রয়োগ-ছদ্ম শিক্ষণ, অণুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন	১৪৭
ইউনিট-৫	**শিক্ষা উপকরণ**	১৫৩-১৬৭
৫.১	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণ	১৫৩
৫.২	উপকরণ হিসাবে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও ব্যবহার	১৫৮
৫.৩	সামাজিক মেলার পরিকল্পনা, আয়োজন ও পরিচালনা	১৬৩
ইউনিট-৬	**শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন**	১৬৮-১৮৪
৬.১	শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন	১৬৮
৬.২	একটি পাঠপরিকল্পনা কাঠামো পুনঃচিন্তন, দলীয় আলোচনা ও ফলাবর্তন প্রয়োগে ব্যবহারিক ও ফলপ্রসূ কাঠামোর উন্নয়ন	১৭১
৬.৩	বিষয় শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান	১৭৬
৬.৪	বিষয় শিক্ষক হিসেবে শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় একীভূত শিখনের প্রয়োগ	১৭৯
ইউনিট-৭	**বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জীবনদক্ষতার অনুশীলন**	১৮৫-১৯৮
৭.১	জীবন দক্ষতার ধারণা	১৮৬
৭.২	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ১০টি জীবন দক্ষতা	১৮৭
৭.৩	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোকে জীবনদক্ষতা চিহ্নিতকরণ ও অনুশীলন	১৮৮
ইউনিট-৮	**প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়ন**	১৯৫-২০৯
৮.১	মূল্যায়নের প্রাথমিক ধারণা	১৯৫
৮.২	ধারাবাহিক, মূল্য যাচাই, ক্ষেত্রসমূহ ও নম্বর বণ্টন এর প্রয়োগ অনুশীলন	১৯৭
৮.৩	বিষয়বস্তু অনুযায়ী সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিকরণ	১৯৯
৮.৪	বিষয়বস্তু অনুযায়ী বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তৈরিকরণ	২০১
৮.৫	সেমিস্টার পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মানবণ্টন	২০৩

ইউনিট ১ : মাধ্যমিক স্তরের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও বিষয়ের পরিসর

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি একটি সমন্বিত বিষয়। সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের গুরত্বপূর্ণ দিকসমূহ এই বিষয়ে সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এবং নবম-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নির্ধারিত। এছাড়াও নবম-দশম শ্রেণির বাণিজ্য শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নির্ধারিত রয়েছে। এ বিষয়ের উদ্দেশ্য অর্জনে বিষয়বস্তুর সম্যক জ্ঞান ও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগ আবশ্যক। এ বিষয়ের শিক্ষাক্রমে দেশের সমাজ জীবন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক বিষয়াবলি, সাংস্কৃতিক জীবন, ভৌগোলিক পরিবেশসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলোর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ নাগরিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়ার পাশাপাশি নিজেকে সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। এছাড়াও বৈশ্বিক বিষয়াবলির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্ব নাগরিকের দায়িত্ব পালনেও সমর্থ্য হবে। এই শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফলসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাসহ জীবনদক্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে।

এই ইউনিটে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হলো–

১.১ সমন্বিত বিষয় হিসেবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-এর ধারণা
১.২ শিক্ষাক্রমের ধারণা
১.৩ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি পাঠের প্রয়োজনীয়তা নিরুপণ
১.৪ ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল
১.৫ ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে বিদ্যমান বিষয়বস্তু
১.৬ শ্রেণিভিত্তিক পাঠ পরিসর ও কাঠামো
১.৭ শ্রেণিভিত্তিক বিষয়বস্তুর শিখনফল বেনজামিন এস ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যার আলোকে চিহ্নিতকরণ

১.১ সমন্বিত বিষয় হিসেবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-এর ধারণা

আমরা সবাই জানি মানুষ সামাজিক জীব। নিজের প্রয়োজনেই মানুষ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মানুষ শুধু নিজ রাষ্ট্রের নয় বরং বিশ্ব নাগরিক হিসাবে বসবাস করছে। সফল একজন বিশ্ব নাগরিকের নিজ দেশ সম্পর্কে যেমন বিস্তারিত জানা প্রয়োজন তেমনি সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা থাকাও আবশ্যক। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় নামে একটি বিষয় শিক্ষাক্রম বিষয় কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় প্রত্যেকটি আলাদাভাবে না পড়ে সবগুলো বিষয়ের সমন্বিত ধারণা লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিখন পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করবে।

'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' এর নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় শিক্ষাক্রম কাঠামোতে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির সাধারণ শিক্ষার সকল ধারা এবং নবম-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সমাজের সদস্য হিসাবে শিক্ষার্থীরা যাতে বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে নিজের, পরিবারের, সমাজের, জাতির সর্বোপরি মানব সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে সে বিবেচনায় বিষয়টির বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি সত্যিকার অর্থেই একটি সমন্বিত বিষয়। এ বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রমে এ দেশের সমাজ জীবন, দেশ ও জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধ, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবন, ভৌগোলিক পরিবেশসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে এ দেশের সম্পর্কগত অবস্থান ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলোর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করে নাগরিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা নিজেকে সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলারও সুযোগ পাবে।

একই সাথে বৈশ্বিক বিষয়াবলির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্মেষ ঘটিয়ে বিশ্ব নাগরিকের দায়িত্ব পালনেও সক্ষম হয়ে উঠবে। এছাড়াও এই শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাসহ জীবনদক্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে।

বর্তমান বিশ্বে মানুষকে কেবল নিজ দেশের নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করলেই চলে না বরং বিশ্ব নাগরিকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করতে হয়। এ দিকটি লক্ষ্য রেখে এ শিক্ষাক্রমে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। শিখনফলসমূহ নির্ধারণের পর সেগুলো অর্জন উপযোগী বিষয়বস্তু বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ বিষয়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভের সাথে সাথে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন এবং সামাজিক ও নান্দনিক গুনাবলিরও বিকাশ ঘটবে। এছাড়াও বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় শিক্ষার্থীকে পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব নাগরিকের কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলবে।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের শিক্ষাক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের দৃঢ় প্রত্যয়ী নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে প্রবেশ ও পরবর্তী শিক্ষাস্তরে প্রবেশের ভিত্তি গঠনে সহায়তা করা। এ বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ আলাদা আলাদা বিভাগে উপস্থাপনের রীতিকে অনুসরণ না করে সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করার ফলে এটি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিত বিষয়ে পরিগণিত হয়েছে যা শিক্ষার্থীর বা সামগ্রিক বিকাশকে Holistic development সহায়তা করবে।

১.২ শিক্ষাক্রমের ধারণা

ইংরেজি Curriculum শব্দটির বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে শিক্ষাক্রম। কারিকুলাম শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Currere হতে উদ্ভূত যার অর্থ দৌড়ানো বা ঘোড়দৌড়ের নির্দিষ্ট পথ। আভিধানিক অর্থে শিক্ষাক্রম বলতে বুঝায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য একটি শিক্ষাকার্যক্রম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মতো শিক্ষা বিজ্ঞান বেশি দিনের পুরোনো নয়। বিজ্ঞান হিসাবে শিক্ষা স্বীকৃতি পেয়েছে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ১৯৩০ সালের আগে শিক্ষার কোনো বিষয়ে গবেষণার তেমন কোনো শক্তিশালী তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে আলোচনায় আসে কারিকুলামের কথা। নিচে কয়েকজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিজ্ঞানীর প্রদত্ত শিক্ষাক্রম সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো। আমেরিকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ক্যাসওয়েল ও ক্যাম্পবেল (Caswell and Campbell, 1935) ১৯৩৫ সালে প্রথম শিক্ষাক্রমের একটি আধুনিক সংজ্ঞা দেন। তাঁদের মতে "শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীর অর্জিত সকল শিখন অভিজ্ঞতা"।

১৯৫৬ সালে রাফ টাইলর (Ralph Tylor) চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ প্রশ্ন চারটি হল-

- শিক্ষার উদ্দেশ্য কী?
- ঐ উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য কী কী শিখন অভিজ্ঞতা আবশ্যক?
- ঐ অভিজ্ঞতাগুলো কীভাবে সংগঠিত করা যায়?
- ঐ উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হলো কি না তা কীভাবে যাচাই করা যায়?

১৯৬২ সালে আমেরিকার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হিলদা তাবা (Hilda Taba) কারিকুলামের একটি সহজ অথচ কার্যকর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে 'শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা'।

১৯৭৩ সালে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ডেনিস লটন শিক্ষাক্রমের উপাদান নির্বাচনের ব্যাপারে সামাজিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি তাঁর সংজ্ঞায় 'শিক্ষাক্রমকে সমাজের কৃষ্টি থেকে নির্বাচন' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মূলত একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। শিক্ষাক্রম হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখা। এটিকে বলা হয় একটি শিক্ষাব্যবস্থার হৃৎপিণ্ড বা কেন্দ্রবিন্দু।

সমাজের পরিবর্তন ও চাহিদার প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্রমের পরিসরের ব্যাপকতা বাড়ে। শুধু শিখনফল নির্ধারণ নয় বরং এ শিখনফল কীভাবে অর্জিত হবে, শিখনফল অর্জনে কারা সহায়তা করবে, কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, কী কী কৌশল অবলম্বন করলে তা সহজে অর্জন করা যাবে-এর সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত।

শিক্ষাক্রমের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। এই লক্ষ্য জাতীয় দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ ও চাহিদা এবং উপকারভোগী বা অংশীজনদের প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়। এই লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষাক্রমে সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। যার উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। আবার বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয় শিখনফল। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে বিভিন্ন শিখনফল প্রণয়ন করা হয়। আবার শিখনফল অর্জনে শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম ব্যবহার করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা পরিমাপনে মূল্যায়নের যথোপযুক্ত কৌশল শিক্ষাক্রমে বর্ণিত থাকে। সুতরাং শিক্ষাক্রমের ধারণা ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অনেক দেশেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব শিক্ষাক্রম তৈরি করে থাকে। আবার অনেক দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষাক্রম তৈরি হয়ে থাকে। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) শিক্ষাক্রম তৈরি করে থাকে। তবে সবদেশেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

এক কথায় শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার সংবিধান। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য শিক্ষাক্রম থাকে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্তরভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাক্রম রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী দক্ষতা অর্জন করতে পারবে তা যেমন শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে তেমনি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাও শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল কী হবে তারও একটি দিক নির্দেশনা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত থাকে।

শিক্ষাক্রম পরিবর্তনশীল। বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ধারণার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাক্রমেও পরিবর্তন আনা হয়। তা না হলে শিক্ষাব্যবস্থাও সেকেলে হয়ে পড়ে। তাতে দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ গঠন করা সম্ভব হয় না। শুধু শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী করলেই চলবে না, তার ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

দলগত কাজ : শিক্ষাক্রমের ধারণার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জন্য একটি শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া ডিজাইন করেন।

১.৩ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি পাঠের প্রয়োজনীয়তা নিরুপণ

মাধ্যমিক স্তরে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণির সকল ধারার শিক্ষার্থীদের এটি একটি আবশ্যিক বিষয়। নবম ও দশম শ্রেণির বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিষয়টি আবশ্যিক একটি বিষয়। মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত বিষয় জানতে পারে। যেমন– মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, ভূগোল ও পরিবেশ, পৌরনীতি ও নাগরিকতা, অর্থনীতি-এ সকল বিষয়ের মাধ্যম একটি ধারণা লাভ করে। ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, ব্যবসায় উদ্যোগ, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে। বিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষার্থীদের পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং উচ্চতর গণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে তেমন কোনো বিষয়বস্তু নেই। ফলে এ বিষয়টি বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করে বাংলাদেশের নাগরিকের পাশাপাশি বিশ্ব নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত নানা বিষয়ে ধারণা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পেয়ে থাকে। তাছাড়া মাদ্‌রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যাতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে তার জন্যও বিষয়টি অত্যন্ত উপযোগী।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার সাথে সাথে অপরের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং এতে করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বার্থরক্ষায় সচেতন হবে। জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পাশাপাশি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান সম্পর্কে অবগত হয়ে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এছাড়া পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ ভূমিকা পালনে সচেতন হবে এবং সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে সমাজে ভূমিকা রাখতে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হবে। পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানার সাথে সাথে সৌরজগৎ ও গ্রহসমূহের অবস্থান সম্পর্কেও জানতে পারবে। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ পরিবেশ সম্পর্কে জেনে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও অভিযোজনে সক্ষম হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে জেনে দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ হবে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা জেনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। জঙ্গিবাদ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে-পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এ ধরনের অনেক বিষয় বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি পাঠের ফলে এ স্তরের শিক্ষার্থীরা -

- বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হবে
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে
- পরিবেশ সচেতনা অর্জন করবে
- সামাজিক ও নান্দনিক গুণাবলি সম্পন্ন হয়ে উঠবে
- পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে কার্যকর ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ হবে
- আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী হবে
- প্রত্যয়ী নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে
- পরবর্তী শিক্ষা জীবন ও কর্মজগতে প্রবেশের ভিত্তি খুঁজে পাবে
- ঐক্যবোধে ও দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হবে
- সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা জেনে নিজেকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলবে
- কোনোটি সমাজ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য আর কোনোটি অগ্রহণযোগ্য তা উপলব্ধি করে নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত হবে
- সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে
- সমাজে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করতে সক্ষম হবে
- কায়িক শ্রমের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে
- বিশ্ব নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হবে
- বিশ্ব নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হবে
- বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠবে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি শিক্ষার্থীদের এইসব বিষয় অবহিত ও আত্মস্থ করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষে পরিণত করার ক্ষেত্রে অশেষ ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষার্থীদের মার্জিত রুচিবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের সাথে সাথে সামাজিকীকরণেও বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই বিষয় হিসাবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক ও অনস্বীকার্য।

১.৪ ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল

শিক্ষাক্রম হলো কোনো স্তর বা বিষয়ের শিক্ষার সার্বিক পরিকল্পনা। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন কৌশল শিক্ষাক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমেও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধসম্পন্ন দেশাত্ববোধে জাগ্রত নাগরিক তৈরি এবং বৈশ্বিক বিষয়াবলির সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা যা তাদের জানার জগৎকে সমৃদ্ধ করবে। এই শিক্ষাক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে তারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতার অধিকারি হবে। এ লক্ষ্যে পৌছাতে ষষ্ঠ-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষাক্রমকে দুটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষাক্রম এবং নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রম এ দুটি স্তরের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য

ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি সাধারণ, মাদ্‌রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থী সকলের জন্য আবশ্যিক বিষয়। এ বিষয়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের প্রত্যয়ী নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা এবং তাদের কর্মজীবনে প্রবেশ ও পরবর্তী শিক্ষা স্তরে প্রবেশের ভিত্তি গঠনে সহায়তা করা।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক ২০টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যগুলো পূরণ হলে বিষয়ের লক্ষ্য অর্জিত হবে।

ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যগুলো হলো -

- মানব সমাজের বিবর্তন ধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- মহান ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ তৈরি, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, বৈষম্যহীন সমাজ ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া।
- সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানা এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর সাথে পরিচিত হওয়া এবং এসব সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া
- বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ওপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করা
- অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, কার্যক্রম ও উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে এর পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি এবং সুনাগরিকের গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- বাংলাদেশের সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সুশাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা
- আন্তঃমহাদেশীয় ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বাস্তবসম্মত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর ও উন্নয়ন করার উপায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- পরিবেশের উপর বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এর প্রভাব প্রতিরোধের জীবনদক্ষতা অর্জন করা
- জাতীয় প্রেক্ষিতে শিশু, নারী, প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার ও উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করা
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যার কারণ ও প্রভাব মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হওয়া
- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি এবং কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকসংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জানা এবং এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া
- বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া
- মানবিক, সামাজিক, নৈতিক ও গণতান্তিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সুস্থ ধারার সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হওয়া
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন করা

শিখনফল

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় শিক্ষাক্রমে ২২টি প্রান্তিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায় যে, অষ্টম শ্রেণির শেষে শিক্ষার্থীরা এই শিখনফলগুলো অর্জন করবে। এজন্য শিক্ষাক্রমে এগুলোকে প্রান্তিক শিখনফল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে এই প্রান্তিক শিখনফলগুলো শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে। অর্জনযোগ্য এই প্রান্তিক শিখনফলগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

- মানব সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা এবং এ বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও ব্রিটিশ আমলে বাংলার ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলার মানুষের উৎসের ইতিহাস ও বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক জীবনধারা বর্ণনা করতে পারবে
- বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে গর্ববোধ করবে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে লালন করতে পারবে

- বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানবে এবং ব্যক্তিগত সামাজিক জীবনধারায় নিজস্ব সংস্কৃতিকে লালন করবে
- বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বর্ণনা করতে পারবে এবং এগুলো সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে ও গর্ববোধ করবে
- বাংলাদেশের প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবে এবং জনজীবনে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে
- বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারা, প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবে এবং জাতীয়- আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে এর পারস্পরিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে
- বাংলাদেশের রাষ্ট্র, নাগরিকের ধারণা, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি, নাগরিকের ভূমিকা ও সুনাগরিকের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবে এবং বাস্তব জীবনে তা অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে
- বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সরকার এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং সুশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে
- আন্তঃমহাদেশীয় ভৌগোলিক অবস্থা ও এর পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে গুরুত্ব
- দৈশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং বাস্তবসম্মত নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর ও উন্নয়নের উপায় চিহ্নিত করতে পারবে
- পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে এবং তা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ হবে
- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিপর্যয়, এগুলোর কার্যকারণ সম্পর্ক ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং প্রতিরোধ ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অভিযোজনের দক্ষতা অর্জন করবে
- জাতীয় প্রেক্ষিতে শিশু, নারী, প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং এদের উন্নয়নে গুরুত্বসহকারে অবদান রাখতে পারবে
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যার প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং এর প্রতিরোধে জীবনদক্ষতা অর্জন করবে
- কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং এগুলোর সাথে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা মূল্যায়ন করতে পারবে
- বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে এবং জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে গর্ববোধ করবে
- বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ করবে ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবে
- বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং এদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে
- মানবিক, সামাজিক, নৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সুস্থ ধারার সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে
- বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্য উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করবে

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধসম্পন্ন দেশাত্মবোধ জাগ্রত নাগরিক হিসাবে তৈরি এবং বৈশ্বিক বিষয়াবলির সাথে তাদের পরিচিত করা, যা তাদের জানার জগৎকে সমৃদ্ধ করবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমে এ স্তরের জন্য ১২টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যগুলো হলো

- বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করতে পারা এবং জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া।
- বাংলাদেশের অভ্যুদয় পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
- বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোয় সামাজিকীকরণের গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা এবং আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
- সৌরজগতের শৃঙ্খলাভিত্তিক গতিশীলতা এবং ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা লাভের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে শৃঙ্খলাবোধ, সময় নির্ণয়, পরিবেশের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হওয়া।
- বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জলবায়ু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও ঝুঁকি হ্রাসে সচেতন হওয়া।
- বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীর গতিপথ ও জনজীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে জানা এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সংরক্ষণে সচেতন হওয়া।
- বাংলাদেশসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে সম্পদ সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন করা ।
- বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ, প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যাবলি, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নাগরিকের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে অবহিত হয়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্তব্যবোধে সচেতন হওয়া।
- বাংলাদেশের প্রচলিত কতিপয় আইন ও আইনের বিধিবিধান সম্পর্কে জানা এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
- বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাতিসঙ্ঘ এবং জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বিশ্বশান্তির পক্ষে অবস্থান প্রকাশ করতে পারা।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিষয়াদি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ধারণা অনুধাবন এবং ব্যবহারিক জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে অর্জিত জ্ঞান ও প্রয়োগের দক্ষতা লাভ করা।
- বাংলাদেশ ও বিশ্বের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে দেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যা অনুধাবন করা এবং মোকাবিলায় জীবনদক্ষতা প্রয়োগ করতে পারা।

শিখনফল

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য অর্জনে নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমে ১৫টি ইউনিট নির্ধারণ করা হয়েছে। অধ্যায় ও বিষয়বস্তু শিরোনাম অনুযায়ী শিখনফল নিম্নে ছকে উল্লেখ করা হলো–

অধ্যায়	শিখনফল
পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭–১৯৭০)	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে ৩. জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে ৪. আওয়ামী মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৫. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে ৬. ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগে রূপান্তরের কারণ ৭. ১৯৫৮পূর্ব রাজনৈতিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে ৮. ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবে ৯. পূর্ব বাংলার প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে ১০. তৎকালীন রাজনীতিতে ৬ দফার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে

অধ্যায়	শিখনফল
	১১. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে ১২. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে ১৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে গণআন্দোলনের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে ১৪. ১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে এর প্রভাব ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে **আবেগীয়** ১. নিজ ও অপরের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ২. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে ৩. দেশের স্বার্থরক্ষায় সচেতন হবে
স্বাধীন বাংলাদেশ	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে ২. স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনায় অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে ৩. মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র, পেশাজীবী, নারী, গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে ৪. স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে ৫. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে ৬. মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে ৭. যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনঃগঠন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে পারবে ৮. ১৯৭২ এর সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবে ৯. ১৯৭৫ সালে জাতির জনক ও চার জাতীয় নেতার হত্যা ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বর্ণনা করতে পারবে ১০. ১৯৭৫ পরবর্তী সামরিক শাসনের উত্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে ১১. ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যা এবং পরবর্তী নির্বাচন বর্ণনা করতে পারবে ১২. ১৯৮২ সালের এরশাদের সামরিক শাসন ও তার প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে ১৩. ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং গণতন্ত্রর পুনঃযাত্রার বর্ণনা করতে পারবে ১৪. বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা বর্ণনা করতে পারবে **আবেগীয়** ১. দেশের প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে ২. জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ৩. সামরিক শাসনের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে ৪. গণতন্ত্রর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে
বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৩. পরিবারের সাধারণ কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে ৪. বাংলাদেশের পরিবারের (গ্রাম ও শহরে) ধরন ও ভূমিকার পরিবর্তনের কারণ এবং সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে ৫. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রতি পরিবারের ভূমিকা ও মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে ৬. সামাজিকীকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৭. সামাজিকীকরণের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৮. বাংলাদেশের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে

অধ্যায়	শিখনফল
	৯. আধুনিক বাংলাদেশে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে ১০. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে **আবেগীয়** ১. পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ ভূমিকা পালনে সচেতন হবে ২. ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে সমাজে ভূমিকা রাখতে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হবে
সৌরজগৎ ও ভূমন্ডল	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. সৌরজগতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. সৌরজগতের গ্রহগুলোর বর্ণনা করতে পারবে ৩. পৃথিবীতে জীব বসবাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৪. ভূ-অভন্তরের গঠন বর্ণনা করতে পারবে ৫. নিরক্ষরেখা, সমক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা, মূল মধ্যরেখা, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৬. বিশ্বের সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখাগুলোর ভূমিকা নির্ণয় করতে পারবে ৭. বাংলাদেশ ও পৃথিবীর যে কোনো দেশের সময়ের পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা এবং সময় নির্ণয় করতে পারবে ৮. পৃথিবীর গতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৯. আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ধারণার ব্যাখ্যা এবং পৃথিবীর ওপর এই গতির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে ১০. দিবা–রাত্রির হ্রাস–বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ১১. পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ১২. বার্ষিক গতির সাথে বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে ১৩. জোয়ার–ভাটার ধারণা, কারণ ও শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবে ১৪. পৃথিবীর ওপর জোয়ার–ভাটার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে **মনোপেশিজ** ১. সৌরজগৎ ও গ্রহসমূহের অবস্থান আঁকতে পারবে ২. বিভিন্ন রেখার অবস্থানিক চিত্র আঁকতে পারবে ৩. নতুন পরিস্থিতিতে গাণিতিক জ্ঞান প্রয়োগ করে সময় নির্ণয় করতে পারবে ৪. পরিবেশের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও অভিযোজনে সক্ষম হবে
বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা বর্ণনা করতে পারবে ২. বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করতে পারবে ৩. বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবে ৪. ভূপ্রাকৃতিক গঠন কিভাবে জনসংখ্যার (জনবসতি) বিস্তরণে প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে ৫. বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের উপর জনবসতি বিস্তারের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে ৬. বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের (ভারত, মায়ানমার ও নেপাল) জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের তুলনা করতে পারবে ৭. বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে ৮. বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে ৯. ভূমিকম্পের ধারণা ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে

অধ্যায়	শিখনফল
	১০. বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত কয়েকটি দেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবে ১১. বাংলাদেশকে ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ১২. ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবে **আবেগীয়** ১. পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে **আবেগীয় ও মনোপেশিজ** ১. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সচেতন হবে এবং অভিযোজনে সক্ষমতালাভ করবে ২. ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে
বাংলাদেশের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. বাংলাদেশের প্রধান নদ–নদীগুলির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র ও পশুর) উৎপত্তিস্থল, প্রবাহপথের বিবরণ দিতে পারবে এবং এগুলো সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে ২. নদ-নদী ও জনবসতির নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৩. বাংলাদেশের কোনো কোনো অংশে পানির অভাবের কারণ এবং সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের নদীর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে ৪. বাংলাদেশের কোনো কোনো অংশে পানির অভাবের কারণে সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং সমাধানে মতামত ব্যাখ্যা করতে পারবে ৫. যাতায়াত, জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে ৬. প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৭. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের (খনিজ, বনজ, কৃষিজ, পানি-সমুদ্র সম্পদ) সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের (ভারত, মায়ানমার, নেপাল) প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনা করতে পারবে ৮. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৯. বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে ১০. বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবে ১১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসব সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে **আবেগীয়** ১. পানির অভাব দূরীকরণে নদী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে ২. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন হবে
রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. রাষ্ট্রের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. নাগরিকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. আইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৬. আইনের উৎস ব্যাখ্যা করতে পারবে ৭. সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৮. বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ বর্ণনা করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে সচেতন হবে **আবেগীয়** ১. নাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্বপালনে উদ্বুদ্ধ হবে

অধ্যায়	শিখনফল
বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে ৩. জাতীয় সংসদ এবং এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে ৪. জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৫. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে ৬. জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৭. বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে ৮. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে ৯. বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে ১০. বাংলাদেশের উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে **আবেগীয়** ১. অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে
বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. গণতন্ত্রর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে ৩. রাজনৈতিক দলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৪. বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৫. গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে ৬. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে ৭. বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৮. নির্বাচনী আচরণ বিধি বর্ণনা করতে পারবে ৯. নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘন করার শাস্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে **আবেগীয়** ১০. গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন সম্পর্কে অবগত হয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে আগ্রহী হবে
জাতিসঙ্ঘ ও বাংলাদেশ	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে ২. বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা বাখ্যা করতে পারবে ৩. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৪. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে **আবেগীয়** ১. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বণ্টন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবে ৩. বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে ৪. বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করতে পারবে ৫. বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে

অধ্যায়	শিখনফল
	আবেগীয় ১. সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয়রোধে সচেতন হবে ২. বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে
অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি), দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মাথাপিছু আয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. জিএনপি ও জিডিপি-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে ৩. দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারবে ৪. কয়েকটি দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা করতে পারবে ৫. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৬. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৭. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের পদক্ষেপসমূহ ব্যখ্যা করতে পারবে ৮. উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৯. উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ১০. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে **আবেগীয়** ১. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেতন হবে। **মনোপেশিজ** ১. ক্ষুদ্র পরিসরে জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয় হাতে-কলমে বের করতে পারবে।
বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৩. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৪. বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণা, ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে ৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে ৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে ৭. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে **আবেগীয়** ১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে
বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৩. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে ৪. বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে ৫. সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বাংলাদেশে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবে **আবেগীয়** ১. সামাজিক পরিবর্তনজনিত বিষয়ে সচেতন হবে **মনোপেশিজ** ১. সামাজিক পরিবর্তন জনিত অবস্থায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হবে

অধ্যায়	শিখনফল
বাংলাদেশের কতিপয় সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইনের বিধি বিধান	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. সামাজিক সমস্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২. সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ৩. বাংলাদেশে সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে ৪. সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রতিরোধ পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে পারবে ৫. 'নারীর প্রতি সহিংসতা'- ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে ৬. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ৭. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে ৮. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতারোধে আইনের বিষয়বস্তু ও শাস্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে ৯. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতারোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে ১০. শিশুশ্রম ও কিশোর অপরাধের ধারণা, ধরন ও আইনি প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে ১১. মাতৃকল্যাণের ধারণা ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে ১২. এইচ আই ভি এইডসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ১৩. এইচ আই ভি এইডসের পরিস্থিতি ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ১৪. এইচ আই ভি এইডসের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং প্রতিরোধ কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে ১৫. সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ১৬. বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবে ১৭. সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে ১৮. দুর্ঘটনামুক্ত বা নিরাপদ সড়ক করার উপায় এবং দুর্ঘটনা হ্রাসের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবে ১৯. জঙ্গিবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২০. জঙ্গিবাদের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে ২১. জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ-পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে পারবে ২২. দুর্নীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ২৩. দুর্নীতির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ২৪. দুর্নীতির প্রভাব ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে **আবেগীয়** ২৫. নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতন হবে ২৬. এইচ আই ভি এইড সম্পর্কে সচেতন হবে এবং আক্রান্ত রোগীর সেবায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে ২৭. দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতন হবে ২৮. ধর্মীয় আদর্শজীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যাবলি পূরণ করতে হবে। উদ্দেশ্যগুলোকে আবার অর্জন ও মূল্যায়নযোগ্য ধরে নির্ধারণ করা হয়েছে শিখনফল। এই শিখনফল মূল্যায়নে ব্যবহার করা হবে।

১.৫ ৬ষ্ঠ -১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে বিদ্যমান বিষয়বস্তু

ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণির শিখনফলসমূহ অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তুর শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক লেখকগণ এই শিরোনামের বিষয়সমূহ শিখনফলের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকটি পাঠ করার মাধ্যমে নির্ধারিত শিখনফলসমূহ অর্জনে সক্ষম হবে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে ষষ্ঠ হতে নবম-দশম শ্রেণির অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তুর শিরোনাম উল্লেখ করা হলো–

ষষ্ঠ শ্রেণি

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
প্রথম অধ্যায় : সমাজের কথা	• মানব সমাজের ধারণা • সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর- ➢ শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজ ➢ উদ্যান কৃষিভিত্তিক ও পশুপালনভিত্তিক সমাজ ➢ কৃষিভিত্তিক সমাজ ➢ শিল্পভিত্তিক ও শিল্পোত্তর সমাজ • সমাজজীবনে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব • বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতি
দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ও বাংলার মানুষ	পরিচ্ছেদ- ১ : প্রাচীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা • প্রাচীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা • প্রচীন যুগের রাজনৈতিক জীবন • মধ্য ও আধুনিক যুগের রাজনৈতিক জীবন পরিচ্ছেদ- ২ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ • বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাধারণ ধারণা পরিচ্ছেদ- ৩ : বাংলাদেশ ও বাংলার মানুষের উৎস • বাংলা নামের দেশটির জন্ম • বাংলার মানুষের উৎস পরিচ্ছেদ- ৪ : বাংলাদেশ ও বিশ্বের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা • প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি • প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতা • ভারত ও বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা
তৃতীয় অধ্যায় : প্রাচীন বাংলার জীবনধারা	• পালযুগ-পূর্ব বাংলার মানুষের সমাজধারা • প্রাচীন বাংলার আদি জীবনধারার • পাল যুগের সমাজিক ও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন • সেনযুগে বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন
চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশের সংস্কৃতির পরিচয়	• সংস্কৃতির ধারণা • বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য • বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন • বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান • ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
পঞ্চম অধ্যায় : সমাজে শিশুর বেড়ে ওঠা	• সমাজ কাঠামো • বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো • সমাজ কাঠামোর উপাদান • সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া • সমাজজীবনে সামাজিকীকরণের প্রভাব • সামাজিকীকরণের মাধ্যম যেমন- পরিবার, প্রতিবেশী, বিদ্যালয় খেলা ও পড়ার সাথী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিনোদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম
ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলাদেশের অর্থনীতি	• বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারা • গ্রামীণ ও শহরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা • বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহ • বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন • বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা • উন্নয়নের পূর্বশর্ত : দক্ষ জনশক্তি
সপ্তম অধ্যায় : বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	• রাষ্টের ধারণা • রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ • নাগরিকের ধারণা • নাগরিকতার ধারণা • নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি • বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (বাংলাদেশ, আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা) • দেশের উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা
অষ্টম অধ্যায় : বিশ্ব ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ	• এশিয়া মহাদেশের পরিচয় • বিশ্ব পরিমণ্ডলে এশিয়া মহাদেশ ও এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান • মহাসাগরগুলোর অবস্থান ও গুরুত্ব
নবম অধ্যায় : বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি	• জনমিতিক ধারণা • জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান • জন্ম মৃত্যু ও স্থানান্তর গমনের কারণ ও প্রভাব
দশম অধ্যায় : বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা	• পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক • পরিবেশগত সমস্যাসমূহের কারণ • পরিবেশগত সমস্যাসমূহের প্রভাব • পরিবেশগত সমস্যার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
একাদশ অধ্যায় : বাংলাদেশে শিশু অধিকার	• শিশু অধিকারের ধারণা ও • জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত 'শিশু অধিকার সনদ' অনুযায়ী শিশু অধিকারসমূহ • বাংলাদেশে শিশু অধিকারের পরিস্থিতি • শিশু অধিকারের উপর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত
দ্বাদশ অধ্যায় : শিশুর বেড়ে ওঠায় প্রতিবন্ধকতা	• শিশু শ্রমের ধারণা, কারণ ও প্রভাব • শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব • শ্রমজীবী শিশুর প্রতি আমাদের মনোভাব
ত্রয়োদশ অধ্যায় : আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি	• আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব • আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র • বিশ্বের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা • সার্কের গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

সপ্তম শ্রেণি

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম	• রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন • যুক্তফ্রন্ট • উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান • ১৯৭০ সালের নির্বাচন • পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য
দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	• বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ধারণা • বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি • বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন উপাদান • বাংলাদেশের নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি • জাতীয় সংস্কৃতি ও লোক সংস্কৃতির সম্পর্ক
তৃতীয় অধ্যায় : পরিবারে শিশুর বেড়ে ওঠা	• পরিবারের ধারণা ও ধরন • বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের পরিবার • পরিবর্তনশীল পরিবার ও সামাজিকীকরণ • শিশুর সামাজিকীকরণ ও পরিবারের সদস্য ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভূমিকা
চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশের অর্থনীতি	• বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি • বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান • বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি • কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প
পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	• সুনাগরিকের গুণাবলি • বাংলাদেশে সুনাগরিকের প্রতিবন্ধকতা • বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুনাগরিকের গুরুত্ব • নাগরিকের অধিকার অর্জন ও দায়িত্ব পালন
ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা	• নির্বাচনের ধারণা, গুরুত্বও পদ্ধতি • বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া • বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের গুরুত্ব • নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনি এলাকা, নির্বাচনি আচরণবিধি • ভোট ও ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম
সপ্তম অধ্যায় : বাংলাদেশের জলবায়ু	• বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি • বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ • জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট দুর্যোগ • আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলা
অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি	• বাংলাদেশসহ কতিপয় দেশের জনসংখ্যার তুলনা • জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা • বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও ফলাফল • বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুর পরিস্থিতি • বাংলাদেশে জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ • বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, প্রভাব ও সমাধান

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
নবম অধ্যায় : বাংলাদেশে নারী অধিকার	• নারী অধিকারের ধারণা এবং বাংলাদেশের সমাজে নারীর অবস্থান • বাংলাদেশে নারী অধিকারের গুরুত্ব ও নারী অধিকারসমূহ • নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপসমূহ
দশম অধ্যায় : বাংলাদেশে প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার	• প্রবীণ অধিকারের ধারণা ও প্রবীণদের অধিকারসমূহ • প্রবীণদের সমস্যাসমূহ • অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রবীণদের অধিকারের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত • বাংলাদেশে প্রবীণ কল্যাণ কার্যক্রম
একাদশ অধ্যায় : বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	• যৌতুকের ধারণা, কারণ ও প্রভাব • যৌতুক নিরোধ আইন যৌন • যৌতুক প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন • বাল্যবিবাহের ধারণা ও কারণ • বাল্যবিবাহের প্রভাব, প্রতিরোধ ও আইন • যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়নের ধারণা ও কারণ • যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়নের ক্ষতিকর প্রভাব এবং এ অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা রাখার উপায়
দ্বাদশ অধ্যায় : আন্তর্জাতিকসহযোগিতা	• আন্তর্জাতিক সহযোগিতা : ধারণা ও গুরুত্ব • জাতিসংঘ ও এর গঠন • জাতিসংঘ ও এর গঠনের উদ্দেশ্য ও মৌলিক নীতি • জাতিসংঘের কাজ • বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা • বিশ্ব শান্তি রক্ষীবাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা

অষ্টম শ্রেণি

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	(ক) গঠন পর্ব (৮) • ১৯৭০-এর নির্বাচনোত্তর প্রতিক্রিয়া • ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও বাঙালির স্বাধীনতার প্রস্তুতি • ২৫ মার্চের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ • ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা (খ) পরিচালনা পর্ব (৯) • মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও অস্থায়ী সরকার গঠন • মুক্তিবাহিনীর গঠন • সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা • মুক্তিযুদ্ধে দেশি ও বিদেশি সহযোগিতা • যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে চূড়ান্তযুদ্ধ • গণহত্যা ও নির্যাতন • পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের • মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য
দ্বিতীয় অধ্যায় : ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম	• বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমি • ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ ও ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব • ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলন • পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন	• সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ধারণা • সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য • সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের দিক • বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন
চতুর্থ অধ্যায় : ঔপনিবেশিক যুগে প্রত্ন পরিচয়	• প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নসম্পদ • ঢাকা ও অন্যান্য এলাকার প্রত্নক্ষেত্র -ধর্মীয় ইমারত (মসজিদ, সমাধি, মন্দির ইত্যাদি), লৌকিক ইমারত (প্রাসাদ, প্রাশাসনিক ইমারত, পানামনগর-সোনারগাঁও, সরদারবাড়ি-সোনারগাঁও, জমিদারদের গড়া ইমারত ইত্যাদি) • বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ
পঞ্চম অধ্যায় : সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন	• সামাজিকীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের প্রভাব • বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার • সামাজিকীকরণে তথ্য প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের ভূমিকা • বিশ্বায়ন ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া
ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলাদেশের অর্থনীতি	• মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি), মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) ও মাথাপিছু আয় • বাংলাদেশের অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য খাতের জিডিপিতে অবদান • মানব উন্নয়ন সূচক • মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশের তুলনা • বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য খাত • অর্থনীতিতে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্সের প্রভাব
সপ্তম অধ্যায় : বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা	• সরকারের শ্রেণিবিভাগ • বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি • বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি • বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য • বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও কাজ • স্থানীয় সরকার কাঠামো • সরকার পরিচালনায় সুশাসন
অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশে দুর্যোগ	• বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা • বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ ও প্রভাব • দুর্যোগের ধারণা • দুর্যোগের ধরন • বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যথা- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি • প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ • বাংলাদেশের জীবন ও অর্থনীতির উপর এ সব দুর্যোগের প্রভাব • দুর্যোগ প্রতিরোধ করণীয়
নবম অধ্যায় : বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন	• বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি • জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ • জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক • জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর কৌশল

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
দশম অধ্যায় : বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	• কিশোর অপরাধ : কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ • মাদকাসক্তি : কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ ভৌগোলিক
একাদশ অধ্যায় : বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-জাতিগোষ্ঠী	• বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান • বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা • বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সাথে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ • বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠী ও বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান • বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃ-জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ
দ্বাদশ অধ্যায় : বাংলাদেশের সম্পদ	• বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ: বনজ, জলজ, কৃষিজ, খনিজ ও মৎস্য • প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সম্পর্ক • বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য • বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প- পাট, বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট, ঔষধ, গামের্ন্টস, চিংড়ি, চা, চামড়া, তুলা, তামাক ইত্যাদি • বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব শিল্পের অবদান
ত্রয়োদশ অধ্যায় : বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা	• আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব • ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ফাও এবং ইউএনএফপি-এর গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম • আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়নে এসব সংস্থার ভূমিকা

নবম-দশম শ্রেণি

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
প্রথম অধ্যায় : পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭-১৯৭০)	**বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন** • ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ • আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি ও জাতিসঙ্ঘ • বাঙালি জাতীয়তাবাদে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা • আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন • যুক্তফ্রন্ট গঠন, নির্বাচন ও সরকার সামরিক শাসন ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ (১৯৫৮–৭০) • ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন • ৬ দফা মুক্তির সনদ • ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা • ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান • সত্তরের নির্বাচন ও পরবর্তী ঘটনা

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
দ্বিতীয় অধ্যায় : ২ স্বাধীন বাংলাদেশ	**মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়** ● ৭ই মার্চ ও স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা ● মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম ● মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও পেশাজীবীদের ভূমিকা ● স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান ● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও চার জাতীয় নেতাসহ অন্যান্য ● মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব জনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা ● মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য **স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও মুজিব শাসন আমল** ● যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠন প্রক্রিয়া ● ১৯৭২ এর সংবিধান প্রণয়ন পটভূমি ● ১৯৭৫ এর জাতির জনকসহ অন্যান্য হত্যাকাণ্ড **সামরিক শাসনামল (১৯৭৫-১৯৯০)** ● জেনারেল জিয়ার শাসনামল (১৯৭৫-৮১) ● জেনারেল এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-৯০) **গণতন্ত্রর পুনঃযাত্রাকাল** ● ১৯৯০ এর গণ অভ্যুত্থান ও গণতন্ত্রর পুনঃযাত্রা ● বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ	**বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো** ● পরিবারের ধারণা ● পরিবারের প্রকারভেদ ● পরিবারের সাধারণ কার্যাবলি ● বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের পরিবারের ভূমিকা **সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া** ● সামাজিকীকরণের ধারণা ● সামাজিকীকরণের উপাদান ● সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ● বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ● বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজে সামাজিকীকরণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য
চতুর্থ অধ্যায় : সৌরজগৎ ও ভূমন্ডল	**সৌরজগৎ** ● সৌরজগতের ধারণা ● সৌরজগতের গ্রহসমূহ ● পৃথিবীতে জীব বসবাসের কারণ ● ভূ-অভন্তরের গঠন **বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ণয় পদ্ধতি** ● নিরক্ষরেখা, সমাক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা, মূল মধ্যরেখা, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ● সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখার ভূমিকা **পৃথিবীর গতি** ● পৃথিবীর গতির ধারণা ● আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ধারণা ও এর প্রভাব। ● দিবা–রাত্রির হ্রাস–বৃদ্ধির কারণ ● পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ ● বার্ষিক গতি ও বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তন

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
	জোয়ার–ভাটা ● জোয়ার-ভাটার ধারণা, কারণ, শ্রেণিবিভাগ ● পৃথিবীর ওপর জোয়ার–ভাটার প্রভাব
পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু	**বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি** ● ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা ● ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও গঠন ● বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির গঠন ও জনসংখ্যা ● বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারে জনবসতি বিস্তারের প্রভাব **বাংলাদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ** ● বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জলবায়ু ● বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব ● ভূমিকম্পের ধারণা ও কারণ ● বিশ্বের ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল ও বাংলাদেশ ● ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।
ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলাদেশের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ	**বাংলাদেশের নদ-নদী ও পানি সম্পদ** ● বাংলাদেশের প্রধান নদ–নদীগুলির উৎপত্তিস্থল ও প্রবাহপথ ● নদ-নদী ও জনবসতির পারস্পরিক সম্পর্ক ● বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে পানির অভাবের কারণ, প্রভাব ও সমাধান পদক্ষেপ ● যাতায়াত, জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীর পথের ভূমিকা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ● প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা ● বাংলাদেশের ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ● পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা ● বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ● বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ ● বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব
সপ্তম অধ্যায় : রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন	● রাষ্ট্রের ধারণা ● রাষ্ট্রের কার্যাবলি ● নাগরিকের ধারণা ● নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ● আইনের ধারণা ● আইনের উৎস ● সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা ● বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ
অষ্টম অধ্যায় : বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা	বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গসমূহ : নির্বাহী বা শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ ● নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ● রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি ● আইন বিভাগ ● জাতীয় সংসদ এবং এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি ● জাতীয় সংসদ কর্তৃক শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ● বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ● অধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকা

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
	বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ● কেন্দ্রীয় প্রশাসন ● বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন ও কার্যাবলি ● বাংলাদেশের উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব
নবম অধ্যায় : বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন	● গণতন্ত্রর ধারণা ● বাংলাদেশের গণতন্ত্র ● রাজনৈতিক দল ● গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ● গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক ● বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ● নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কাজ ● নির্বাচনী আচরণ বিধি ● নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘন করার শাস্তি
দশম অধ্যায় : জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ	● জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি ● বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা ● নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা ● জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা
একাদশ অধ্যায় : জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	● জাতীয় সম্পদের ধারণা ● বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বণ্টন ● জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয়রোধ ● বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টন ● ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ● সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ● মিশ্র অর্থনীতি ● ইসলামি অর্থনীতি ● বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
দ্বাদশ অধ্যায় : অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি	**অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ** ● মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি), ● দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ● মাথাপিছু আয়ের ধারণা ● দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহ ● কয়েকটি দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা **বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি** ● বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ ● বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ ● বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ ● উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ ও এসব দেশের অর্থনীতি ● উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক
ত্রয়োদশ অধ্যায় : বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা	● সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা ● বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস ● বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাত ● বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণা ও ধরন ● বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি ● বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি ● দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাকের ভূমিকা

অধ্যায়	বিষয়বস্তু
চতুর্দশ অধ্যায় : বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন	• সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা • বাংলাদেশের সামাজ পরিবর্তনের উপাদান এবং এর প্রভাব • সামাজিক পরিবর্তন ও নারীর ভূমিকা
পঞ্চদশ অধ্যায় : বাংলাদেশের কতিপয় সামাজিক সমস্যা ও এর প্রতিকার বিধান	**সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয়** • সামাজিক সমস্যার ধারণা • সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ধারণা • সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণ • সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রভাব • সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রতিরোধ পদক্ষেপ নারীর প্রতি সহিংসতা • নারীর প্রতি সহিংসতা-ধারণা • নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি • নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ • নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব • নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের পদক্ষেপসমূহ • শিশুশ্রম, কিশোর অপরাধ ও মাতৃকল্যাণ-এর ধারণা, আইনি সুবিধা এইচআইভিএইডস • এইচআইভিএইডস ধারণা • বাংলাদেশে এইচআইভিএইডস পরিস্থিতি • এইচআইভিএইডসের কারণ • এইচআইভিএইডসের প্রভাব ও প্রতিরোধ কার্যক্রম **সড়ক দুর্ঘটনা** • সড়ক দুর্ঘটনার কারণ • বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি • সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব • নিরাপদ সড়ক করার উপায় এবং দুর্ঘটনা হ্রাসের পদক্ষেপ • প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা • ভিডিও প্রদর্শন • (জঙ্গিবাদী তৎপরতার ভয়ংকর ভিডিও ডুকমেন্টরি শ্রেণিতে যদি সম্ভব হয় তাহলে উপস্থাপন করা অথবা এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের পেপার কাটিং সংগ্রহ করতে দেওয়া) • জঙ্গিবাদ • জঙ্গিবাদের ধারণা • জঙ্গিবাদের কারণ, জঙ্গিবাদের প্রভাব এবং প্রতিরোধ পদক্ষেপ **দুর্নীতি** • দুর্নীতির ধারণা • দুর্নীতির কারণ • দুর্নীতির প্রভাব ও প্রতিরোধ

১.৬ শ্রেণিভিত্তিক পাঠ পরিসর ও কাঠামো

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শিখনফল অর্জনের জন্য শ্রেণিভিত্তিক পাঠ পরিসর ও কাঠামো নির্ধারণ করা। কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসিক অবস্থা, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে শিখনফল নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে নির্ধারিত শিখনফলটি অর্জনের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। বিষয়বস্তুটি কত সময় অর্থাৎ কতটি পাঠের মধ্যে শেষ করতে হবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। বস্তুত পাঠের সময় বিবেচনায় নিয়েই পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর কাঠামো ও ব্যাপ্তি নির্ধারিত হয়। এভাবে একটি পাঠ্যপুস্তকের পরিসর কতটুকু হবে তা নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের জন্য শ্রেণি অনুযায়ী পাঠ বিভাজন দেখানো হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি বিষয়বস্তুও বিপরীতে কতটি শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাও এতে রয়েছে। নিচে ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ পরিসর ও কাঠামো দেওয়া হলো।

ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি

অধ্যায়ের শিরোনাম ও পিরিয়ড						
অধ্যায়	**ষষ্ঠ**	**পিরিয়ড**	**সপ্তম**	**পিরিয়ড**	**অষ্টম**	**পিরিয়ড**
প্রথম	সমাজের কথা	৮	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম	১১	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১৮
দ্বিতীয়	বাংলা ও বাংলার মানুষ	১৪	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	৮	ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম	১১
তৃতীয়	প্রাচীন বাংলার জীবনধারা	৮	পরিবারে শিশুর বেড়ে ওঠা	৬	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন	৬
চতুর্থ	বাংলাদেশের সংস্কৃতির পরিচয়	৭	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৭	ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্ন পরিচয়	৭
পঞ্চম	সমাজে শিশুর বেড়ে ওঠা	৮	বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	৬	সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন	৭
ষষ্ঠ	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৮	বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা	১১	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৮
সপ্তম	বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	৮	বাংলাদেশের জলবায়ু	৯	বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা	১২
অষ্টম	বিশ্ব ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ	৭	বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি	৯	বাংলাদেশে দুর্যোগ	৯
নবম	বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি	৮	বাংলাদেশে নারী অধিকার	৬	বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন	৫
দশম	বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা	৬	বাংলাদেশে প্রবীণব্যক্তির অধিকার	৮	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	৪
একাদশ	বাংলাদেশে শিশু অধিকার	১১	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	১৪	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা	৭
দ্বাদশ	শিশুর বেড়ে ওঠায় প্রতিবন্ধকতা	৭	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১১	বাংলাদেশের সম্পদ	৭
ত্রয়োদশ	আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি	৬			বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা	৫
মোট		১০৬		১০৬		১০৬

নবম-দশম শ্রেণি

অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ	অধ্যায় শিরোনাম	পিরিয়ড সংখ্যা	অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ	অধ্যায় শিরোনাম	পিরিয়ড সংখ্যা
প্রথম	পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭-১৯৭০)	১৮	ষষ্ঠ	বাংলাদেশের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২০
পরিচ্ছেদ-১.১	বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন	৪	পরিচ্ছেদ-৬.১	বাংলাদেশের নদ-নদী	৮
পরিচ্ছেদ-১.২	বাঙালি জাতীয়তাবাদে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা	৫	পরিচ্ছেদ-৬.২	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ	১২
পরিচ্ছেদ-১.৩	সামরিক শাসন ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ (১৯৫৮-৭০)	৯	সপ্তম	রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন	৭
দ্বিতীয়	স্বাধীন বাংলাদেশ	২৬	অষ্টম	বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা	১৩
পরিচ্ছেদ-২.১	মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়	৮	পরিচ্ছেদ-৮.১	বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গসমূহ	৭
পরিচ্ছেদ-২.২	স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও মুজিব শাসন আমল	৬	পরিচ্ছেদ-৮.২	বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা	৬
পরিচ্ছেদ-২.৩	সামরিক শাসন আমল (১৯৭৫–৯০)	৬	নবম	বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন	১৫
পরিচ্ছেদ-২.৪	গণতন্ত্রর পুনঃযাত্রাকাল	৬	দশম	জাতিসঙ্ঘ ও বাংলাদেশ	৬
তৃতীয়	বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ	১৪	একাদশ	জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	৮
পরিচ্ছেদ-৩.১	বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো	৫	দ্বাদশ	অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি	২০
পরিচ্ছেদ-৩.২	সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া	৯	পরিচ্ছেদ-১২.১	অর্থনীতির নির্ধারকসমূহ	৬
চতুর্থ	সৌরজগৎ ও ভূমণ্ডল	১৫	পরিচ্ছেদ-১২.২	বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি	১৪
পরিচ্ছেদ-৪.১	সৌরজগৎ	৫	ত্রয়োদশ	বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা	১০
পরিচ্ছেদ-৪.২	বিশ্বের সময় নির্নয় পদ্ধতি	৪	চতুর্দশ	বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন	৮
পরিচ্ছেদ-৪.৩	পৃথিবীর গতি	৪	পঞ্চদশ	বাংলাদেশের কতিপয় সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইনের বিধি বিধান	২৩
পরিচ্ছেদ-৪.৪	জোয়ার-ভাটা	২			
পঞ্চম	বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু	১৩			
পরিচ্ছেদ-৫.১	বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি	৮			
পরিচ্ছেদ-৫.২	বাংলাদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ	৫			
					২১৬

শ্রেণিতে নির্ধারিত বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত শ্রেণি কার্যক্রমের মধ্যে শেষ হবে।

১.৭ শ্রেণিভিত্তিক বিষয়বস্তুর শিখনফল ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার আলোকে চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত শিখনফলগুলো শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে দিয়ে অর্জন করবে। শুধু বিষয়বস্তু জানা বা মুখস্থ করার মধ্যেই শিখন সীমিত নয়। তার আবেগিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের উন্মেষ ঘটানোও এ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য। তাই শিখনফল প্রণয়নের সময় বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় ও মনোপেশিজ শিখনক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট শিখনফল শিক্ষাক্রমে দেওয়া রয়েছে। আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালেয়ের প্রফেসর বেঞ্জামিন এস. ব্লুম ১৯৫৬ সালে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেন। এ প্রধান তিন শিখনক্ষেত্র হলো বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain), আবেগীয় ক্ষেত্র (Affective Domain) ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)। শিক্ষার্থীদের অর্জিতব্য শিখনফল কোনো অংশ মস্তিষ্ক সচল, কোনো অংশ হৃদয় সচল আবার কোনো অংশ পেশি সচল করার সাথে সংশ্লিষ্ট। বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনফল শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক সচল (Heads on) মনোপেশিজ ক্ষেত্র শিক্ষার্থীর পেশি সচল (Hands on) ও আবেগিক ক্ষেত্রে শিখনফল শিক্ষার্থীর হৃদয় সচল (Hearts on) সংশ্লিষ্ট। শিক্ষার প্রায় সকল উদ্দেশ্যকে এই প্রধান ৩টি ডোমেইন বা শ্রেণির যে কোনো একটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain), ব্লুম (১৯৫৬) তার Taxonomy of Educational Objective-এ Cognitive Domain বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দেশ্যকে ৬টি স্তরে ভাগ করে দেখিয়েছেন। এগুলো হলো–

- জ্ঞান (Knowledge)
- অনুধাবন (Comprehension)
- প্রয়োগ (Application)
- বিশ্লেষণ (Analysis)
- সংশ্লেষণ (Synthesis)
- মূল্যায়ন (Evalution)

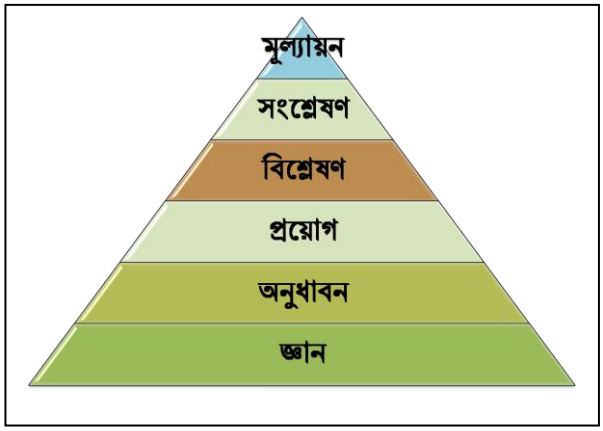

এই স্তরগুলো সহজ থেকে জটিল আচরণের অনুক্রমে বিন্যাস করা হয়েছে।

জ্ঞান

জ্ঞান বলতে পূর্বে শেখা কোনো বিশেষ তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্মরণ করার মানসিক ক্ষমতাকে বুঝায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাধারণ ও সহজ আচরণের প্রকাশ পায়। জ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে–

- পরিভাষা (Terminology)
- নির্দিষ্ট তথ্য (যেমন– তারিখ, ঘটনা, ব্যক্তি, স্থান ইত্যাদি)
- রীতি (Convention)
- সাধারণ প্রবণতা ও অনুক্রম (Trends and Sequences)
- শ্রেণিকরণ বা প্রকারভেদ (Classifications or Categories)
- নির্ণায়ক (Criterion)
- পদ্ধতি (Methodology)
- নীতি ও সাধারণীকরণ (Principles and Generalization)
- তত্ত্ব ও গঠন কাঠামো (Theories and Structure)

অনুধাবন

অনুধাবন বলতে কোনো বিষয়ের অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে বুঝায়। কোনো তথ্য, ধারণা ও নীতিকে বুঝিয়ে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, চার্ট ও গ্রাফ ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যদ্বাণী করা ইত্যাদি হলো এই শ্রেণির উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। যেমন,

- ভাষান্তর (Translation)
- ব্যাখ্যাকরণ (Interrelation)
- অনুবিতিকরণ (Extrapolation)

প্রয়োগ

পূর্বে শেখা কোনো ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্রকে বাস্তবে নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার ক্ষমতাকে প্রয়োগ বলা হয়।

বিশ্লেষণ

কোনো সমগ্র বস্তুকে তার বিভিন্ন অংশে পৃথক করা বা ভেঙে ফেলার ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ বলা হয়। চিন্তন বা যুক্তিকরণের এটি একটি প্রক্রিয়া।

- উপাদান বিশ্লেষণ
- সম্পর্কের বিশ্লেষণ
- সংগঠিত নীতি বিশ্লেষণ

সংশ্লেষণ

সংশ্লেষণ হলো বিশ্লেষণ ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া। কোনো বস্তুর পৃথককৃত অংশগুলোকে একত্রিত করে বস্তুটির সমগ্র রূপদান করার ক্ষমতা হলো সংশ্লেষণ। এটি একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। এই অর্থে এটি চিন্তন ও সৃজনশীলতা সংশ্লিষ্ট ধারণা। সংশ্লেষণ কাজের মধ্যে মৌলিকত্ব আছে। কোনো কিছুর গঠন কাঠামো আবিষ্কার এই কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই স্তরের আচরণিক পরিবর্তন হবে সৃষ্টিধর্মী কাজ বা পরিকল্পনা করার ক্ষমতা অর্জন। এই স্তরের উপবিভাগ হতে পারে।

- প্রবন্ধ রচনা বা বক্তব্য পেশ
- পরিকল্পনা প্রণয়ন
- তথ্য শ্রেণিকরণ পদ্ধতি

মূল্যায়ন

এটি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের সবচেয়ে উঁচু স্তরের উদ্দেশ্য। মূল্যায়ন হলো বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কিছুর মূল্যমান বিচার করার প্রক্রিয়া। এই বিচারকরণ নির্দিষ্ট কোনো নির্ণায়ক বা মানদণ্ডের আলোকে করা হয়। মূল্যায়ন পরিমাণগত বা গুণগত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, ব্যক্তিক বা নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে। অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র (Affective Domain) David R. Krathwol, Bertran. B. Masia. Benjmin S. Bloom (1964) অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের বিস্তারিত শ্রেণিবিন্যাস করেন। এই ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোভাব, প্রশংসা ও অভিযোজন সংক্রান্ত আচরণ প্রকাশ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো 'সহজ থেকে কঠিন' অনুক্রমে নিম্নরূপ বিন্যাস করা হয়েছে।

- গ্রহণ (Receiving) বা মনোযোগ (Attending)
- সাড়া প্রদান (Responding)
- মূল্যবোধ নিরূপণ (Valuing)
- সংগঠিতকরণ (Organizing)
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ (Characterizing)

গ্রহণ বা মনোযোগ

এটা হলো অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের সবচেয়ে নিচু স্তরের উদ্দেশ্য। গ্রহণ বলতে বোঝায় শিক্ষার্থী শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় আদান-প্রদান বা প্রশ্নোত্তর শুনবে বা এর প্রতি মনোযোগী হবে। উপ-শ্রেণিগুলো হলো–

- সচেতনতা (Awareness)
- কোনো কিছু গ্রহণে আগ্রহী (Willingness to receive)
- নিয়ন্ত্রিত বা নির্বাচিত মনোযোগ (Controlled or Selected Attention)

উদাহরণ:

- অপরের কথা মনোযোগের সাথে কোনো।
- বিজ্ঞান ক্লাবের কাজে অংশগ্রহণ করা।
- স্কুল ভবনের কারুকার্য সম্পর্কে সচেতন থাকা।

সাড়া প্রদান

এটা হলো উত্তর প্রদান বা প্রতিক্রিয়া করা। শিক্ষার্থী কোনো উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে চায়। এর পেছনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেষণা কাজ করে। এই শ্রেণির উদ্দেশ্য তিনটি উপ-শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা -

- সাড়া প্রদানে মৌন সম্মতি (Acquiescence in Responding)
- সাড়া প্রদানে ইচ্ছুক (Willingness to Respond)
- সাড়া প্রদানে তৃপ্তিলাভ (Satisfaction in Response)

উদাহরণ:

- শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা।
- সঠিক উত্তর প্রদানে তৃপ্তি লাভ করা।
- আগ্রহ সহকারে নিজের মতামত ব্যক্ত করা।

মূল্যবোধ নিরূপণ

এই শ্রেণির উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত স্বকীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন থাকবে। কারো ইচ্ছা পূরণে সম্মতির পরিবর্তে নিজের প্রবল আগ্রহ ও উদ্যোম দ্বারা তাড়িত হয়ে মূল্যবোধ অর্জনে অঙ্গীকার করা। এই শ্রেণির তিনটি উপ-শ্রেণি শনাক্ত করা হয়েছে। যথা -

- মূল্যবোধের সমর্থন (Acceptance of a Value)
- মূল্যবোধের অগ্রাধিকার (Preference for Value)
- অঙ্গীকার (Commitment)

উদাহরণ:

- ধর্মীয় দর্শনের মূল্য শনাক্ত করতে পারা ।
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে সমর্থন করা ।
- স্কুল পরিচালনায় গণতন্ত্রর ভূমিকার প্রশংসা করতে পারা।

সংগঠিতকরণ

যখন শিক্ষার্থীর মধ্যে একাধিক মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে, তখন তা মোকাবিলা করার জন্য সে মূল্যবোধকে কোনো একটি বিশেষ রীতিতে বিন্যাস করার চেষ্টা করে। তা না হলে তার আচরণে হয়তো অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ পাবে। সংগঠিতকরণ হলো একটি মূল্যবোধ ব্যবস্থা গঠনের প্রক্রিয়া। এই শ্রেণির আচরণকে দুইটি উপ-শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা -

- মূল্যবোধের ধারণা গঠন (Conceptualization of a value)
- একটি মূল্যবোধ ব্যবস্থা সংগঠিতকরণ (Organization of a value System)

উদাহরণ :

- একজন নন্দিত নেতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারা
- কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক কাজ এবং স্কুলের কাজ বাড়িতে করার ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা
- নিজ আচার আচরণকে স্কুলের নিয়মাবলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে পারা

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ

এটি হলো অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের সবচেয়ে উঁচু স্তরের উদ্দেশ্য এবং এই স্তরে ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা করা হয় কতগুলো নিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধ, আদর্শ এবং বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে। বিশ্বাস, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্যক্তির সামগ্রিক জীবন দর্শন ফুটে ওঠে। এই শ্রেণির দুইটি উপ–শ্রেণি আছে। যথা -

- সর্বজনীন সেট (Generalised Set)
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন (Characterization)

উদাহরণ:

- জীবন দর্শন পরিবর্তন করতে পারা
- নতুন তথ্যের আলোকে মতামত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করা
- মানুষের মূল্য এবং মর্যাদার প্রতি বিশ্বাসভাজন হওয়া

মনোপেশিজ ক্ষেত্র

Harrow(1972) মনোপেশিজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলোকে প্রধান ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলো 'সহজ থেকে জটিল' আচরণের অনুক্রমে বিন্যাস করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার্থীর কাজের দক্ষতা প্রকাশ করে। এই ছয়টি শ্রেণির প্রত্যেকটিকে উপ-শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। উপ-শ্রেণিগুলোকে আবার অনেকগুলো শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

নিচে প্রধান ছয়টি শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করা হলো–

Imitation : অন্যের কাজ অনুকরণ করে কাজের কৌশল শেখা, যেমন- অনুকরণ করে টাইপ করা বা ছবি অংকন। এক্ষেত্রে কৃতিত্ব নিম্নমানের হতে পারে।

Manipulation : নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার সক্ষমতা এবং অনুশীলন। যেমন– ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটারে ডকুমেন্ট টাইপ করা।

Precision : কাজ সংশোধন এবং আরো নির্ভুল করতে পারা। যেমন– ডকুমেন্ট টাইপ করা এবং ভুল সংশোধন করা।

Articulation : একই সিরিজের কতগুলো কাজের সমন্বয় সাধন, ঐক্যতান স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা। যেমন-ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা, (সঠিকভাবে টাইপ, হেডার, ফুটার, এলাইনমেন্ট ঠিক রাখা)। যেমন–ভিডিও প্রযোজনায় গঠন, নাটক, কালার কম্পোজিশন, শব্দের সমন্বয়)।

Naturalization : কোনো কাজে এমন উঁচু মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করা যে, কাজ করতে তেমন চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। যেমন-তেমন কোনো চিন্তা না করে দ্রুত ও সঠিকভাবে ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত বিভিন্ন ক্ষেত্রের কিছু শিখনফল নিচে উল্লেখ করা হলো। শিখন ফলগুলো ক্ষেত্র ও স্তর অনুসারে চিহ্নিত করতে হবে।

শিখনফল	ক্ষেত্র ও স্তর
বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে	
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে গর্ববোধ করবে	
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে লালন করতে পারবে	
পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে	
পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ হবে	
সামাজিকীকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে	
পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ ভূমিকা পালনে সচেতন হবে	
বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে	
জোয়ার–ভাটার ধারণা, কারণ ও শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবে	
পৃথিবীর ওপর জোয়ার–ভাটার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে	
সৌরজগৎ ও গ্রহসমূহের অবস্থান আঁকতে পারবে	
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে	
বিভিন্ন রেখার অবস্থানিক চিত্র আঁকতে পারবে	
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে	
জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ- পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে পারবে	
দুর্নীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে	
দুর্নীতির প্রভাব ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে	
নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতন হবে	
HIV AIDS সম্পর্কে সচেতন হবে এবং আক্রান্ত রোগীর সেবায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে	
উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে	
সামাজিক পরিবর্তনজনিত অবস্থায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হবে	
নতুন পরিস্থিতিতে গাণিতিক জ্ঞান প্রয়োগ করে সময় নির্ণয় করতে পারবে	
উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে	
অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেতন হবে	
ক্ষুদ্র পরিসরে জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয় হাতে-কলমে বের করতে পারবে	

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়কে সমন্বিত বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয় কেন ? করুন
২. শিখনফল ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করুন।
৩. শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক-এর ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
৪. শিক্ষাক্রম কাঠামো ও শিক্ষাক্রম ফ্রেমওয়ার্ক-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
৫. পাঠ পরিসর বলতে কী বোঝেন? ব্যাখ্যা করুন।
৬. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করুন।
৭. মূল্যায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
৮. ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।
৯. শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।
১০. শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।
১১. শিক্ষাক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের বাধাগুলি চিহ্নিত করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. একটি বিষয়কে সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নির্বাচন করা হয় কেন? বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টির আলোকে তা বিশ্লেষণ করুন।
২. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৩. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টির ৯ম-১০ম শ্রেণির 'স্বাধীন বাংলাদেশ' অধ্যায়টি কোনো কোনো উদ্দেশ্য থেকে নেওয়া হয়েছে কেন?
৪. 'বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে না হয়ে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অথবা স্ব স্ব শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত হওয়া অধিক যুক্তিসংগত' আপনার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।
৫. বুদ্ধিভিত্তিক শিখন ক্ষেত্রই কার্যকর শিখনের জন্য যথেষ্ট-আপনি কী বক্তব্যটির সাথে একমত ? বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দিন?
৬. বুদ্ধিভিত্তিক, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করুন।
৭. বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষেত্রের চিন্তন দক্ষতার স্তরগুলি ব্যাখ্যা করুন।

তথ্যসূত্র

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০।
২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২।
৩. এহগঠন, মো: আবুল (১৯৯৭), শিক্ষাক্রম উন্নয়ন নীতি ও পদ্ধতি, ঢাকা: ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি।
৪. আলী, আজহার ও বেগম হোসনে আরা (১৯৯৩), মাধ্যমিক শিক্ষা: বাংলাদেশ, ঢাকা: ন্যাশনাল আইডিয়াল প্রকাশনী।
৫. আক্তার, মাহবুবা (২০১৫), মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা: সংরক্ষণ প্রকাশন।

ইউনিট ২ : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ প্রক্রিয়া যতদূর সম্ভব ফলপ্রসূ করে তোলা। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কোনো পাঠ্য বিষয় কিভাবে শিক্ষার্থীদের মন মানসিকতার উপযোগী করে তাদের কাছে উপস্থাপন করা যায়, বিভিন্ন প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। কোনো পরিস্থিতিতে, কোনো বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে, কোনো শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করলে ধনাত্মক সাড়া পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সন্তুষ্টির স্তর, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষাপোকরণের সহজ লভ্যতা, শিক্ষকের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর। একজন দক্ষ শিক্ষক তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও মননের সাহায্যে উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও শিখনের বিষয়বস্তু মাঝে সমন্বয় ঘটিয়ে শিখনকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে তুলবেন। কারণ পাঠদান পদ্ধতি একদিকে বিজ্ঞানধর্মী এবং অপরদিকে সৃজনধর্মী শিল্পকলা।

এই ইউনিটে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হলো-

২:১ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ, কার্যক্রম নির্বাচন, ছক তৈরিকরণ (যেমন– সামাজিক সমস্যা, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, বাংলাদেশের দুর্যোগ, রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন)

২:২ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ, কার্যক্রম নির্বাচন, ছক তৈরিকরণ (যেমন– বাংলাদেশের জলবায়ু, জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সৌরজগত ইত্যাদি)

২:৩ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এর বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পাঠ পরিচালনার জন্য উত্তম পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন

২.১ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ, কার্যক্রম নির্বাচন, ছক তৈরিকরণ (যেমন– সামাজিক সমস্যা, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, বাংলাদেশের দুর্যোগ, রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন)

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

আধুনিক শিখন-শিখানো পদ্ধতির মধ্যে একক যৌথ বা দলীয় কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যার মাধ্যমে সক্রিয় শিখন সম্ভব। আধুনিক এ সব পদ্ধতিকে সাধারণভাবে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি নামে অভিহিত হয়। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বিশেষ একটি পদ্ধতি নয়। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি হলো শিক্ষণ-শিখনে প্রগতিমুখি, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গঠনধর্মী, তথ্যপ্রবাহমূলক, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ও ফলাফল সমৃদ্ধ, সহযোগিতাপূর্ণ, ব্যবহারিক বা পরীক্ষণজ্ঞানসমৃদ্ধ সক্রিয়

চিত্র : অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা অতি সহজেই এককভাবে অথবা দলগতভাবে একত্রিত হয়ে শিখনে অংশগ্রহণ করে। এ সময় শিক্ষক সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সফলতার জন্য অবশ্যই শিক্ষকের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসী। জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তন আনাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় পাঠ্যক্রম সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নিয়ে প্রণীত। ফলে বিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় শিক্ষণ পদ্ধতির মাঝে বৈচিত্র্য আনার প্রয়োজন আছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় শিক্ষককে বিশেষ কতকগুলো পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তবে কোনো বিষয়ের জন্যই কোনো

সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। বিভিন্ন পরিবেশে একই পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন ফলাফল পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও পদ্ধতির ব্যবহারের প্রস্তুতি ও প্রয়োগ এবং তারতম্যের উপর পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি শিক্ষণের জন্য শিক্ষক যে পদ্ধতিই ব্যবহার করেন না কেন, সেক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় থাকলে তা আদর্শ পদ্ধতিতে পরিণত হবে যেমন– উদ্দেশ্যভিত্তিক, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, প্রেষণা সৃষ্টিতে সক্ষম, শিক্ষণ কৌশলের সমন্বয়, বিষয়বস্তুর মনোবৈজ্ঞানিক বিন্যাস, প্রয়োগমূলক, সুপরিকল্পিত, বাস্তবসম্মত ও জীবন কেন্দ্রিক। প্রকৃতপক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনেকগুলো পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সফল করার কৌশলসমূহ–

- শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে
- দলগত কাজে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে
- মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করতে হবে
- শ্রেণির পরিবেশ পাঠদান উপযোগী হতে হবে
- মূল্যায়নে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির উদ্দেশ্য

- শিক্ষার্থীরা যে কোনো সমস্যা দলগতভাবে সমাধান করতে পারবে
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি হবে যা শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে
- বিভিন্ন উপস্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে
- পাঠদান হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক
- সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক কাজ শেষ করতে হবে ফলে সময় সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে
- বিভিন্ন মেধার মিশ্রণে অংশগ্রহণমূলক কাজ সম্পন্ন হয় ফলে শিক্ষার্থীর উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ, কার্যক্রম নির্বাচন :

(ক) সামাজিক সমস্যা, যেমন- কিশোর অপরাধ

শিখনফল	কৌশল ও দক্ষতা	কার্যক্রম
বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের কারণসমূহ উল্লেখ করতে পারবে।	একক কাজ, ভিপ কার্ড বিতরণ	শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে একটি করে ভিপ কার্ড দিয়ে কিশোর অপরাধ কী ? এ সম্পর্কে লিখতে বলবেন। নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের লেখাগুলো শিক্ষক পড়ে শুনাতে বলবেন।
	প্রদর্শন, প্রশ্ন-উত্তর হাঁটা, পড়া এবং কথা বলা	শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন উপকরণ, মাল্টিমিডিয়া সাহায্যে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন। প্রশ্ন ১. কিশোর কারা ? ২. কিশোর অপরাধের কারণ কী কী ? ৩. কিশোর অপরাধ দমন আইন কী ? ৪. কিশোর অপরাধ রোধের উপায়সমূহ কী কী ? শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিক্ষক এ বিষয়ক পোস্টার তৈরি করাবেন এবং শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীরা একেকটি পোস্টারের সামনে যাবে, পড়বে, এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।
	ভূমিকাভিনয়	কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করে ভালোভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা দর্শকের ভূমিকা প্রদর্শন করবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরবে।

(খ) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা

শিখনফল	কৌশল ও দক্ষতা	কার্যক্রম কৌশল
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে	জোড়ায় কাজ, প্রশ্ন-উত্তর, বোর্ড ব্যবহার	শিক্ষার্থীদের জোড়ায় আলোচনার খাতায় তথ্য লেখার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্ন দিবেন। প্রশ্ন: বাংলাদেশের ক্ষুদ্রজাতিসত্ত্বা কারা? নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের লেখা শিক্ষক পড়ে শুনাতে বলবেন। শিক্ষক তথ্যসমূহ বোর্ডে লিখবেন।
	প্রদর্শন	শিক্ষক মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন।
	মানচিত্র পর্যবেক্ষণ	শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দুইটি দলে ভাগ করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে একটি মানচিত্র এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন সবাই দেখতে পায়, 'ক' দল প্রশ্ন করবে খ দল মানচিত্রে দেখাবে। একই ভাবে 'খ' দল প্রশ্ন করবে ক দল মানচিত্রে দেখাবে।

(গ) বাংলাদেশের দুর্যোগ

শিখনফল	কৌশল ও দক্ষতা	কার্যক্রম
বাংলাদেশের দুর্যোগ পরবর্তী করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে	একক কাজ, অভিজ্ঞতা বিনিময়	শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন তারা কোনো দুর্যোগ দেখেছে কিনা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা শুনবেন।
	মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শন, প্রশ্ন-উত্তর, প্রত্যক্ষীকরণ	শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া সাহায্যে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন। দুর্যোগে মানুষের খারাপ অবস্থার একটি ছবি মাল্টিমিডিয়ায় দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের চোখ বন্ধ করতে বলবেন। ধীরগতিতে এবং শান্তগতিতে কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে দৃশ্যটি কল্পনা করতে বলবেন। এ রকম পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী কি করবে তা ভাবতে বলবেন। এর জন্য কিছু সময় দিতে হবে। যখন শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হবে তখন তাদের চোখ খুলে একে অন্যের ধারণা বিনিময় করবে।
	পোস্ট বক্স	শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলের জন্য পোস্ট বক্স, কর্মপত্র এবং সাদা কাগজ সরবরাহ করতে হবে। বিভিন্ন দলের সকল শিক্ষার্থী আলাদাভাবে তাদের মতামত সাদা কাগজে লিখবে এবং সরবরাহকৃত পোস্ট বক্সে ফেলবে। নির্দিষ্ট মতামত একত্রিত করে পুরো ক্লাসের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হবে।

(ঘ) রাষ্ট্র

শিখনফল	কৌশল ও দক্ষতা	কার্যক্রম
রাষ্ট্রের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে	একক কাজ, প্রদর্শন	শিক্ষার্থীদের সামনে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র দেখিয়ে নিম্নোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন। ১. এটি কী? ২. কেন এই মানচিত্র? ৩. মানচিত্রে সীমানা দিয়ে ঘেরা এক একটি অংশকে কী বলে? এক্ষেত্রে শিক্ষক উত্তর প্রদানে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন।
	সাক্ষাৎকার, প্রশ্ন-উত্তর	শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন উপকরণ, মাল্টিমিডিয়া সাহায্যে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন। প্রশ্ন: ১. রাষ্ট্র কী? ২. রাষ্ট্রের কার্যাবলি কী ? শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের নিয়ে নতুন জোড়া তৈরি করতে হবে। প্রণয়নকৃত প্রশ্নের মাধ্যমে একে অপরের সাক্ষাৎকার নিবে। এ সময় শিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
	দলগত কাজ	শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে দিতে হবে। দলের সকল শিক্ষার্থীদের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমের পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

(ঙ) নাগরিকতা ও আইন

শিখনফল	কৌশল ও দক্ষতা	কার্যক্রম
নাগরিক আইন সমূহ বলতে পারবে	জোড়ায় কাজ, প্রশ্ন-উত্তর	শিক্ষার্থীদের নাগরিক আইন সম্পর্কে আলোচনার করে মতামত প্রদান করতে বলবেন।
	মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শন	শিক্ষার্থীদের নাগরিক আইন সম্পর্কে ধারণা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন।
	এক্সপার্ট জিকসো	শিক্ষার্থীদের সমান সংখ্যক দলে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক দলকে একটি কর্মপত্র (নাগরিক আইন) দিতে হবে। একই দলের শিক্ষার্থীরা নিজেরা আলোচনা করবে। আলোচনা শেষে নতুন দল গঠন করা হয় এবং যেখানে মূল দলের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। নতুন দলের অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মূল দলে ফিরে আসবে। পরবর্তীতে ফিডব্যাক দিবে।

অনুশীলন

- বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন
- সামাজিকীকরণ
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

২.২ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ, কার্যক্রম নির্বাচন, ছক তৈরিকরণ (যেমন–বাংলাদেশের জলবায়ু, জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সৌরজগত ইত্যাদি)

শিখনে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকবে, নিজের আগ্রহে শিখবে, নিজের প্রচেষ্টায় শিখবে এবং নিজের অভিজ্ঞতা নিজেই প্রয়োগ করে পরিতৃপ্তি লাভ করবে এই হলো শিক্ষর্থীকেন্দ্রিক শিখন। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যর বিকাশের জন্য শিক্ষর্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা যা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভব। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞাতা কাজে লাগিয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির উপাদান হলো– দলগত কাজ, দলগত আলোচনা, ব্রেইন স্ট্রর্মিং, প্রশ্ন উত্তর, Expert jigsaw ইত্যাদি। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দ্বিমুখী যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষাদান পরিচালিত হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাঠদান তাৎপর্যমণ্ডিত হয় এবং সফল সমাপ্তি ঘটে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেকে জীবন সম্পৃক্ত এবং সঠিকভাবে বিকাশের সুযোগ পায় যা তাকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক কৌশল ও দক্ষতা

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তি সচল থাকে, বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে সহয়তা করে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্বের জানার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে শিক্ষকের নিকট খোলামেলা প্রশ্ন করে, এমনকি সহপাঠী এবং শিক্ষকের সাথে তার্কিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের মোড় ও ঘুরিয়ে দিতে পারে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় একটি সমন্বিত বিষয়। অনেক বিষয়বস্তু আছে যা সহজে শিক্ষার্থীরা মনে রাখতে পারে না। তাই এখানে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রবেশের সুযোগ পায়, যার ফলে শিক্ষার্থীরা মেধাবী, চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদীও হয়ে ওঠে।

শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য শিক্ষকের করণীয়-

- শিক্ষক তথ্য ও তথ্যযুক্ত সমস্যা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করবেন
- সমস্যা অবশ্যই শিক্ষার্থীর নিজস্ব পরিমণ্ডলভুক্ত হতে হবে
- সমস্যা এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন শিক্ষার্থী সমাধানে আগ্রহী হয়
- প্রাসঙ্গিক তথ্য বা শিক্ষক কর্তৃক সরবরাহ করা তথ্যের ভিত্তিতে সমাধান করার ব্যবস্থা করতে হবে
- সমস্যা যেন জীবনমুখী হয়, যা প্রয়োগের জন্য আগ্রহী হয়

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

বর্ণ	বিশ্লেষণ	বাংলা অর্থ
P	Participants Centred	অংশগ্রহণকারি কেন্দ্রিক
A	Achievement of Goal	উদ্দেশ্য অর্জন (যোগ্য)
R	Reciprocal Learning Attitude	পারস্পরিক শিক্ষণ মনোভাব
T	Transparency of Subject Knowledge	বিষয়বস্তুর জ্ঞানের গভীরতা/স্বচ্ছতা
I	Individual Recognition	ব্যক্তির স্বীকৃতি
C	Creating Congenial Environment	সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি
I	Initiators Buildup	উদ্যোগী হতে সাহায্য করে
P	Participation as Values	অংশগ্রহণমূলক মূল্যবোধের স্বীকৃতি
A	Acquisition of the art of Knowledge	জ্ঞানের কলাকৌশল আয়ত্মকরণ
T	Teacher Like Attitude	শিক্ষক সুলভ মনোভাব
O	Organizing Team Work Concept	দলগত কাজ করার জন্য সংগঠিত করা
R	Respect of each Other's /Reflection to individual Concept	একে অপরকে শ্রদ্ধা করা/ব্যক্তি ধারণার প্রতিফলন
Y	Yielding Feedback	ফলাবর্তন করা

শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সফল করার শর্তসমূহ

একই শ্রেণিতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে ফলে প্রত্যেকের কাজের যোগ্যতা ও ক্ষমতার মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। তাই শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও প্রবণতা অনুযায়ী অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে কাজটি যেমন আগ্রহ নিয়ে করবে তেমনি সম্পূর্ণ কাজটি করতে পেরে শিক্ষার্থী আত্মতৃপ্তি অনুভব করবে। এ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে-

- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী দলগঠন
- কোনো শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যদি একাধিক ক্ষেত্রে হয়, তবে সে নিজের কাজ শেষ করে অন্যের কাজে ও সহযোগিতা করতে পারবে
- অনগ্রসর শিক্ষার্থীকে এমন দলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেখানে পারদর্শী শিক্ষার্থী আছে, যে নিজে কাজ করবে এবং অনগ্রসর শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে ফলে সে কাজ করার আগ্রহ পাবে
- শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষককে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে তদারকী করতে হবে

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ, কার্যক্রম নির্বাচন :

(ক) বাংলাদেশের জলবায়ু

শিখনফল	কৌশল ও দক্ষতা	কার্যক্রম
বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে	জাড়ায় কাজ ও বোর্ড ব্যবহার	শিক্ষার্থীদের পাঠের উপযোগী মানসিক পরিবেশ তৈরির জন্য নিচের প্রশ্নটি জোড়ায় আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন। প্রশ্ন: বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন? শিক্ষক নির্ধারিত সময় শেষ হলে কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীকে তাদের লেখা পড়তে বলবেন এবং বোর্ডে তথ্যসমূহ লিখবেন ।
	সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন। এ সময় মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করতে পারেন। ১. বাংলাদেশে কয়টি ঋতু? ২. শীতকালের সর্বাচ্চ তাপমাত্রা কত? ৩. শীতকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত? ৪. গ্রীষ্মকালের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কী? ৫. বর্ষাকালের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কী? ৬. কালবৈশাখী ঝড় কী? শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে নিবে এবং শিক্ষকের সাথে অংশগ্রহণ করবে।
	বশীকরণ মাইক পদ্ধতি	শিক্ষার্থীদের ৩টি দলে বিভক্ত করতে হবে। ঋতুভেদে বাংলাদেশের জলবায়ুর অংশগুলো প্রতি দলকে একটি অংশ ভাগ করে দিতে হবে। প্রতি দলের সদস্যরা তাদের জন্য নির্বাচিত অংশ পড়বে ও বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করবে। প্রয়োজনীয় আলোচনা করে একটি বস্তুনির্ভর সারাংশ তৈরি করবে। দলের প্রত্যেক সদস্যকে আগেই বলতে হবে সবাইকে উপস্থাপন করতে হবে। এবার শিক্ষক একটি কাঠি, একটি কলম ও একটি পানির বোতল ইত্যাদির যে কোনো একটি বশীকরণ মাইক হিসেবে ব্যবহার করবেন। প্রত্যেক দলের সদস্য মাইকটি হাতে নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ উপস্থাপন করবে। এ ক্ষেত্রে দলের সদস্যরা তথ্যসমূহ নিজেদের মধ্যে আগেই ঠিক করে নিবেন কে কোনো তথ্য উপস্থাপন করবেন। এইভাবে প্রত্যেক দল তাদের অংশ উপস্থাপন করবে শিক্ষক এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। উপস্থাপন শেষে শিক্ষক নিজেই বিষয়টি সম্পর্কে সামারি করবেন। ফলে শ্রেণির সকলে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

(খ) জাতীয় সম্পদ ও অর্থনীতি ব্যবস্থা

শিখনফল	কৌশল ও দক্ষতা	কার্যক্রম
বিভিন্ন অর্থনীতি ব্যবস্থার তুলনা করতে পারবে	এককভাবে মাথা খাটানো	অর্থনীতি শব্দটি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত নিয়ে বোর্ডে তথ্যসমূহ লিখবেন।
	মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শন, প্রশ্ন-উত্তর, শূন্যস্থানে তথ্য বসানো	শিক্ষক প্রশ্ন-উত্তর ও মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন। শিক্ষার্থীদের ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য শীট বিতরণ করবেন। এতে খালি জায়গা থাকবে যেন শিক্ষার্থীরা তথ্য পূরণ করবে। নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষক শীট সংগ্রহ করে যাচাই করবেন।
	মার্কেট প্লেস	শিক্ষার্থীদের চারটি দলে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক দলকে একটি করে বিষয়বস্তু (ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) সম্পর্কে আলোচনা করে পোস্টারে লিখতে বলতে হবে। পোস্টারগুলো প্রত্যেকে তাদের টেবিলের মাঝখানে রাখবে। দলনেতা তাদের বিষয়বস্তু অন্য দলের সদস্যদের বুঝিয়ে বলবেন।

(গ) সৌরজগত

শিখনফল	কৌশল ও দক্ষতা	কার্যক্রম সৌরজগত
সৌরজগতের গ্রহগুলোর বর্ণনা করতে পারবে	মাইন্ড ম্যাপিং	সৌরজগত শব্দটি শিক্ষক বোর্ড লিখবেন এবং এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ভাবনাসমূহ বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং মাধ্যমে তথ্যসমূহ লিখবেন।
	বই পড়া, তালিকাকরণ, প্রদর্শন	শিক্ষক সৌরজগতের গ্রহগুলো সম্পর্কে একটি ভিডিও প্রদর্শন করবেন। প্রত্যেকটি গ্রহ সম্পর্কে তথ্য দিবেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের বইটি পড়ার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন। তারা পড়ে গ্রহগুলো সম্পর্কে তথ্যেও তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করবে।
	রোল প্লে	শিক্ষার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলকে দু'টি করে গ্রহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশনা দিবেন । দল তাদের দু'জন সদস্যকে দু'টি গ্রহের নামে নামকরণ করবেন এবং শিক্ষার্থীরা ভিপ কার্ডে গ্রহের তথ্য উপস্থাপন করবে।

অনুশীলন

- জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয়রোধ
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ
- পৃথিবী গ্রহে জীব বসবাসের

২.৩ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়- এর বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পাঠ পরিচালনার জন্য উত্তম পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দর সামাজিক জীবনের জন্য উপযোগী করে তৈরি করা। এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্দেশনা সম্বলিত মানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল । আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান মনে করে, প্রত্যেক শিশুর ভিতর কোনো না কোনো সম্ভবনা লুকিয়ে আছে। বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এ প্রতিভা জাগ্রত করতে হয়। শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করেন আর শিক্ষার্থী আপন প্রচেষ্টায় শিক্ষকের নির্দেশনায় শিখতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের জন্য উত্তম পদ্ধতি

সাধারণভাবে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের ধারাবাহিকতা, সৌন্দর্য ও সাবলিলতা বজায় রেখে যে নিয়মের ভেতর পাঠ্য বিষয়কে শিক্ষার্থীর হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয় তাকেই শিক্ষণ পদ্ধতি বলা হয়। শিক্ষার্থীকে জানা থেকে অজানার দিকে নিয়ে যাওয়াই শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য, বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ সক্রেটিসের মতে, "সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মূল কথা হচ্ছে, শিশুকে কোনো কিছু না বলে প্রশ্নের মাধ্যমে তার কাছ থেকে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধারা হবে শিশু যা জানে তা থেকে শুরু করে তাকে অজানার দিকে নিয়ে যাওয়া" এ পদ্ধতি হলো শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পাঠ্যক্রম এদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সংযোগ স্থাপন প্রক্রিয়া।

অন্য কথায়, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য যে সুচিন্তিত উপায় বা কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকেই শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি বলা হয়। শিক্ষাবিদ Rusk-এর মতে "Method is the process of establishing & maintaining contact between the pupils & the subject matter" শিক্ষাদানে একদিকে অফুরান্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার অন্যদিকে আছে ক্রমবিকাশমান শিশুমন। পদ্ধতি প্রয়োগের সার্থকতা হলো এ দুয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। তাই শিক্ষককে যেমন বিষয়জ্ঞান অর্জন করতে হবে তেমনি মন মানসকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষককে নিজস্ব চিন্তা যুক্তি, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে পদ্ধতিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে পদ্ধতি ও কৌশল সমান্তরাল ধারায় চলে। পদ্ধতি হলো কোনো পাঠে সামগ্রিকভাবে ব্যবহৃত উপায় আর কৌশল হলো পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগে গৃহীত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড। কখনও কখনও পদ্ধতি কৌশল এবং কৌশল পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। একটি পাঠে একাধিক পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগের ফলে পাঠটি অধিকতর ফলপ্রসূ ও আনন্দদায়ক হয়। কারণ Cone of Leaing-এ দেখা যায়, কোনো একটি শিখন শুধু পড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ার 2 সপ্তাহ পর শিক্ষার্থীরা 10% স্মরণ করতে পারে, কোনোার মাধ্যমে হলে 20%, দেখার মাধ্যমে হলে 30%, একই সাথে দেখা এবং কোনো হলে 50%, আলোচনার মাধ্যমে হলে 70% অপরদিকে বলা এবং করার (দলীয় কাজ, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, ব্যবহারিক কাজ, বাস্তবে দেখানো ইত্যাদি) মধ্য দিয়ে হলে 90% পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা স্মরণ করতে পারে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় মূলত সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির সমাবেশে সজ্জিত। তাই বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষণে ও বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার প্রয়োজন। যদিও শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক হচ্ছেন সবচেয়ে বড় পদ্ধতি। তিনি স্থান, কাল ও পরিবেশ বুঝে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, রুচি ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষণের পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের পর শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেবেন ঐ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে কোনো পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার উপর।

শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল সাধারণত দু'রকম যেমন- শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল এ শিক্ষকের কর্মকাণ্ড ও সক্রিয়তা প্রাধান্য পায় এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বহুলাংশে নীরব দর্শক ও শ্রোতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল এ শিক্ষকের কাজ হলো শিক্ষার্থীকে শ্রেণির পাঠদানে সক্রিয় রেখে শিখনফল অর্জনে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিখনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক পরিচালক বা নির্দেশনাদানকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক ধারণ ক্ষমতা, আগ্রহ, প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশলের উপরই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সুষ্ঠু শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষণ পদ্ধতি হতে হবে উদ্দেশ্যভিত্তিক, পাঠের উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। অর্থাৎ পদ্ধতি হবে উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জনে সক্ষম।
- আধুনিক শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকাই প্রধান। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ, আগ্রহ, ইচ্ছা ও অভিরুচিকে প্রাধান্য দিতে হবে কারণ শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাই মুখ্য বিষয়।
- আত্মসক্রিয়তা হচ্ছে শিখনের মূলনীতি। তাই এমন পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে যা শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।
- শিক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে শিক্ষণ কৌশল। তাই বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষণে বিভিন্ন কৌশলের সমন্বয় করে পদ্ধতিকে শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দদায়ক করতে হবে।
- শিক্ষণ পদ্ধতি হতে হবে প্রয়োগমূলক যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম হবে।
- শিক্ষণ পদ্ধতি হতে হবে পরিবর্তনশীল কারণ সময় এবং পরিবেশের কারণে পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।
- বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের জন্য এমন পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে হবে যা সুপরিকল্পিত পাঠদানে সহায়ক। তাই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নীতি। ফলে পদ্ধতি প্রয়োগে এলোমেলো হয় না।
- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।
- সুষ্ঠু শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বিমূর্ত অবস্থা থেকে মূর্ত অবস্থার দিকে ধাবিত করা যায়।
- মনোবৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ

প্যানেল আলোচনা

প্যানেল আলোচনায় আলোচনার বিষয়বস্তু আগে থেকেই শিক্ষক ঠিক করে দেন বা ঘোষণা দেন। কয়েকজন শিক্ষর্থীকে নিয়ে একটি প্যানেল গঠন করেন। প্যানেলে একজন শিক্ষার্থীকে দলনেতা নির্বাচন করা হয়। শিক্ষক থাকেন প্যানেলের সভাপতি। প্যানেলের সদস্যবৃন্দ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত হয়ে বিষয়বস্তুটি পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনে। আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীরা প্যানেলের সদস্যদের প্রশ্ন করে। এভাবেই সমস্ত অনুষ্ঠানটি এগিয়ে যায়। আলোচনা যাতে নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়, সেদিকে অবশ্যই শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে। সবশেষে শিক্ষক আলোচিত বিষয়ের একটি সারাংশ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

বির্তক

এ পদ্ধতিতে শুরুতেই শিক্ষক বিষয়স্তুটিকে সমস্যা বা প্রস্তাব আকারে পেশ করেন। শিক্ষার্থীরা প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থান নেয়। দু'দলে দলনেতা থাকে। দু'দলের প্রত্যেক সদস্য তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজ নিজ মতামত শ্রেণির সামনে তুলে ধরে একে অন্যের যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করে। শিক্ষক এখানে স্পিকারের ভূমিকা পালন করেন।

ভূমিকাভিনয়

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো একটি সামাজিক বিষয়বস্তুকে অভিনয় করতে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বিষয়টি মনোযোগ সহকারে দেখবে। সবশেষে শিক্ষক আলোচিত বিষয়ের একটি সারাংশ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

সমবায় শিখন

পাঠ্যবই-এর কোনো একটি কঠিন বিষয় এ পদ্ধতিতে সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মেধা, সামর্থ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজন সমন্বয়কারী ও একজন রেকর্ডকারী হিসেবে কাজ করবেন। প্রত্যেকেই কাজ ভাগ করে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। সমন্বয়কারী কাজে প্রেরণা ও উৎসাহ দিবেন। রেকর্ডকারী পুরো কার্যক্রম রেকর্ড করবে। শিক্ষক এখানে পর্যবেক্ষক হিসাবে কাজ করবেন।

মানচিত্র পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ভূগোল অংশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে এ পদ্ধতি অনেক বেশি কার্যকর। শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে দলের নামকরণ করা যেতে পারে। মানচিত্রটি শ্রেণিকক্ষের একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঝুলাতে হবে। মানচিত্রে কোনো দেশ বা নদী খুঁজে বের করবে এবং এর অবস্থান, লোকসংখ্যা ও অর্থনীতি সম্পর্কে বলবে। যেমন 'ক' দল একটি দশের নাম দেখাবে 'খ' দল মানচিত্র থেকে সে দেশ খুঁজে বের করবে এবং ঐ দেশের অবস্থান, লোকসংখ্যা ও অর্থনীতি সম্পর্কে বলবে। আবার 'খ' দল দেশের নাম বলবে 'ক' দল উত্তর দিবে। শিক্ষক এখানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন।

পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্যে কোনো সুনিদিষ্ট পার্থক্য করা সম্ভব নয়। ক্ষেত্র বিশেষে পদ্ধতি কৌশল এবং কৌশল পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে পদ্ধতি ও কৌশলকে একত্রে কৌশল বা Strategies বলা হয়।

পদ্ধতি	কৌশল
◆ বক্তৃতা	◆ একক কাজ
◆ আলোচনা	◆ জোড়ায় কাজ
◆ প্রশ্নোত্তর	◆ দলীয় কাজ
◆ গল্প বলা	◆ উদ্দীপ্তকরণ মার্কেট প্লেস
◆ আবিষ্কার	◆ ব্রেইন স্ট্রর্মিং
◆ পর্যবেক্ষণ	◆ সমাজ জরিপ
◆ অনুসন্ধান	◆ ধারণা মানচিত্র
◆ প্রদর্শন	◆ নোট নেয়া
◆ প্রজেক্ট	◆ জার্নাল লেখা
◆ শিক্ষা ভ্রমণ	◆ বলতে দেয়া
◆ বর্ণনামূলক	◆ লিখতে দেয়া
◆ অভিনয়	◆ সাক্ষাৎকার
◆ বির্তক	◆ আঁকতে দেয়া
◆ আরোপিত কাজ	◆ গঠন করতে বলা
◆ অংশগ্রহণমূলক	◆ এক্সপার্ট জিকস
	◆ পোস্ট বক্স

দলগত কাজ

দলগত কাজ হলো একাধিক শিক্ষার্থী একত্রে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের প্রক্রিয়া। এটি অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতির অন্তর্গত একটি কৌশল। এ কৌশলের মাধ্যমে পাঠদানের যে কোনো বিষয়বস্তু হতে চিন্তামূলক প্রশ্ন বা সমস্যা বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রদান করা। অর্থাৎ দলীয় মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্নের সঠিক উত্তর বের করাই হলো দলীয় কাজ । এটা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, ধারণ, অভিজ্ঞতা ও ভাবের আদান-প্রদান প্রক্রিয়া ।

জোড়ায় কাজ

যে কোনো বিষয়বস্তুর অন্তর্গত চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে 'দু'জন করে শিক্ষার্থীরা দল গঠন করে চিন্তা ভাবনা, মতবিনিময় করে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করাকে জোড়ায় কাজের কৌশল বলে। অর্থীনীতির কোনো জটিল শব্দ ব্যাখ্যা করা, তথ্য সংগ্রহ করা, নমুনা সংগ্রহ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জোড়ায় কাজ দিলে ভালো হয়। এ কৌশলের জ্ঞান ও দক্ষতার বিনিময় ও সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীদের ক্লাসে এ কৌশলটি সহজে ব্যাবহার করা যায় ।

মাইন্ড ম্যাপিং

অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো কৌশলগুলোর মধ্যে মাইন্ড ম্যাপিং অন্যতম। এই কৌশলটি ব্যবহার করা হয় একটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা একত্রিত করার জন্য। অর্থাৎ আমাদের চিন্তার সুসংবদ্ধ সংরক্ষণ ও পরবর্তীতে তার দর্শনযোগ্য প্রতিফলনই হলো মানসিক চিত্র। অন্যভাবে বলা যায় বিষয়বস্তু থেকে পূর্ব ধারণাগুলো যখন কোনো ভূ-চিত্র বা ছক আকারে প্রকাশ করা যায় তখন তাকে আমরা মানসিক চিত্র বা মাইন্ড ম্যাপিং বলতে পারি। যেমন শিক্ষক চক বোর্ডে বিভিন্ন শব্দ লিখতে পারেন। অতঃপর লিখিত শব্দের সাথে অর্থবোধক সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য শব্দ বলার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। তাছাড়া শিক্ষক এমন কোনো ছবি বা চিত্র অংশ বিশেষ শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে পারেন যা দেখে শিক্ষার্থীরা ঐ চিত্র বা ছবির সম্পূর্ণকরণ করার চেষ্টা করতে পারে । মাইন্ড ম্যাপিং করার জন্য ব্যবহার হতে পারে ছবি, চিত্র, রেখা চিত্র, নকশা ইত্যাদি। বিভিন্ন আকৃতিতে মাইন্ড ম্যাপিং উপস্থাপন করা যায়। যেমন- বৃত্তাকার, আয়তাকার, গাছের মতো আকৃতি প্রভৃতি।

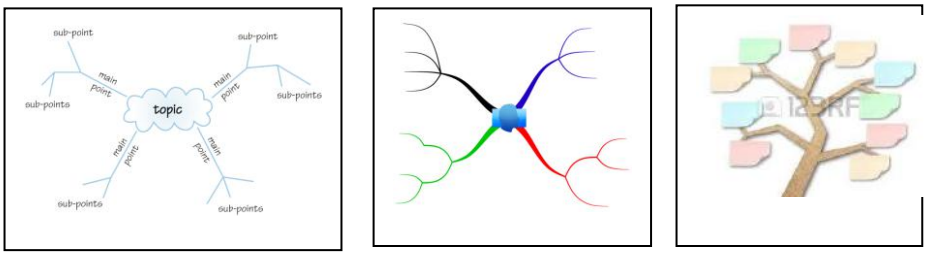

চিত্র : মাইন্ড ম্যাপিং

মার্কেট প্লেস

শিক্ষার্থীদের জন্য এটি খুবই অনুপ্রেরণামূলক ও সৃজনশীল কাজ। সাধারণত দলগত কাজ উপস্থাপনায় এটির প্রয়োগ করা হয়। এতে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বিরাজ করে, সবাই সক্রিয় থাকে, একঘেয়েমি দূর করে। এই কৌশল টিতে কোনো একটি বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করার পর সেটি পোস্টারে/কার্ডে/চিত্রিতভাবে আকর্ষণীয়ভাবে দেয়ালে টানিয়ে দেয়া হয়। সকল দল ঘুরে ঘুরে তা দেখে আলোচনা করে নিজেদের ধারণা সুস্পষ্ট করে তোলে।

ব্রেইন স্ট্রর্মিং

শিক্ষার্থী একক বা দলীয় যে ভাবেই কাজ করুন না কেন, তাকে চিন্তা করে সমাধানের পথ খুঁজতে হয়। সঠিক হোক বা ভুল হোক, সম্পূর্ণ বা আংশিক যাই হোক না কেন বিষয় সম্পর্কে সে নিজের চিন্তা থেকে বা অভিজ্ঞতা থেকে যা প্রকাশ করে তা সমাধান কে কোনো না কোনো ভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার এই প্রক্রিয়াকে মাথা খাটানো বলে। এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য সহায়ক প্রশ্নের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীর জন্য চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি করা, মতামত গ্রহণ ও সবার মতামতের ভিত্তিতে ঐক্যমতে পৌঁছায়।

এক্সপার্ট জিকস

এক্সপার্ট জিকস সম্পূর্ন নতুন একটি সহযোগিতামূলক কৌশল। একটি বিষয়বস্তু নির্বাচন করে ৫/৬ ভাগে ভাগ করতে হবে । শ্রেণি শিক্ষার্থীদের সমসংখ্যক দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে একটি করে বিষয়বস্তুর অংশ দিতে হবে। প্রতিটি দলের সদস্যরা তাদের জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুর অংশ পড়বে এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করে একটি বস্তু নির্ভর সারাংশ তৈরি করবে। এবার নতুন দল গঠন করতে হবে। দল গঠনের সময় লক্ষ রাখতে হবে পূর্বের গঠিত দল থেকে একজন করে শিক্ষার্থী যেন প্রত্যেক নতুন দলে থাকে অতঃপর অংশগ্রহণকারীরা নতুন দলে একজন অন্য জনকে পূর্বের বিষয় বস্তুর আলোচনা সম্পর্কিত তথ্য দিবে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানাবে যা পূর্বতন দলে পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে যা জেনেছিল এভাবে কার্যকরী দল পুর্নবিন্যস্ত করে কাজ করার মাধ্যমে শ্রেণির সকলে পুরো বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভে সক্ষম হবে।

অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি

অনুসন্ধানমূলক কাজ মূলত কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি। ডিউইর সক্রিয়তা তত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা এককভাবে বা দলগতভাবে নিজেদের প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় বা ঘটনা বা সমস্যার কারণ, ফলাফল ইত্যাদি উদঘাটন করে। নথিপত্র পর্যালোচনা, পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ নানাভাবে অনুসন্ধানমূলক কাজ পরিচালনা করা যায়।

উদাহরণ-

- যুবসমাজের আকাশ সংস্কৃতির প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ ও ফলাফল
- শিল্প অঞ্চলে বায়ু দূষণের কারণ ও ফলাফল

অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতিতে শিখন পদ্ধতির প্রক্রিয়া

প্রত্যেকটি অনুসন্ধানের জন্য একটি বিষয় বা সমস্যা নির্বাচন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রধানত পাঁচটি পর্যায়ে পরিচালিত হয়। পর্যায়গুলো হচ্ছে

- সমস্যা/উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- পরিকল্পনা প্রণয়ন
- তথ্য সংগ্রহ
- তথ্য বিশ্লেষণ
- প্রতিবেদন প্রণয়ন

সর্ব প্রথমে সমস্যা চিহ্নিত করা বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমগ্র কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কী কী করতে হবে, কোনোটি কিভাবে কী দিয়ে কখন করতে হবে—এ সবই পরিকল্পনায় থাকে। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধানমূলক কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। চতুর্থ পর্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণও ফলাফল প্রণয়ন করতে হবে। সর্বশেষ শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ অনুসন্ধানমূলক কাজের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

আবিষ্কার পদ্ধতি

এই পদ্ধতির মূল সূত্র হলো আরোহ পদ্ধতি এতে জ্ঞান অর্জনের চেয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াকে প্রধান্য দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে পাঠদানের উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোলের মতো বিষয়ের শুধু তথ্য ও তত্ত্ব গত জ্ঞান দেওয়া নয়। বরং সে তথ্যগুলো কিভাবে গৃহীত হয়েছে এবং এগুলো হতে কেমন তত্ত্বের সৃষ্টি হলো, কীভাবে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করা যায় ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতূহল সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই আবিষ্কারের মনোভাব নিয়ে নিজে নিজে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখবে এবং সীমিত শর্তে সিদ্ধান্ত পৌঁছাবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দিবেন না। তিনি পাঠ্য বিষয়কে সমস্যা আকারে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করবেন, পর্যবেক্ষণ সম্পাদন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ামাবলি নির্দেশনা পত্রের আলোকে সরবরাহ করবেন। শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভবে কাজ করে সিদ্ধান্ত উপনীত হবেন। কোনো সিদ্ধান্ত ভুল পথে গিয়ে যেন আগ্রহ না হারায় সেদিকে শিক্ষক সতর্ক থাকবেন এবং প্রয়োজনমতো নির্দেশনা দিবেন। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি অংশের ক্ষেত্রে আবিষ্কার পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

প্রজেক্ট /প্রকল্প পদ্ধতি

শিক্ষা প্রদানের জন্য দুটি বিষয় অপরিহার্য। ১. সমস্যা ২.সক্রিয়তা। বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শারীরিক ও মানসিক উভয়বিদ কর্মের মাধ্যমে শিক্ষালাভে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিকে বলে প্রকল্প পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের যে কোনো সমস্যামূলক বা বাস্তবমুখী কর্মই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যায়। অভিনয়, ভ্রমণ, চিত্রাংকন ইত্যাদি যাবতীয় তৎপরতা এর মাধ্যমে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়। স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনই হচ্ছে প্রকল্প পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। এ পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সংবলিত একটি সমস্যামূলক কাজ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় কাজটি করতে অর্থ্যাৎ সমস্যার সমাধান করতে হয়। কি শিখতে হবে আর কতটুকু শিখতে হবে তা আগে থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয় না। সমস্যা সমাধান করতে গিয়েই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখে নিতে পারে। এ পদ্ধতির উদ্ভাবক কিল প্যাট্রিক বলেন, "বিশেষ লক্ষ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষা কর্মে অগ্রসর হওয়ার প্রণালীকে প্রকল্প পদ্ধতি বলে"

প্রদর্শন পদ্ধতি

প্রদর্শন একটি কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি। এটি শ্রেণি পাঠদানের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব ঘটনা বা বিষয় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপনার একটি প্রক্রিয়া। এ উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের বাস্তবভাবে দেখানো/জীবন্তভাবে দেখানো। প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষক উপস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে/মাল্টিমিডিয়ায় দেখিয়ে এবং মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের হৃদয়াঙ্গম করতে সচেষ্ট থাকেন। এ পদ্ধতি ব্যবহারে ছবি চিত্র চার্ট, কিংবা কোনো কিছুর মডেলও কাজে লাগানো হয়। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষক সহজে অনেক কিছু শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। যেমন সৌরজগৎ, ভূমিকম্প ইত্যাদি। তাছাড়া শিক্ষক নিজে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ তৈরি করে প্রদর্শন করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদেরকেও উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরির জন্য উৎসাহিত করতে পারেন। যে সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর অনুপাতে যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব রয়েছে সেখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করা যায় এই প্রদর্শন পদ্ধতিতে। কাজের সুবিধার্থে প্রদর্শনের কাজগুলো ভাগ করে দেয়া যায়। যেমন– কেউ উপকরণ ব্যবহার করবে, কেউ কীভাবে তা সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায় সে কৌশলগুলো নির্দেশ করবে, কেউ প্রশ্নের উত্তর দিবে, কেউ সাধারণ ভাবনার উপর জোর দেবে, আবার কেউ অন্যের মতামত লিপিবদ্ধ করবে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠে পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র আলোচনা বা পাঠ্যপুস্তকের পাঠের মাধ্যমে অনেক কিছু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান বা ধারণা দিতে পারে না। বরং চাক্ষুস বা স্বচক্ষে দেখে ঐ জিনিস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করতে পারে। সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলতে বোঝায় কোনো মানসিক অবস্থা প্রত্যক্ষণ করার প্রক্রিয়া। পর্যবেক্ষণ দু'ভাবে হতে পারে-ক) মুক্ত পরিবেশে খ) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে। পর্যবেক্ষণের সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রাপ্ত তথ্য খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হয়। এতে সঠিক তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতিক পরিবেশে পর্যবেক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করা যায়। মুক্ত পরিবেশের পর্যবেক্ষণ কাজে লাগিয়ে আমরা সহজে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের বিষয়ের অনেক তথ্য জানতে ও আবিষ্কার করতে পারি। যেমন–স্থানীয় ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, সমাজ, পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বলতে কী বুঝায় ?
২. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কী কী ?
৩. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির উদ্দেশ্য কী ?
৪. শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায় কী ?
৫. মানচিত্র পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন।
৬. একক কাজ কী?
৭. দলগত কাজের সুবিধা কী কী?
৮. পোষ্ট বক্স কৌশল কী?
৯. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি পাঠদানে কীভাবে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখে ?
১০. প্রত্যক্ষীকরণের সুবিধা কী কী ?
১১. জোড়ার কাজ করার সুবিধা কী কী ?
১২. মাইন্ড ম্যাপিং কী ?
১৩. ব্রেইন স্ট্রর্মিং কী ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের সুষ্ঠু শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

২. কোনো বড় বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এক্সপার্ট জিকসো কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে ? পাঠদান পদ্ধতি হিসাবে ভূমিকাভিনয়ের সুবিধা ব্যাখ্যা করুন।

৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের পাঠদানের জন্য অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা লিখুন।

৪. শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মানচিত্র পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

৫. পোষ্ট বক্স কৌশল প্রয়োগের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন ।

৬. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করণের ক্ষেত্রে এক্সপার্ট জিকসো ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

৭. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের যে কোনো একটি বিষয়বস্তুকে মার্কট প্লেস পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপনের প্রক্রিয়া লিখুন।

৮. বশীকরণ মাইক পদ্ধতি কীভাবে বিষয়বস্তুকে সহজভাবে উপস্থাপন করতে সহায়তা করে ব্যাখ্যা করুন?

৯. মার্কেট প্লেসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায় লিখুন।

১০. রোল প্লে এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় কিভাবে সহজভাবে উপস্থাপন করা যায় ?

তথ্যসূত্র

১. মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট।

২. মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট।

৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় টেক্সট বই, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৫. প্রফেশনাল স্টাডিজ, এস.এম. শামসুজ্জামান, প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা,২০০৬

৬. মোঃ আঃ কুদ্‌দস, সুলতান, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ, মিতা ট্রেডার্স,২০০৭

৭. ইন্টারনেট

ইউনিট ৩ : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠের বিষয়বস্তু

জাতীয়তাবাদ আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ। আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার জাতীয়তাবাদী মনোভাব সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। জাতীয়তাবাদী চেতনা হঠাৎ উদ্ভব হয় না। দীর্ঘ দিনব্যাপী বিভিন্ন পটভূমিকায় অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশ বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠি ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্ত্বার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমনের পূর্বে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ডেনিস ও ফরাসিগণ বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্যের পাশাপাশি শাসনব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা করে কিন্তু তেমন সফলতা পায়নি। একমাত্র ব্রিটিশরাই এই উপমহাদেশে প্রায় দু'শত বছর রাজত্ব করে ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে যে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বিদ্যমান তাতে এখানকার জনগণের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন একটি স্বাভাবিক ব্যপার। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ হলো ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠি-অধ্যুষিত বিস্তৃত জনপদের একটি অংশ। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানের ঊপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই ইউনিটে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হলো-

৩.১ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের জাগরণ
৩.২ বাংলাদেশের অভ্যুদয়
৩.৩ বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ
৩.৪ বাংলাদেশের ভূমিরূপ ও জলবায়ু
৩.৫ বাংলাদেশের নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ
৩.৬ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রশাসনিক কাঠামো
৩.৭ বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ
৩.৮ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি
৩.৯ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন
৩.১০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
৩.১১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা, করণীয় ও মোকাবিলায় শ্রেণিভিত্তিক ধারণা প্রদান ও অনুশলীন

৩.১ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের জাগরণ

পটভূমি

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা আধুনিক কালের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ উপমহাদেশ ধন সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। উপমহাদেশের একটি অংশ হিসেবে বাংলা ধনসম্পদ ও রূপ সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যময়। ফলে বাংলায় বিভিন্ন সময়ে বিদেশি পর্যটক ও বণিকদের আগমন ঘটে। ১৬০০ সালে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য করার জন্য "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" নামে একটি বণিক সংগঠন গড়ে তুলে। ১৬০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর এ বণিক সংগঠনটি রাণী প্রথম এলিজাবেথের নিকট থেকে সনদ লাভ করে এবং তৎকালীন মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ভারতবর্ষে আগমন ঘটে। মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৩ সালে এক ফরমানের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। ধীরে ধীরে তারা বালেশ্বর, হুগলী এবং কাশিম বাজারে কুটি স্থাপন করে। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে ঐ অঞ্চলের কর আদায় ও দেওয়ানি বিচারের অধিকার পায়। এভাবে ধীরে ধীরে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা সরাসরি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ না করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন পাস করে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ১৭৭৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসন ব্যবস্থায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেনি। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তখন ১৭৭৩ সাল থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু রেগুলেটিং এ্যাক্ট এবং সনদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির কর্তৃত্বের বিলুপ্তি ঘটে। ১৮৫৮ সালে ব্রিটেনের মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজে ভারতবর্ষের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৬১ সাল পর্যন্ত ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীদের অংশগ্রহণের তেমন একটা সুযোগ ছিল না। ১৮৮৫ সালে উপমহাদেশে একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে সর্বপ্রথম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপরই ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসকগণ অনুভব করেন যে, জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসীকে শাসনব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন থেকে কোনো অবস্থাতেই দূরে রাখা সম্ভব নয়। তার কিছুদিন পরেই শাসন কার্যের সুবিধার্থে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করে। এরপর ১৯০৬ সালে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়। কিন্তু এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের তীব্র আন্দোলনের ফলে বিটেনের রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লির দরবারে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।

১৯০৯ সালে প্রণীত মর্লি মিন্টো সংস্কার আইন ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতবাসী ধনবল, জনবল দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করায় ১৯১৭ সালে ভারত সচিব মন্টেগু ভারতবর্ষে মন্টেগু-চেমস্ ফোর্ড নামক এক আইন ঘোষণা করেন। ঐ সময় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়। কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলে এই আইন ব্যর্থ হয়। ১৯৩৫ সালে প্রণীত ভারতশাসন আইনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তির উপর ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানগণ স্বতন্ত্র আবাস ভূমির দাবি উত্থাপন করে। ঐ সময়ে ইংল্যান্ডের নব নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলী উপলব্ধি করেন যে, ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধোত্তর দুর্বলতার ফলে এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশদের অধীনে ভারতীয় সাম্রাজ্যকে আর ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই ১৯৪৬ সালে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে মন্ত্রিমিশন পাঠান। মুসলিম লীগ মন্ত্রিমিশনের কাছে একটি আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি প্রবলভাবে তুলে ধরে। ইতঃপূর্বে ঐ দাবি আদায়ের জন্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। ইতোমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে বড়লাট হয়ে আসেন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসেই ভারত ছাড়বেন এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাকিস্তান প্রস্তাব এবং ভারত বিভক্তিকরণের সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারত বিভক্তিকরণ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষের উপর থেকে দীর্ঘ ২০০ বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মূলত তখন থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের জাগরণ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে 'বাংলা' দু'টি অংশে (পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববাংলা) বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝখানে ভারত অবস্থিত। এই দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় দেড় হাজার মাইল। এক মাত্র ধর্মের মিল ছাড়া পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, সভ্যতা, জলবায়ু, সমাজ কাঠামো, উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতি ছিল পরস্পর হতে পৃথক ও ভিন্ন। ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশের মানুষের মাঝে কখনো সু-সম্পর্ক ও সু-ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিল উপনিবেশিক এবং সংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও নির্যাতনের এক করুন ইতিহাস। মোট কথা গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি ক্ষমতার অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণ এবং সামরিক ও বেসামরিক শাসনতন্ত্রর প্রভাব ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ঊপনিবেশিক শক্তি এ দেশীয় মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসহ সক্রিয়তা ধ্বংস করে নিজেদের শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়। তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক শোষণ অব্যহত রাখতে গড়ে তোলে জন বিচ্ছিন্ন ক্ষমতাভোগী এক সম্প্রদায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদ হুমকির সম্মুখীন হয়। জাতীয়তাবাদের চেতনা জনগণের মধ্যে একদিনে বিকশিত হয় না। দীর্ঘদিন ব্যাপী বিভিন্ন পটভূমিতে অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে ধাপে ধাপে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্র এই চিত্রের কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বাঙালি বিরোধী মনোভাবের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত বিভিন্ন আন্দোলন থেকেই বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। তবে ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক, দমননীতি বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে আরো প্রগাঢ় করে তোলে। ফালে বাঙালি জাতীয়তাবাদে চেতনা আরো শক্তিশালী রূপ ধারণ কারণ। নিম্নে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে এর শাসকগোষ্ঠীর সাথে বাংলাদেশের মানুষের প্রথম সংঘাত বাঁধে ভাষার প্রশ্নে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গবাসীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র লিপ্ত হলে ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এ ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষী বা সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না, এ আন্দোলন ছিল পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণের জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিকাশের আন্দোলন। যা সমগ্র জাতিকে অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সংহতি ও একাত্মবোধের সৃষ্টি করে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়।

ভাষা আন্দোলন মূলত ১৯৫২ সালে সংগঠিত হলেও এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপিত হতে থাকে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৮ মে মজলিশে ইত্তেহাদুল মুসলেমিন এর উদ্যোগে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মেলনে উত্তর প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতারা ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এই প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র উর্দুকেই রাষ্ট্র ভাষায় পরিণত করার চেষ্টা চালায়। রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে তৎকালীন পূর্ব বাংলার (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান) সর্ব প্রথম পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত আন্দোলন শুরু করে "তমদ্দুন মজলিস"।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কাশেম লিখিত তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি পুস্তিকা বের হয়। ঐ সময়ে ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অবুল কালাম সামসুদ্দীন প্রমুখ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার জোরালো দাবি নিয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৪৮ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে উর্দুর সাথে বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ্ জোর দিয়ে বলেন, Urdu and only Urdu shall be the state language of pakistan অর্থাৎ "উর্দু এবং এক মাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা।" তবে ঐ ঘোষণার প্রতিবাদে সমাবর্তন সভায় উপস্থিত ছাত্ররা "না "না" প্রতিবাদ করে ওঠে। যদিও ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় তবে তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন "উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হবে। অন্য কোনো ভাষা নয়।" পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের এরূপ ঘোষণায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ সভায় সিদ্ধান্ত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্র ভাষা দিবস পালন করা হবে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখের কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি হরতাল এবং ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি সাফল্যের সাথে পতাকা দিবস পালিত হয়। কারাগারে আটক অবস্থায় ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও বন্দি মুক্তির দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমদ, আমরণ ধর্মঘাট শুরু করেন।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা, শোভাযাত্রা, ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শোভাযাত্রাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কলাভবন প্রাঙ্গণে সমবেত হতে থাকে। ছাত্রনেতা শহীদুল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের আমতলায় ঐতিহাসিক সভা শুরু হয়। সেখানে ছাত্র নেতা আব্দুল মতিনের প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রা সহকারে প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেইটের বাহিরে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা ভেদ করে অসংখ্য দলে বিভক্তি হয়ে ছাত্র/ছাত্রীরা শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে চলতে থাকে। মুখে ছিল তাদের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। শান্তিপূর্ণ এ মিছিলটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে এলে পুলিশ, ই.পি.আর, নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলে লাঠিচার্জ, রাবার বুলেট নিক্ষেপ, গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন এম.এ শ্রেণির ছাত্র বরকত, তেজোদ্দীপ্ত তরুণ সালাম, আব্দুল জব্বার ও সফিউর এবং বাদামতলি কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে রফিক। এছাড়া আরও ১৭ জন ছাত্র যুবক আহত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক এবং সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে শোভাযাত্রা সহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে।

অতঃপর ভাষা আন্দোলনের শহীদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্র-জনতা দ্বারা গড়ে উঠে 'শহীদ মিনার' যা ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মুসলীম-লীগ সরকার ঐ দিনই অপরাহ্নে শহীদ মিনারটি ভেঙে ফেলে। কিন্তু বাঙালি হৃদয়পটে সে স্মৃতির মিনার গাঁথা হয়েছিল তা আজও মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ এবং এর ব্যাপক গণসমর্থন পাকিস্তানের সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে এমন এক ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বাংলাকে অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। আর এভাবে ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষা বহু রক্তের বিনিময়ে সুমহান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের জাগরণের ক্ষেত্রে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরূদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কয়েকটি বিরোধী দলের সমন্বয়ে গড়ে উঠা ঐক্যজোট। যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ সরকারকে পরাজিত করে পূর্ব বাংলায় তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন তথা ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের ব্যপক সাফল্য জাতির ইতিহাসে এক অসাধারণ ও অবিস্মরণীয় ঘটনা। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক ও উপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করতে থাকে। ফলে সকল ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সকল রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে লিয়াকত আলী খান, সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে খাজা নাজিমুদ্দিনকে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এর প্রতিবাদে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর জন্ম হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ বাঙালিদের দাবি দাওয়ার সাংগঠনিক মুখপাত্রে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করলে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ভিত্তিতে তরুণ ও উদীয়মান রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

(সূত্রঃ শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত অত্মজীবনী, পৃষ্ঠা নং ২৫৭)

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি

১। **রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা :** বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

২। **জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও করহ্রাস :** বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে। উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে।

৩। **পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান :** পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন করে পাট উৎপাদকের উপযুক্ত মূল্য দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

৪। **কুটির শিল্পের উন্নতি :** কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।

৫। **লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন :** পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটিরশিল্প ও লবণ উৎপাদনের জন্য বৃহৎ কারখানা স্থাপন করা হবে।

৬। **বাস্তুহারাদের পূর্নবাসন :** শিল্প ও কারিগরি শ্রেণির গরিব বাস্তুহারাদের কাজের আশু ব্যবস্থা করে, তাদের পুনঃ বসতির ব্যবস্থা করা হবে।

৭। **খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা :** খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

৮। **খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা :** পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হবে।

৯। **বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন :** দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১০। **শিক্ষার সংস্কার সাধন :** শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করে কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত করে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১১। **বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান :** ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হবে। ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হবে।

১২। **আয়ের সামঞ্জস্য বিধান :** শাসন-ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হবে। এ উদ্দেশ্যে বেতনভোগীদের বেতন কমিয়ে ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়িয়ে তাদের আয়ের একটি সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করা হবে।

১৩। **আয়ব্যয়ের হিসাব :** দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল থেকে বর্তমান সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব নেয়া হবে এবং সন্তষজনক কৈফিয়াত দিতে না পারলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৪। **কালাকানুন রহিত :** জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করে বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হবে। সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হবে।

১৫। **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে।

১৬। **বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত :** যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করবেন। বর্ধমান হাউসকে আপততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।

১৭। **শহীদ মিনার নির্মাণ :** বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যারা, মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হয়েছেন, তাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে শহীদ মিনার নির্মাণ এবং তাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

১৮। **শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা :** ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে একে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।

১৯। **পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা :** লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্ব দেয়া হবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ছাড়া অন্য সব বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতা) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে দেওয়া হবে। দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

২০। **মন্ত্রিসভার পদত্যাগ :** যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হবার ছয় মাস আগেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

২১। **উপনির্বাচনের ব্যবস্থা :** যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হবে, তিন মাসের মধ্যে তা পূরণের জন্য উপনিবার্চনের ব্যবস্থা করা হবে। পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

সুতরাং বলা যায় যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে, সেটিকে ১, ১৬, ১৭ ও ১৮নং দফায় স্থায়ীরূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। আর ১৯ নং দফায় পূর্ব বাংলার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হয়। এভাবে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের উপর বিশেষ জোর দেয় এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে প্রাধান নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত করে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

আসনের প্রকৃতি ও সংখ্যা	রাজনৈতিক দল বা জোটের নাম	প্রাপ্ত আসন
মুসলিম আসন সংখ্যা-২৩৭টি	১। যুক্তফ্রন্ট	২২৩
	২। মুসলিম লীগ	৯
	৩। নির্দলীয় সদস্য	৪
	৪। খেলাফতে রব্বানী	১
		২৩৭টি
অমুসলিম আসন সংখ্যা-৭২টি	১। কংগ্রেস	২৪
	২। তফসিলি ফেডারেশন	২৭
	৩। যুক্তফ্রন্ট	১৩
	৪। খ্রিষ্টান	১
	৫। বৌদ্ধ	২
	৬। কমিউনিস্ট পার্টি	৪
	৭। নির্দলীয় সদস্য	১
		৭২টি
	সর্বমোট আসন (২৩৭+৭২) = ৩০৯টি	

সূত্র: প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মণ, বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক উন্নয়ন, পৃষ্ঠা নং-৪৭

১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন

১৯৬২ সালে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক সংবিধান প্রকাশিত হওয়ার পর তা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র আন্দোলনও দানা বাধতে থাকে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা আন্দোলনের সাথে সাথে গণতন্ত্র, সংসদীয় সরকার, মৌলিক অধিকার ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবি ও মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৬২ সালে জনপ্রিয় ছাত্রসংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তিনটি প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে' ৬২-এর আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিষয়গুলো হচ্ছে–

- হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দীর গ্রেফতার
- ১৯৬২-এর আইয়ুবি সংবিধান
- শরিফ শিক্ষা কমিশন রির্পোট

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি আইয়ুব সরকার আকস্মিকভাবে করাচিতে হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে। এই গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে সামরিক শাসন বিরোধী বিক্ষোভ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। আইয়ুব খান এত ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠার কথা ভাবতে পারে নি। এ ছাত্র আন্দোলন তার ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে তোলে। ১৯৬২ সালের আগস্টে সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। ছাত্ররা এই সময় ৩ দফা দাবি উত্থাপন করে।
যথা :

১. সংবিধান বাতিল কর
২. সকল রাজবন্দীদের মুক্তি এবং
৩. দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

উপরোক্ত দাবির প্রেক্ষিতে ছাত্রদের গড়ে ওঠা আন্দোলন সামরিক শাসক আইয়ুব খানকে বেকায়দায় ফেলে। ছাত্ররা রাজনীতিবিদদের নির্বাচন বয়কট করার আহ্বান জানান। এদিকে ১৯৬২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে 'শরীফ কমিশন রিপোর্ট' বা 'শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' প্রকাশিত হলে ছাত্র সমাজে একে প্রতিক্রিয়াশীল, গণবিরোধী, শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে গণ্য, বাংলা ভাষার বিরূদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে।

১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ভাষণ দেয়ার কথা ছিল কিন্তু ছাত্রদের বিক্ষোভের জন্য তা তিনি করতে পারেন নি। অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ছাত্রদের শায়েস্তা করার জন্য পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দেন। পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের উপর। ফলে তিন জন নিহত ও দু'শতাধিক ছাত্র-জনতা আহত হয়। অসংখ্য ছাত্র জনতাকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এতদসত্ত্বেও ছাত্ররা দমেনি এতটুকু। তারা ১৪৪ দ্বারা ভঙ্গ করে এবং আইয়ুব খানের কুশপুত্তলিকা দাহ করে। এ হামলার প্রতিবাদে ২৯ সেপ্টেম্বর (১৯৬২) সমগ্র প্রদেশে সাধারণ ধর্মঘট ও দমননীতি দিবস পালিত হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ হত্যাকাণ্ড ও গ্রেফতারের নিন্দা করেন এবং তৎকালীন গভর্নর গোলাম ফারুকের নিকট এর তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এর প্রভাব গিয়ে পড়ে দেশের বিদ্যমান সরকার বিরোধী আন্দোলনের উপর।

১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন

শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ছয়দফা অন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শাণিত করে। এর ফলে আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটায় এবং জাতীয়তাবাদের চেতনায় উজ্জীবিত ছয়-দফা আন্দোলনের প্রতি সরকারের কঠোর দমননীতির মনোবল আরো দৃঢ়রূপ ধারণ করে। ১৯৬৬ সালে বাংলার মানুষের স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত হয়ে গণবিক্ষোভের সূচনা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধ চলাকালে বাঙালিরা সামরিক অসহায়ত্বের পাশাপাশি বহুবিধ অসুবিধা তীব্রভাবে অনুভব করে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান অনগ্রসর ও পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল ছিল। যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, বাঙালিরা আরও দুর্দশায় পড়ে। কাজেই বাঙালিরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে বাঙালি জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য রবীন্দ্র সঙ্গীতকে বেতারে প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারের এ হীন ষড়যন্ত্রর বিরুদ্ধে দেশের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সমাজ তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরূদ্ধে ও বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের চক্রান্তর বিরূদ্ধে যখন বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ, তখন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এ কর্মসূচি পেশ করেন। এটাই ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি নামে খ্যাত। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এ কর্মসূচির ভূমিকায় বলেন, "ভারতের সাথে বিগত সতের দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আজ নতুনভাবে চিন্তা করে দেখা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থার আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাকিস্তানের দুটি অংশ যাতে ভবিষ্যতে আরও সুসংহত এক রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, এ লক্ষ্য সামনে রেখেই আমি দেশবাসী, জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের আজকের কর্ণধারদের কাছে ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করছি।"

ছয় দফা কর্মসূচিসমূহ

প্রথম দফা

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি : ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার হবে পার্লামেন্ট পদ্ধতির। প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। পাকিস্তানের আইন পরিষদ হবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলো গঠিত হবে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় দফা

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা : কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে শুধু দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র এ দুটি বিষয়ে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

তৃতীয় দফা

মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা : মুদ্রা ও অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতার ক্ষেত্রে দুটি বিকল্প প্রস্তাব করা হয়। এ দুইটি প্রস্তাবের মধ্য থেকে যে কোনো একটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রস্তাব দুটি নিম্নরূপ :

ক) **পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা :** পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথবা সহজ বা অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। এক্ষেত্রে দু অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র বা পৃথক স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রার পরিচালনা ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারে হাতে। অথবা-

খ) **একই মুদ্রা ব্যবস্থা :** দেশের দু অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে। তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে। বিশেষ করে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য সংবিধানে কার্যকর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থাসহ পৃথক অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

চতুর্থ দফা

রাজস্ব কর ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা : সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারে হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ব্যাপারে কোনো ক্ষমতা থাকবে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে।

পঞ্চম দফা

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা : পঞ্চম দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে নিম্নরূপ সাংবিধানিক বিধানের সুপারিশ করা হয়। যেমন-

ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের বহিঃবাণিজ্যের পৃথক পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

খ) বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলোর এখতিয়ার থাকবে এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রয়োজনে অঙ্গরাজ্যগুলো কর্তৃক ব্যবহৃত হবে।

গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমানহারে অথবা সর্বসম্মত নিদির্ষ্ট হারে অঙ্গরাজ্যগুলো মিটাবে।

ঘ) অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্য চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা করজাতীয় কোনোরূপ বিধি নিষেধ থাকবে না।

ঙ) সংবিধানের অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণের এবং স্ব-স্ব স্বার্থে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

ষষ্ঠ দফা

আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা : এ দফায় নিম্নলিখিত দাবিসমূহ পেশ করা হয়:-

ক) আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বাহিনী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।

খ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল শাখায় বা চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিট থেকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করতে হবে।

গ) নৌবাহিনীর সদর দপ্তর করাচি থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তর করতে হবে।

সুতরাং দেখা যায় যে, ১৯৬৬ সালের ছয়-দফা ছিল মূলত বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি। অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে বাঁচার দাবি।

সবশেষে বলা যায় যে, পাকিস্তানি শোষণ, বঞ্চণা, নির্যাতন ও নিগ্রহের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে বাঙালিদের স্বাধীন সত্ত্বারূপে বিকশিত হবার ক্ষেত্রে ছয় দফা কর্মসূচি ছিল সুপরিকল্পিত এক কর্মসূচি। ব্রিটিশ গণতন্ত্রর ইতিহাসে যেমন ম্যাগনাকার্টা, ফরাসি বিপ্লবের মৌলভিত্তি যেমন ছিল অধিকার বিল, আমেরিকার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং রুশ বিপ্লবের ভিত্তিতে যেমন ছিল শ্রেণিহীন সমাজের ধারণা তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মৌল ভিত্তি ছিল ছয় দফা কর্মসূচি।

১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে শুরু হওয়া দুর্দমনীয় গণআন্দোলনের জোয়ার বাঙালি জাতীয়তাবদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির, নির্যাতন, গ্রেফতার সব কিছুকে উপেক্ষা করে তাদের মুক্তির সনদ ছয় দফা তথা অত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দুর্বার সংগ্রামের শুভসূচনা করেন। ইতোমধ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দেয়া এগার দফা দাবি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরও শাণিত করে গণআন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ এ মরণপণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়।

গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃতি

১৯৬৯ সালের মাঝমাঝি পর্যন্ত আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মূলত ছাত্র সমাজের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু এরপর হতে অন্যান্য গোষ্ঠি বিশেষত কৃষক, শিল্প শ্রমিক, রাজনৈতিককর্মী সকলে আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। ফলে আইয়ুব বিরোধী গণঅন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি (ডাক) এর আহ্বানে সমগ্র পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন পরিষদের মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে সংগ্রাম পরিষদ ১৭ জানুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান করে। ১৮ জানুয়ারি হরতালের দিন (সার্ক) এর ১১ দফার আন্দোলন জঙ্গিরূপ ধারণ করে। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনের গতিকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালায়। ২০ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন ছাত্র আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে নিহত হলে পূর্ব পাকিস্তানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এ ঘটনায় ছাত্রদের মধ্যে ক্রোধের আগুন প্রজ্বলিত করলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২১ জানুয়ারি হরতাল, ২২ জানুয়ারি শোক মিছিল এবং ২৩ জানুয়ারি মশাল মিছিল বের করে। ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি গণমিছিল জনতার গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। সমগ্র পাকিস্তানে গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। রক্তলোলুপ আইয়ুব খান এবারে নতি স্বীকার করতে বাদ্য হন জনতার কাছে। ১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তিনি বিরোধী দলগুলোর সাথে আলাপ আলোচনার প্রস্তাব রাখেন এবং ৮ ফ্রেব্রুয়ারি ইত্তেফাক পত্রিকার উপর থেকে বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রত্যাহার করেন। ৯ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ পদত্যাগ করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে ধার্য্যকৃত রাজবন্দীদের নিঃশর্তে মুক্তি প্রদানের রায় হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদকে মুক্তি দেয়া হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে নির্মমভাবে হত্যা করা হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ঢাকা শহর। উন্মত্ত জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতি এম. এ. রহমান, রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণাকারী আইয়ুব খানের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ও কুখ্যাত সহচর এবং তৎকালীন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা লস্কর আসকারীর বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে। ফলে সরকার ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে সারা দেশ থেকে জরুরি আইন প্রত্যাহার করে নেয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে পাকিস্তানি সেনারা কোনো কারণ ছাড়াই নৃশংসভাবে বেয়নেট চার্জ করে নির্মমভাবে হত্যা করে অধ্যাপক ডঃ শামসুজ্জোহাকে এবং এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। ঢাকায় সান্ধ্য আইন উপেক্ষো করে জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। নির্বিচারে গুলি চালায় সেনাবাহিনী।

১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঘোষণা করেন যে, তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। তিনি গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব এবং শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৬৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে ডাকা সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের এক 'গোলটেবিল বৈঠকে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও যোগদান করেন। তবে জুলফিকার আলী ভূট্টো ও মাওলানা ভাসানী বৈঠকে যোগদান করেন নি। বৈঠকে আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে কতকগুলো বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়–

- সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।
- পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।
- সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করা হবে।

উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে আইয়ুব খান ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ একমত হলে ঐ বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তিনি তার দলের ৬ দফা দাবি এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবিসহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট প্রথা, মুদ্রা, বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও ব্যয়কে সমর্থন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা ও প্রস্তাবনা শুনে আইয়ুব খান আঁতকে ওঠেন। ১৯৬৯ সালের ১৩ মার্চ আইয়ুব খান উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে দুটি প্রস্তাব মেনে নেন।

প্রস্তাব দুটি নিম্নরুপ–

১. সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নিবার্চন এবং
২. সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন।

আইয়ুব খানের প্রস্তাবে ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি না থাকায় শেখ মুজিব বৈঠক বর্জন করেন এবং ১৯৬৯ সালের ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। ফলে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সকল আলোচনা ব্যর্থ হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'যদি পূর্ব পাকিস্তানের দাবিদাওয়ার প্রশ্নে এসব নেতার ঐক্যবদ্ধ সমর্থন পাওয়া যেত, তাহলে প্রেসিডেন্টের পক্ষে সে সব দাবি মেনে নেয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকত না। শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উক্ত সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, গণদাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। জনগনের এ মনোভাব তৎকালীন লৌহমানব আইয়ুব খানকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে গণঅভ্যুত্থান আরো দুর্বার এবং অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে ফলে ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া কোনো পথ খোলা ছিলো না। জনতার রায়কে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান তদানীন্তন প্রধান সেনানায়ক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে চিঠি লিখে ক্ষমতা গ্রহণের আহ্বান জানালে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করেন। এইভাবে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন জারি হয়। তাই বলা যায় যে, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমেই পাকিস্তানের ইতিহাসের লৌহমানব আইয়ুব খানের পতন ঘটে। দীর্ঘ তিন বছর গণআন্দোলন চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানিরা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করে সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি করে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

নির্বাচনের পটভূমি

১৯৬৮-৬৯ এর গণআন্দোলনের ফলে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ তার স্থলে অধিষ্ঠিত তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধান সেনানায়ক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন জারি করেন। ইতোমধ্যে ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ১ মার্চ এক আদেশ বলে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে পূর্বতন প্রদেশগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ এক ব্যক্তি এক ভোট নীতির ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালে ৩০ মার্চ তিনি আইনগত কাঠামোর আদেশ জারি করেন। উক্ত আদেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোর গঠনকাঠামো ও কাজ করার নীতি নির্দেশিত হয়।

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, যতশ্রীঘ সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি হতে যাবতীয় বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান কিছু প্রতিক্রিয়াশীল আমলা ও রাজনীতিবিদদের পরামর্শে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করেন। ১৯৭০ সালের ১৫ আগস্ট এক বেতার ভাষণে তিনি পূর্ব নিধারিত ৫ অক্টোবর ও ২২ অক্টোবরের নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ৭ ডিসেম্বরে জাতীয় পরিষদ ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য্য করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের আসনসংখ্যা ছিল সাধারণ ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি। অন্যদিকে প্রাদেশিক পরিষদের সর্বমোট আসনসংখ্যা ছিল ৬২১টি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৩০০টি মহিলা আসন ১০টি, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আসন ৩০০টি মহিলা ১১টি। এ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো পৃথক পৃথকভাবে প্রার্থী মনোনীত করেন।

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ছিল অসাধারণ। এ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সমাপ্ত হয়। কিন্তু নভেম্বরে বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাসের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ৯টি আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে নি। পরবর্তীতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি।

ক) জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি.পি.পি) দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করে। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ প্রদত্ত ভোটের ৭৫.১১% ভোট লাভ করে এবং পূর্ব পাকিস্তান অংশের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী ১৬৭টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে ১৬০টি ছিল সাধারণ আসন এভং ৭টি ছিল সংরক্ষিত মহিলা আসন। অবশিষ্ট ২টি আসনের মধ্যে ১টি পান পি.পি.পি প্রধান নূরুল আমিন এবং অপরটি পান নির্দলীয় প্রার্থী পার্বত্য চট্রগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় চৌধুরী ।

নিচে ছকের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল দেয়া হলো-

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান	কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	সংরক্ষিত মহিলা	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬০						৭	১৬৭
পিপিপি		৬৪	১৮	১			৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)		১	১	৭				৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)		৭						৭
জমিয়ত উল-উলেমা-ই-ইসলাম হাজারভী				৬	১			৭
মারকাযী জমিয়ত-উল-উলেমা ইসলাম		৪	৩					৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)				৩	৩		১	৭
জামায়াত-ই-ইসলামী		১	২	১				৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)		২						২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)	১							১
স্বতন্ত্র	১	৩	৩			৭		১৪
মোট	১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

সূত্রঃ Election Comminssion Pakistan Report on General Election in Pakistan 1970-71, Islamabad 1972,p-204-205

খ) প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৭০.৪৮% ভোট লাভ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে সর্বমোট ২৯৮টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে ২৮৮টি ছিল সাধারণ আসন এবং ১০টি ছিল সংরক্ষিত মহিলা আসন। এভাবে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

নিচে ছকের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নিবার্চনের ফলাফল দেয়া হলো

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল–

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন	মহিলা আসন	মোট আসন	প্রাপ্য ভোট শতাংশ
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮	৭০.৪৫
পিডিপি	২		২	১.৯৮
ন্যাপ (ওয়ালী)	১		১	৩.২৭
জামায়ত-ই-ইসলামী	১		১	৪.৫০
নেজামে ইসলামী	১		১	১.৪৮
স্বতন্ত্র বা নির্দলীয়	৭		৭	১০.৭৬
পরাজিত দলসমূহ				৭.৫৬
	৩০০	১০	সর্বমোট = ৩০০	১০০

সূত্র: Report on General Election 1970-71,Vol.1,p-1072, স্বাধীনতার দলিলপত্র:২য় খণ্ড,পৃ: ৫৮৬

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

জাতীয়তাবাদী চেতানায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের আপামর জনগণ ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্জয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ভাষা আন্দোলনে বিকশিত বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তব রূপ ধারণ করে। বস্তুত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এদেশের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগের মাধ্যমে লাল সবুজের পতাকা ছিনিয়ে আনতে উদ্বুদ্ধ করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে বিকশিত হয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাস্তবরূপ লাভ করে। জাতীয়তাবাদী চেতনাই এদেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে জাতীয় সঙ্গতি ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে। সকল প্রকার জুলুম নির্যাতনের বিরূদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের মনোভাবের উন্মেষ ঘটিয়ে পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করে। জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতেই বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠী পাকিস্তানি শাসকদের গণবিরোধী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরূদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদের বিজয়ই আজকের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

সবশেষে বলা যায় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়েই বাঙালিদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। এই নির্বাচনে জয় লাভ করে বাঙালিরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনাই বাংলাদেশের আপামর জনসমষ্টিকে পাকিস্তানি শাসকদের গণবিরোধী ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলে স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে অনুপ্রেরণা জোগায়। প্রতিষ্ঠিত হয় বহুল প্রত্যাশিত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এটা মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়।

৩.২ বাংলাদেশের অভ্যুদয়

একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেম হচ্ছে জাতীয়তাবাদেরই একটি রূপ। যার বিশ্বাস জাতির গৌরবময় ইতিহাস, বীরত্ব ও শৌর্যবীর্যের ইতিহাস জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করে। আর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিশ্বের স্বাধিকার আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ভাষা, সংস্কৃতি সৃষ্টি ও ঐতিহ্যসহ বিভিন্ন কারণে বাঙালি জাতি অন্যান্য জাতিসত্ত্বা হতে পৃথক। আজকের এই বাংলাদেশের ইতিহাস প্রায় তিনশত বছরের পুরনো। মধ্য ভারতের মগদ থেকে শুরু করে পূর্ব সীমানার কামরূপ এলাকা পর্যন্ত বিভিন্ন সম্রাজ্য, বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন স্বাধীন ভূ-খণ্ডের সামগ্রিক ইতিহাসে বাংলাদেশকে খুঁজে পাওয়া যায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের গোড়া পত্তন হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে বণিকের মানদণ্ড পরিণত হয়েছিল রাজদণ্ডে। দু'শো বছরের ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় এক নতুন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়

ঊপনিবেশিক শক্তি দেশীয় মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসহ স্বকীয়তা ধ্বংস করে নিজেদের শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়। সর্বোপরি নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ অব্যাহত রেখে গড়ে তোলে জনবিচ্ছিন্ন ক্ষমতাভোগকারী বিশেষ একটি সম্প্রদায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে। জন্মলগ্নে এর পূর্ব অংশ পূর্ব বাংলা নামে অভিহিত হয়। ১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মারি চুক্তি মোতাবেক পশ্চিমাংশের ৪টি প্রদেশ (পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) এবং ৫টি দেশীয় রাষ্ট্র (বেলুচিস্তান রাজ্য ভাওয়ালপুর রাজ্য, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ রাজ্য, খায়েরপুর রাজ্য ও জুনাগড় রাজ্য) এবং কিছু উপজাতি মিলে একটি প্রদেশ গড়ে তোলা হয়। পশ্চিমের সব প্রদেশ এবং রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি প্রদেশ গড়ে তোলা হয়। যার নামকরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করা হয়। এবং একটি প্রদেশের মর্যাদা দেয়া হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝখানে ভারত অবস্থিত। এই দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় দেড় হাজার মাইল। এক মাত্র ধর্মের মিল ছাড়া পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, আচার, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সভ্যতা, জলবায়ু, সমাজ কাঠামো উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতি ছিল পরস্পর হতে পৃথক ও ভিন্ন। ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশের মানুষের মাঝে কখনো সু-সম্পর্ক ও সু-ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিল ঊপনিবেশিক এবং সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও নির্যাতনের এক করুণ ইতিহাস। মোট কথা গণতন্ত্রর অনুপস্থিতি ক্ষমতার অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণ এবং সামরিক ও বেসামরিক শাসনতন্ত্রের প্রভাব ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি, উন্নয়নে অংশগ্রহণ, সর্বোপরি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাঙালি জাতি নিজস্ব আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কয়েক মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ ঊপনিবেশিক শাসনের বদলে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ বাঙালি জাতির উপর চেপে দেয়। কেননা উপনিবেশবাদ শাসন কাঠামোতে কোনো একটি বিদেশি শক্তি যা জোর পূর্বক একটি ভূখণ্ড বা সম্প্রদায়ের উপর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কঠোর দমন নীতি স্থানীয়দের ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শোষনের মাধ্যমে সেই ভূখণ্ড বা সম্প্রদায়কে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে রাখার নীতি গ্রহণ করে। মোট কথা দেশীয় সংস্কৃতি ধ্বংসের মাধ্যমে নিজেদের শোষণ ও শাসন শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখে। একই প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদে একই রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে ওঠে একটি প্রভুত্বকারী শোষকগোষ্ঠী । এ ধরনের পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদ হুমকি সম্মুখীন হয়।

জাতীয়তাবাদের চেতনা জনগণের মধ্যে একদিনেই বিকাশ ঘটে না। দীর্ঘদিন ব্যাপী বিভিন্ন পটভূমিকায় অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে ধাপে ধাপে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্র এই চিত্রের কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বাঙালি বিরোধী মনোভাবের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত বিভিন্ন আন্দোলন থেকেই বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। তবে ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দমননীতি বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে আরও প্রগাঢ় করে তোলে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা চলতে থাকে। সুকৌশলে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের উপর শাসন ও শোষণ চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে দীর্ঘ ২৪ বছরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয় বৈষ্যমের পাহাড়। এ বৈষম্য দেখা দেয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

নিচে বৈষম্যগুলো পর্যায়ক্রমে আলোচিত হলো

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুর্দশায় উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল দু'অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানকে কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে দেয়া হয়নি। জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় শিল্পের দিক থেকে ছিল উন্নত। কিন্তু কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ছিল অগ্রগামী। এখানে পাট, চা, চামড়া, রেশম, ও প্রচুর পরিমাণ বাঁশ উৎপাদিত হতো। এ সব সামগ্রীগুলো ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করার মতো কোনো শিল্প কারখানা পূর্ব বাংলায় ছিল না। যার কারণে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার উৎপাদিত কাচাঁমাল দিয়ে পণ্য উৎপাদন করে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপণ্যের বাজারে পরিণত করে। তৎকালীন সময়ে যে মুসলমান ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল তারা

অধিকাংশই লাহোর করাচি ইত্যাদি পশ্চিম পাকিস্তানি শহর বন্দরে ভিড় জমায়। তারা সেখানে তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করলে ঐ সব শহরের চাকচিক্য বেড়ে যায়। এ ছাড়া পাকিস্তানি সরকার রিফিউজি ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করলে তারা অবাধে আমদানি রফতানির লাইসেন্স পান। তারা বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে তার দ্বারা উৎপাদিত পণ্য পূর্ববাংলার বাজারে বিক্রয় করে যে মুনাফা লাভ করেন তার মাধ্যমেই তারা পশ্চিম পাকিস্তানের রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজসহ অবকাঠামোগত যাবতীয় উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হন।

আইয়ুবী শাসনমলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রা পূর্বের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। পাকিস্তানের সমস্ত ব্যাংক বিমার মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। ফলে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য তারা যেমন পাকিস্তান সরকারে আনুকূল্য পায়, তেমনি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাংকগুলো পর্যাপ্ত ঋণ দানের ব্যবস্থা করে। আদমজী ইস্পাহানী, বাওয়ানী হাজী দাউদ প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যবসায়ীরা পাকিস্তানের সিংহভাগ শিল্প মূলধনের মালিক ছিল। তারাই পাকিস্তানের অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। তারা এসব ব্যবসায়ের ফলে যে মুনাফা লাভ করত তা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরি করেছিল। মুদ্রা ও অর্থনীতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকায় সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় আয় পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেত। শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিমা ও ব্যাংক বিদেশি দূতাবাস প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যমান থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পশ্চিম পাকিস্তানের দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। এছাড়া উদ্ধৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় পাকিস্তানে জমা থাকত বিধায় পূর্ব পাকিস্তানে কখনো মূলধন গড়ে ওঠেনি।

পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার দুই-তৃতীয়াংশ অর্জিত হতো পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের চাষিরা কখনো পাটের ন্যায্য মূল্য পেত না। ফলে তাদের দারিদ্র্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। চা উৎপাদন ও বস্ত্র উৎপাদনে পূর্ব পাকিস্তান সামান্য এগিয়ে থাকলেও শিল্পক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ছিল অনগ্রসর। পাটকলসহ যে কয়টি শিল্প কারখানা এদেশে ছিল সেগুলোর অধিকাংশেরই মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এক কথায়, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত করেছিল। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত পণ্য কাঁচামাল হিসেবে নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে তার বহুগুণ বেশি মূল্যে পূর্ব পাকিস্তানেই বিক্রয় করা হতো। ফলে শিল্প ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে নির্ভরশীল থাকতে হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উপর ।

রাজনৈতিক বৈষম্য

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় বাঙালিদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ যখনই স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে চালু রাখার দাবি জানায় তখনই পশ্চিমারা তাদের দেশদ্রোহি ও বিশৃঙ্খলাকারী হিসাবে চিহ্নিত করে ঐ দাবিকে নস্যাৎ করে দেয়া হতো। গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, ও সামরিকতন্ত্রর মাধ্যমে তারা দেশ শাসন করতে থাকে। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের উপর উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে সমাজ, রাজনীতি অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শোষণ করে তারা তাদের অংশের অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ঘটায়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয় পূর্ব বাংলার জনগণ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তৎকালীন সময়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে মুসলিম লীগের তরুণ ও প্রগতিশীল অংশ বাধ্য হয়ে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো যখনই স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানায় তখনই তাদের ভিন্নধর্মী, কাফের, ভারত রাশিয়ার দালাল ও কমিউনিস্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর দমন নিপীড়ন চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অচল করে রাখে। পূর্ব বাংলার জননেতা শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকসহ এ অঞ্চলের সকল জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করে, বার বার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাংলার জাতীয় নেতাদের অন্যায়ভাবে জেলেবন্দি করে রাখে। এমন কি বঙ্গবন্ধুর নামে আগরতলা মামলা করে তাকে অন্যায়ভাবে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। পরবর্তীকালে তাকে প্রহসনমূলক বিচারেরও সম্মুখীন হতে হয়।

শাসন কাঠামোর পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব

শাসনব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্বের হার ছিল খুবই নগণ্য। শুরুতেই পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী সমগ্র পাকিস্তানের শাসনভার উর্দুভাষী রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। পূর্ব বাংলার বাঙালিদের পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই ২৩ বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র একবার (১৯৪৭-৫১) পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধানের পদ লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৪৭–৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় ৪ জন গভর্নরের মধ্যে মাত্র ১ জন

ছিলেন বাঙালি। আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছাড়া আর কোনো বাঙালি শাসককে রাষ্ট্র ক্ষমতায় দেখা যায় নি। আর বাকি দু'জন খাজা নাজিমউদ্দীন এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পশ্চিম পাকিস্তানেরই তাবেদার ছিলেন। এভাবে দেখা যায় যে, পূর্ব বাংলার জনগণ স্বল্প সময়ের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা পেলেও সে ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারে নি। অর্থাৎ বাঙালিদের পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় পৌঁছাতে দেয়া হয়নি। রাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যা রাজনৈতিক, প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক বা কূটনৈতিক যে কোনো বিষয়েই হোক না কেন সেখানে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির মতামতই প্রাধান্য পেতো।

বাঙালিরা নিজ প্রদেশেও স্বশাসনের সুযোগ পায়নি। যেখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলো দখল করে রেখেছিল কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের অনুগত পশ্চিম পাকিস্তানিরা। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত এসব পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা বাঙালিদের পদে পদে হেয় প্রতিপন্ন করত। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তানের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন না করে এক ব্যক্তির শাসন জারি করেন। তিনি নিজ হাতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং রাজনৈতিক দলের সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে। ফলশ্রুতিতে তার উত্তরসুরিরা পরবর্তীকালে তাকে অনুসরণ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা চালায় এবং পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে ব্যর্থ হয়। মোহাম্মাদ আলী জন্নাহ, লিয়াকত আলী খান তাদের জীবদ্দশায় পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করে যেতে পারেন নি। তাই তো পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করতে সময় লেগে ছিল প্রায় নয় বৎসর। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি-দাওয়া প্রদানের ব্যাপারে আইন পরিষদ, কিংবা কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করেন নি। এমনকি ১৯৬২ সালে প্রণীত সংবিধানও ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। উক্ত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের দীর্ঘ ২৯ মাস পর লিয়াকত আলী খানের প্রস্তাব অনুসারে গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ করে। এরপর ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারণের জন্য ২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। এই মূলনীতি কমিটি পাকিস্তানের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকবার গণপরিষদে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ সংঘাতের কারণে রিপোর্টগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে গণপরিষদ দীর্ঘ আট বছর ধরে চেষ্টা করেও পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে পারেনি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকার সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠন করে দ্বিতীয় গণপরিষদ। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার গণপরিষদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই পাকিস্তানের অংশ হিসাবে পূর্ব বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবস্থা ছিল খুবই পশ্চাদপদ। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে আসছিল। পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে প্রায় দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানের কারণে উভয় অঞ্চলের জনগণের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হতে পারেনি। এই দুই অংশের জনগণের মাধ্যে কেবল মাত্র ধর্মগত ঐক্য ছাড়া আর কোনো বিষয়ে তেমন কোনো মিল ছিল না। ফলে একই রাষ্ট্রের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও দুই অঞ্চলের জনগণের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ, পেশা, জীবনযাত্রা, চাল-চলন, সভ্যতা, কোনো কিছুর মধ্যেই কোনো মিল ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের শতকরা ৮৫ জন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমরা মনে করত যে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানগণ প্রকৃত মুসলমান নয় এবং তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ। পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি এক ধরনের সামাজিক ঘৃণা বা বিদ্বেষমূলক মনোভাব সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে যা পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শ ইসলামি বন্ধনে ফাটল সৃষ্টি করে। রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। সার্বিকভাবে বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সামাজিক জীবনব্যবস্থা সন্তষজনক ছিল না।

পাকিস্তানি শাসনামলে সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজমান ছিল। এক হিসাব মতে ১৯৪৭ সালে প্রাইমারি থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তী ২০ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্কুলগামী ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়লেও প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা কমে যায়। অথচ ঠিক একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সময়কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার অগ্রগতি–

প্রতিষ্ঠান	পশ্চিম পাকিস্তান			পূর্ব পাকিস্তান		
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪৭–৪৮	১৯৬৮–৬৯	বৃদ্ধি	১৯৪৭–৪৮	১৯৬৮–৬৯	বৃদ্ধি
	৮,৪১৩	৩৯,৪১৮,	+৩৬৯%	২৯,৬৬৩	২৮,৩০৮	১৪৪৫টি কমেছে-৪.৬%
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২,৫৯৮	৪,১৮৮	+১৭৬%	৩,৪৮১	৩,৯৬৪	+১১.৪%
কলেজ	৪০	২৭১	+৬৭৫%	৫০	১৬২	+৩২০%
মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি কলেজ	৪	১৭	+৪২৫%	৩	৯	+৩০০%
বিশ্ববিদ্যালয়	২	৬	-	১	৪	-
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র	৬৫৪	১,৮২০	-	১,৬২০	৮,৮৩১	-

সূত্র : Bangladesh Decuments, P 19

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্যবধান ছিল ব্যাপক। মূলত পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার জনগণের সামাজিক রীতিনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণা অনেকটাই পৃথক। পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র হলেও পূর্ববাংলার ভাষা ছিল বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ছিল উর্দু। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাভাষীয় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাওয়ার দাবি ছিল ন্যায়সঙ্গত ব্যাপার। অথচ পাকিস্তানি শাসকচক্র শুরু থেকে বাঙালিদের ভাষা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে না বাংলা হবে এ নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ দেখা দেয়। পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলে বাঙালিরা এর প্রবল বিরোধিতা করে। বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে রক্ত ঢেলে পাঞ্জাবিদের এ হীন চক্রান্ত রোধ করে। এভাবেই সাংস্কৃতিক বৈষম্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণ ঐকবদ্ধ হয়। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম উপেক্ষা দেখানো হয়। শিক্ষাখাতে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের তুলানায় অনেক বেশি সংখ্যক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বিদেশি বৃত্তি থেকে বাঙালিদের প্রায় বঞ্চিত করা হয়েছিল।

সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য ও বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বাঙালির পক্ষে শাসকদের মনোভাব বুঝতে বেশি সময় লাগেনি। অতীতের অধিকাংশ শাসকদের ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা দেশের অভিভাবক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে। এর মূল কারণ ছিল জাতি হিসাবে বাঙালির কোনো উচ্চবিলাস না থাকা। স্বাধীনতার স্বাদ না পেয়ে বাঙালি নতুন উপনিবেশবাদকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল। ৫২' এর আন্দোলনে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে উত্তেজিত উদ্বেলিত বাঙালি সেদিন যে প্রতিবাদের মিছিল সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিল, তার ফলে যে মহাপ্রলয়ংকরী ঢেউ জেগেছিল শরীরে মননে, আকাশে, বাতাসে তাতে শুধু মুখের ভাষার ন্যায্য মর্যাদাই সমুন্নত হয়নি, ছিনিয়ে এনেছিল মহান বিজয় বা পূর্ণ স্বাধীনতা বাঙালি অর্জন করেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

৩.৩ বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ

সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার তাগিদে গড়ে উঠেছে পরিবার। পরিবার কেবল বর্তমান সমাজের কেন্দ্রস্থল নয়, সর্বসময়ের সর্বস্থলের মানবসমাজের কেন্দ্রস্থল। সমাজজীবনে পরিবারের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা এতো ব্যাপক এবং বহুমুখী যে, সমাজবিজ্ঞানিগণ এ সম্বন্ধে আগ্রহী না হয়ে পারেন নি। এর ব্যাখ্যা, ইতিহাস কার্যকারিতা প্রভৃতি নানারকম বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণায়, পরিবার একটি ক্ষুদ্রতম মৌল সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার সমাজের দৃঢ়তম সংগঠন, এমনকি একে জন্মকোষও বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানী সামনার ও কেলার মনে করেন, "আদিকালে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে বসবাস করতো।" এটি হলো মানুষের প্রাথমিক সামাজিক গোষ্ঠী যার ভিত্তি ছিল রক্তের সম্পর্ক, ধারা নয়। আরো আগে মানুষ যুথবদ্ধ হয়ে বসবাস করতো। অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে মানুষ আদিম অবস্থায়ও সংঘবদ্ধ হতে শিখেছে। তবে নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, আদিম অবস্থায় মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারেই বড় হয়ে উঠেছিল তা কিন্তু ঠিক নয়, বরং বৃহত্তর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মাঝেই জীবন কাটাত এবং ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে যে কোনো একটি মতবাদ গ্রহণ করলে দেখা যায় যে, পরিবার একটি চিরস্থায়ী সামাজিক সংগঠন। এ সংগঠন থেকেই মানবজাতির বিকাশ লাভ হয়েছে এবং মানবজাতির বিকাশ লাভের সাথে সাথে সমাজের অগ্রগতি ও পরিবারের রূপ কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে।

পরিবারের ধারণা

পরিবারের ইংরেজি Family শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Familia এবং রোমান শব্দ Famulus থেকে এসেছে। উভয়ের অর্থ হচ্ছে Servant বা সেবক। Roman Law System অনুযায়ী পরিবার বলতে উৎপাদক ভৃত্য ও অন্যান্য সদস্য নিয়ে গঠিত এমন একটি গোষ্ঠী যারা অভিন্ন বংশ বা বিবাহের দিক থেকে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ।

পরিবার বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি যে, বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক যৌথভাবে বসবাস করার একটি সংগঠন। আবার অনেকে মনে করেন যে, পরিবার যৌনসম্পর্ক দ্বারা গঠিত এমন একটি নির্দিষ্ট জুটি যা পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করে সন্তান প্রসবের এবং প্রতিপালনের। অতএব, স্বামী এবং স্ত্রীর বন্ধন দ্বারা পরিবারের সৃষ্টি।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী এম. এফ. নিমকফ (M.F. Nimkoff) তার Marriage and the Family গ্রন্থ পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, æFamily is a more or less durable association of husband and wife with or without children or of a man or woman alone or with children". অর্থাৎ পরিবার মোটামুটিভাবে স্বামী এবং স্ত্রী দ্বারা সৃষ্ট একটি সংঘ, যেখানে সন্তানসন্ততি থাকতেও পারে আবার না থাকতে পারে।

ম্যাকাইভার ও পেঁজ (MacIver and Page): তাদের Society: An Introductory Analysis' শীর্ষক গ্রন্থ অভিমত ব্যক্ত করেন, æFamily is a group defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children". অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট যৌনসম্পর্কের ভিত্তিতে এবং সন্তানসন্ততি জন্মদান ও তাদের লালনপালনের জন্য যথার্থ ও স্থায়ী গোষ্ঠীকে পরিবার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

এলিয়ট ও মেরি (Eliot and Merrill) পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, æFamily is the biological social unit composed of husband, wife and children. অর্থাৎ পরিবার হলো স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততি দ্বারা গঠিত একটি জৈবিক সামাজিক একক।"

ডেভিড পপেনো (David Popenoe)-এর মতে, "Family is a group of 'kin' who live together and function as a co-operative unit for economic or other purposes." অর্থাৎ পরিবার হলো জ্ঞাতিভিত্তিক গোষ্ঠী যারা একসাথে বসবাস করে এবং অর্থনৈতিক বা অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সহযোগিতামূলক একক হিসেবে কাজ করে।

লুসি মেয়ার (Lucy Maire)-এর মতে "The family is the institution within is the cultural tradition of a society is handed down to the new generation."

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো দ্বারা আমরা পরিবার সম্পর্কে সহজেই বুঝতে পারি। কারণ পরিবারের লোকেরা একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ; তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান। রক্তের সম্বন্ধই পরিবারের মূলভিত্তি এবং ঐক্যসূত্র। এছাড়াও পরিবার হলো এমন একটি সামাজিক সংগঠন যার দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীলোক যুক্তিযুক্তভাবে একতাবদ্ধ হয়ে সন্তান প্রসবের সুযোগ প্রদান করে এবং এই সম্পর্কের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

পরিবারের মাঝে আমরা কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। যেমন ম্যাকইভার ও পেজ তাদের গ্রন্থে Society-তে পরিবারে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের মতে, এ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সদা বিদ্যমান বলে উল্লেখ করেন। এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

- যুগল সম্পর্ক
- বিবাহের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে স্থায়ী যৌনসম্পর্ক সৃষ্টি
- বংশাণুক্রমে পরিবারের বিকাশ লাভ
- সাধারণ বাসস্থান বা একই গৃহে অবস্থান ও
- একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে গোষ্ঠী পরিচালনা

তাদের মতে, এ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া পরিবারের কথা চিন্তা করা যায় না। তবে এ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্য যোগ হতে পারে। যেমন–

১. পরিবারের সদস্যদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে
২. প্রত্যেক পরিবারের একটি নিজস্ব নাম বা পরিচিতি আছে
৩. সামাজিক অনুশাসন মেনে চলতে হয়
৪. পরিবার সামাজিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় অংশ
৫. এটি বিশ্বজনীন
৬. সহযোগিতার নীতি বিদ্যমান

সুতরাং এখন দেখা যাচ্ছে যে, বিবাহ পরিবার গড়ে ওঠার প্রধান সহায়ক। সমাজবিজ্ঞানিগণ পুরুষ ও নারীর নানরূপ জুটি ও জ্ঞাতি সম্পর্কের উপর নির্ভর করে পরিবারকে বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন নামকরণ করেছেন।

পরিবারের প্রকারভেদ

সমাজবিজ্ঞানিগণ বিবাহ পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিবারকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন । যথা-

ক. **একপতি-পত্নীক পরিবার (Monogamy) :** একপতি-পত্নীক পরিবার বলতে সেই পরিবারকে বুঝায় যেখানে একজন পুরুষ কেবল একজন স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুজনে যৌথভাবে বসবাস করে।

খ. **বহুপত্নীক পরিবার (Polygamy) :** বহুপত্নীক পরিবার বলতে সেই পরিবারকে বুঝায় যেখানে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে।

গ. **বহুপতি পরিবার (Polyandry) :** বহুপতি পরিবার হলো যেখানে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকে।

ঘ. **গোষ্ঠী পরিবার Family Based on Group Marriage) :** গোষ্ঠী পরিবার হলো দুই বা ততোধিক পুরুষ একত্রে দুই বা ততোধিক স্ত্রীলোককে নিয়ে যৌন কামনা মিটিয়ে থাকে। এটা সাধারণত দলের বা গোষ্ঠীর সমন্বয়ে হয়ে থাকে।

এছাড়া আমরা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে পরিবারের বিভিন্নভাবে প্রকারভেদ করতে পারি। যথা-

প্রভুত্বের মাপকাঠি অনুযায়ী (Measure of Lordship)

প্রভুত্বের মাপকাঠি অনুযায়ী পরিবারকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. **মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (Matriarchal Family) :** মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে স্ত্রীলোকের অধিকার পুরুষের চেয়ে বেশি থাকে এবং স্ত্রীলোকের মাধ্যমে বংশ পরিচয় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। মিশর, তিব্বত ও দক্ষিণ ভারতে এ ধরনের পরিবার বিদ্যমান আছে। এখনো দক্ষিণ ভারত, কোচিন, মালাবার প্রভৃতি স্থানের মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বিদ্যমান রয়েছে।

খ. **পিতৃতান্ত্রিক পরিবার (Patriarchal Family) :** পিতৃতান্ত্রিক পরিবার হলো সেই শ্রেণির পরিবার, যেখানে পুরুষের মাধ্যমে বংশ পরিচয় নির্ধারণ করা হয় এবং পুরুষ মানুষকে পরিবারের কর্তা বলে স্বীকার করা হয়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সকল ক্ষমতা পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। ফলে পরিবারে ভরণপোষণ এবং নিরাপত্তার জন্য পুরুষই দায়ী থাকে।

স্বামী স্ত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী (Number of Spouses)

কোনো কোনো পরিবারে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রভুত্বের উপর ভিত্তি করে সেই পরিবারের স্ত্রী বা স্বামী একাধিক স্ত্রী বা স্বামী নিয়ে পরিবার গঠন করতো। এই স্বামী ও স্ত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী পরিবার তিন প্রকার। যেমন-

ক) **একপতি-পত্নীক পরিবার (Monogamy) :** যখন একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক যৌথভাবে পরিবার গঠন করে তখন তাকে একপতি পত্নীক পরিবার বলা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এটি আর্থিক কারণে হোক বা সুখশান্তির কারণেই হোক বর্তমানে এর প্রচলন সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য করা যায়।

খ) **বহুপত্নীক পরিবার(Polygamy) :** যখন একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীলোক নিয়ে পরিবার গঠন করে তখন একে বহুপত্নীক পরিবার বলা হয়।

গ) **বহুপতি পরিবার (Polyandry) :** এ ধরনের পরিবারে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকে। তিব্বতে ও ভারতের কোনো কোনো স্থানে এ প্রকার পরিবার এখনো বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এর অস্তিত্ব অনেকটা লোপ পাচ্ছে।

বাসস্থানের অধিকার অনুযায়ী (Right of dwelling house)

স্বামী ও স্ত্রীর বাসস্থানের অধিকার অনুযায়ী পরিবারের প্রকারভেদ চিহ্নিত করা যায়। যেমন–

ক) **মাতৃবাসস্থান পরিবার (Matriarch Family) :** এরূপ পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পাত্র স্বীয় পৈতৃক বাসস্থান বা পৈতৃক পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাত্রীর পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে।

খ) **পিতৃবাসস্থান পরিবার (Patriarch Family) :** এরূপ পরিবারের নিয়ম হলো পাত্রী বিবাহ বন্ধনের পর পিতার বাসস্থান বা পৈতৃক সম্পত্তির মালিকানা বা অংশীদার নাও থাকতে পারে। সাধারণত দেখা যায়, পাত্রী বিবাহ বন্ধনের পর পাত্রের পরিবারভুক্ত হয়ে যায় এবং সেখানেই তার অধিকার গণ্য করা হয়।

এছাড়া সমাজবিজ্ঞানিগণ বংশানুক্রমে পরিবারে প্রকারভেদ নির্দেশ করেছেন। যেমন– পিতৃস্বীকার্য ও মাতৃস্বীকার্য পরিবার।

ক) **পিতৃস্বীকার্য পরিবার বা পিতৃসূত্রীয় পরিবার (Patrilineal Family) :** যে পরিবারের সন্তানগণ তাদের পরিবারের পরিচয় পিতার বংশ অনুযায়ী নির্ধারণ করে তাকে পিতৃস্বীকার্য পরিবার বলা হয়। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, পরিবারে অধিকারের সূত্র অনুযায়ী পরিবারে সন্তানগণ সে অধিকার ভোগ করে থাকে। যেমন– মাতা যদি একজাতির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পিতা যদি অন্যজাতির অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে এ প্রকার পরিবারের পিতার জাতির উপাধি ও বংশমর্যাদা অনুযায়ী সন্তানদের বংশমর্যাদা নিরূপণ করা হয়।

খ) **মাতৃস্বীকার্য পরিবার বা মাতৃসূত্রীয় পরিবার (Matrilineal Family) :** পরিবারে সদস্যগণ যদি মায়ের বংশমর্যাদা অনুযায়ী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাকে মাতৃস্বীকার্য পরিবার বা মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলা হয়। অবশ্য এ প্রকার পরিবার সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমাজব্যবস্থার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ধরনের পরিবার দেখা যায়। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে ক্রমশ অণু পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের সমাজব্যবস্থায় এখনো ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে হলেও যৌথ পরিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

পরিবারের কার্যাবলি

পরিবার সমাজজীবনে এমন একটি স্থান অধিকার করে আছে যেখানে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যু অবধি সেখানেই জীবন অতিবাহিত করে। এজন্য পরিবার বিভিন্ন প্রকারের ও বহুবিধ কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে সমাজজীবনে বিদ্যমান। সমাজবিজ্ঞানীদের মতো অনুযায়ী পরিবারের কার্যাবলিকে আটভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

১. জৈবিক বা জন্মদানমূলক কার্যাবলি (Biological Functions)
২. শিক্ষামূলক কার্যাবলি (Educational Functions)
৩. অর্থনৈতিক কার্যাবলি (Economical Functions)
৪. রাজনৈতিক কার্যাবলি (Political Functions)
৫. মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি (Psychological Functions)
৬. আমোদ-প্রমোদ কার্যাবলি (Recreational Functions)
৭. সামাজিকীকরণ কার্যাবলি (Socialization Functions)
৮. ধর্মীয় কার্যাবলি (Religions Functions

১। **জৈবিক বা জন্মদানমূলক কার্যাবলি (Biological Functions) :** পরিবার যৌন সম্পর্ক দ্বারা গঠিত। নারী ও পুরুষের যৌনমিলনের উদ্দেশ্যে তাদের পারিবারিক জীবন গড়ে তুলতে হয়। নারী ও পুরুষ পরিবার গঠন করলে তাতে তাদের যৌনতৃপ্তির যেমন সুবিধা হয় তেমনি তারা বৈধভাবে সন্তান ও জন্ম দিতে পারে। এ হিসেবে পরিবারকে সন্তান উৎপাদন ও লালনপালনকারী প্রতিষ্ঠানও বলা চলে। সুতরাং সমাজকে সুন্দরভাবে এবং পরিকল্পিত উপায়ে টিকিয়ে রাখতে হলে একমাত্র পরিবারের মাধ্যমেই যৌন তৃপ্তির দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এটা সমাজের ব্যভিচার ও অন্যান্য অপরাধ দূরীকরণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

২। **শিক্ষামূলক কার্যাবলি (Educational Functions) :** পরিবার সমাজবদ্ধ মানুষের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। পরিবারেই সন্তান-সন্ততিরা জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং পরিবার থেকেই সন্তান-সন্ততিরা বেড়ে ওঠে এবং তাদের জীবনের রূপ পারিবারিক রূপের বহিঃপ্রকাশ বলা চলে। পরিবারে সন্তানগণ যে শিক্ষালাভ করে তা তাদের অন্তরে চিরস্থায়ী দাগ কাটে এবং তাদের উপর প্রবল ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। পারিবারিক জীবনে তারা পরস্পর পরস্পরের আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নম্রতা, ভদ্রতা, দয়ামায়া, প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা প্রভৃতি গুণগুলো শিক্ষালাভ করে থকে ।

৩। **অর্থনৈতিক কার্যাবলি (Economical Functions) :** জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও তৈরি করা পরিবারে আর একটি প্রধান কাজ। পূর্বে পরিবারই ছিল উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল। অনুন্নত কৃষিনির্ভর সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবার সম্পত্তির মালিক হয় ও তা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাচীনকালে মানুষের কার্যাবলির বেশিরভাগই পরিবারে মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে উন্নয়নশীল এবং উন্নয়নকামী দেশগুলোতে এ অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এখনো অনেক অনুন্নত দেশ রয়েছে যেগুলো কৃষিনির্ভর, যে সব দেশগুলোতে আজও পরিবারে দ্বারা অর্থনৈতিক কার্যাবলি প্রত্যক্ষভাবে হয়ে থাকে। আমরা আমাদের দেশ ও ভারতের কথাও বলতে পারি। যদিও আমাদের দেশে শিল্পের অগ্রগতি ও শিক্ষার প্রসারতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তবুও পরিবারের সম্পত্তির উপর নির্ভর করেই আর্থিক সচ্ছলতার কথা চিন্তা করতে হয়।

৪। **রাজনৈতিক কার্যাবলি (Political Functions) :** পরিবারের সদস্যদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে তেমনি আবার পরিবারের কর্তার কর্তৃত্ব ও রয়েছে। অনেক পরিবারের কর্তাকে রাষ্ট্র প্রধানের সমতুল্য বলা চলে। পরিবারের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তন, পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা, সহনশীলতা, আলোচনা পরামর্শ প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যগণ প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবার থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে।

৫। **মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি (Psychological Functions) :** একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক পরিবারেরই একটি মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকা রয়েছে। পরিবারই হলো একমাত্র মানসিক যাতনা নিবারণের কেন্দ্রস্থল। পরিবার এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

৬। **আমোদ-প্রমোদ কার্যাবলি (Recreational Functions) :** পরিবারে সদস্যগণ অবসর সময়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের কর্মজীবনের বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে এবং জীবনের একঘেয়েমি ভাব দূর করতে পারে। যেমন ছেলেমেয়েরা পরিবারে খেলাধূলা করে। বয়স্করা পরিবারে গল্প গুজব করে এবং সকলেই পরিবারে অবসর সময় কাটিয়ে থাকে।

৭। **সামাজিকীকরণ কার্যাবলি (Socialization Functions) :** পরিবার সামাজিকতা শিক্ষা দেবার প্রধান কেন্দ্রস্থল। সমাজের সদস্য হয়ে চলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রথম পরিবার থেকে আমরা লাভ করে থাকি। সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি, আদব-কায়দা, মূলবোধ, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে আমরা পারিবারিক জীবনেই লাভ করে থাকি। এ শিক্ষা আমাদের ব্যক্তিজীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৮। **ধর্মীয় কার্যাবলি (Religions Functions) :** পরিবার যেমন প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থল তেমনি পরিবার থেকে পরিবারের সদস্যগণ ধর্মীয় শিক্ষালাভ করে থাকে। যেমন একটি মুসলমান পরিবারের সদস্যগণকে তাদের পরিবারের নিয়ম ও প্রথানুযায়ী চলতে হয় এবং সমাজে যে পরিবারের পরিচয়ে পরিচিত এবং তাকে সে পরিবারের অন্য সদস্যদের ন্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। অন্যান্য ধর্মের মানুষেরাও পরিবারিক জীবনে নিজ নিজ ধর্মের নিয়ম কানুন মেনে চলেন।

উল্লিখিত কার্যগুলো সময় ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হলেও পরিবারের গুরুত্ব কোনোদিন হ্রাস পাবে না। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সমাজের সকল সমস্যা পরিবার থেকেই উদ্ভব হয় এবং এর সমাধান একমাত্র পরিবারের কার্যাবলির মাধ্যমেই সম্ভবপর হতে পারে।

সামাজিকীকরণ

সামাজিকীকরণ হলো সমাজের সদস্যদের মিথষ্ক্রিয়ার সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা লাভ করে এবং সমাজের নির্ধারিত নিয়ম ও রীতি অনুসারে চিন্তা ও কাজ করতে শেখে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিকে নিজ সমাজের মূল্যমান ধর্ম অনুযায়ী আচরণ করতে শেখানো হয়। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশু সমাজের সক্রিয় সদস্যে পরিণত হয়। শিশু যখন সামাজিক নর্ম অনুযায়ী আচরণ করতে শেখে তখনই সে সমাজ কর্তৃক প্রশংসিত হয়। শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণে সামাজিকীকরণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিকীকরণ ধারণা

সামাজিকীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষের সামাজিক প্রকৃতির বিকাশ ঘটে এবং যার দ্বারা মানুষ সামাজিক হয়ে উঠে। অর্থাৎ এটি শিক্ষা, পরিবার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে। সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Arnold Green বলেন, "Socialization is the process by which the child acquires a cultural contents along with selhood and personality". অর্থাৎ সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো শিশু তার নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয় এবং তার অহংবোধ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

R.T. Schaefer তাঁর Sociology গ্রন্থ উল্লেখ করেন, "Socialization is the process whereby people learn the attitude, values and actions appropriate to individuals as members of a particular culture." অর্থাৎ সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন প্রক্রিয়া যেখানে কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির সদস্য হিসেবে তার নিজস্ব মনোভাব মূল্যবোধ ও কার্যাবলি শিখে থাকে।

Ogburn এবং Nimkoff তাদের "A Hand book of Social Psychology" গ্রন্থ উল্লেখ করেন, "Socialization is the process by which the individual learns to confirm to the norm of the group." অর্থাৎ সামাজিকীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি তার নিজ গোষ্ঠীর আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

Bogardus তার "Fundamental of Social Psychology" গ্রন্থ বলেন, "Socialization is the process of working together of developing group responsibility or being guided by the welfare needs of other." অর্থাৎ সামাজিকীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি জনকল্যাণের জন্য একত্রে নির্ভরযোগ্য আচরণ করতে শিখে।

Kingsley Davis বলেন, "যে পদ্ধতিতে মানব শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে।"

অতএব, বলা যায় যে– জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান বা খাপ খাওয়ানোর চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। যে সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি তা সম্পন্ন করে তাকে সামাজিকীকরণ বলা হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া জন্মের পর থেকে আরম্ভ হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে সামাজিকীকরণের গতি সব বয়সে একরকম নয়। শিশুকাল, ছেলেবেলা এবং বয়ঃসন্ধিকালে এটা দ্রুত হয়। সামাজিকীকরণের প্রকৃতি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রকম। ব্যক্তি কত দ্রুত সামাজিক রীতিনীতি নিয়ম কানুন আত্মস্থ করবে তা নির্ভর করে তার দৈহিক, আবেগিক, মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের ওপর। এছাড়া সমাজভেদেও শিশুর সামাজিকীকরণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া (The Process of Socialization)

সামাজিকীকরণ মূলত এক ধরনের শিখন প্রক্রিয়া। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ Human Animal বা মানব জীব থেকে Socialy Being বা সামাজিক জীবে পরিণত হয়। সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

অনুকরণ (Imitation) : অনুকরণ সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। অনুকরণের মাধ্যমে মানুষ অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করে থাকে। বিশেষ করে শিশুরা খুবই অনুকরণপ্রিয়। তারা আশপাশের যা কিছু দেখে তাই অনুকরণ করে শিখে। পরিবার থেকেই শিশুদের এ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়, পরবর্তীতে বন্ধুবান্ধব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম ইত্যাদি নিকট থেকে অনুকরণ করে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করে থাকে। কিশোর, যুবক এবং বৃদ্ধদের ব্যবহার সাধারণত সমাজ এবং সংস্কৃতির অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত। সেসব ব্যবহার অনুকরণের অর্থই হলো সমাজ ও সংস্কৃতির অনুশাসনকে মেনে চলতে শেখা। যেমন–রিমা নামের মেয়েটি তার মায়ের মতো কাপড় পরা, হাঁটাচলা করা, কথাবার্তা বলার চেষ্টা অনুকরণেরই একটি রূপ।

Miller এবং Dollard এ সম্পর্কে বলেন "Imitation is important in maintaining discipline and conformity to the norms of our society." অর্থাৎ আমাদের সমাজের নিয়মনীতি ও আদর্শকে রক্ষা বা পরিচর্যার জন্য অনুকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অনুকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। সমাজের কোনো মহৎ ব্যক্তি বা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো ব্যক্তি আচার ব্যবহার সহজেই সমাজের অন্য সদস্যদের মধ্যে সঞ্চায়িত হয়। এর ফলশ্রুতিতে সমাজের সদস্যদের মধ্যে একধরনের আচরণগত মিল পরিলক্ষিত হয়।

শিখন (Learning) : শিখন হলো সামাজিকীকরণের একটি মৌল প্রক্রিয়া। এটি হলো অতীত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে মানব আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন। শিখনের মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হতে থাকে। জন্মের পর থেকেই শিশু তার পিতামাতা বা অন্য কারো কাছ থেকে সংস্কৃতির উপাদানগুলো শিখে থাকে এবং তা বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। সমাজ মনোবিজ্ঞানীদের মতে চারটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদান সাহায্যে ব্যক্তির শিখন সম্পন্ন হয়। এগুলো হলো-

ক) তাড়না (Drive) খ) সংকেত (Cue)
গ) প্রতিক্রিয়া (Response) ঘ) পুরস্কার (Reward)

তাড়না কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে বা কোনো কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। যেমন– শিশুর ক্ষুধা হলে তা নিবৃত্তির জন্য কান্নার মাধ্যমে তার চাহিদা প্রকাশ পায়। এখানে ক্ষুধা নিবৃত্তি হলো তাড়না এবং তা পরিতৃপ্তির জন্য কান্না হলো সংকেত। শিশুটির মা যদি তার কান্নার সংকেতের সাড়া দিয়ে শিশুটিকে দুধ খাওয়ায় তবে শিশুটির ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে। অর্থাৎ সে পুরস্কৃত হয়। ফলে শিশুটি ঐ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রতিক্রিয়াটি শিখে ফেলবে।

সাংস্কৃতিক দীক্ষা (Cultural Teaching) : মানুষই একমাত্র প্রাণী যার সংস্কৃতি আছে। শিশু সংস্কৃতিবান হয়েই জন্মগ্রহণ করে না। বরং সামাজিক পরিবেশ থেকে শিখে থাকে। মানব শিশু জন্মের পর থেকে পরিবার, গোষ্ঠী এবং সমাজ থেকে সাংস্কৃতিক দীক্ষা লাভ করে থাকে। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আদর্শ, মনোভাব, বিশ্বাস এবং চেতনা ইত্যাদি তার আচরণকে প্রভাবিত করে। এভাবে জীবন চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যক্তি, ভাষা, আচার আচারণ ও সংস্কৃতির অন্যান্য দিক সম্পর্কে অবগত হয়ে তার ব্যবহারে সার্বিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে ক্রমে সে জৈবিক সত্ত্বা থেকে সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে থাকে।

সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

শিশুর সামাজিকীকরণ বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন–

পরিবার : শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের শুরুতে এবং প্রথম বার বছর শিশু প্রধানত পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেই সামাজিক আচরণ শিক্ষা লাভ করে। পরিবারের কাছে শেখা এই আচরণ শিশুর পরবর্তী জীবনের আচরণকে প্রভাবিত করে।

বাবা-মার পারস্পরিক সম্পর্ক : বাবা মার পারস্পরিক সম্পর্কের ভালো এবং মন্দ দিকগুলো শিশুর সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে। বাবা-মার ভালো সম্পর্ক শিশু যত্নের জন্য অনুকূল হয়। ফলে সামাজিকীকরণ সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকে। আবার সম্পর্কে দুর্বল দিকগুলো শিশুর সামাজিকীকরণকে বাধাগ্রস্ত করে।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সম্পর্ক : শিশুর সামাজিকীকরণে বাবা মার পরেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। কারণ শিশু এদের কাছ থেকে সহযোগিতা, স্বার্থহীনতা, ভালোবাসা ইত্যাদি গুণাবলি শিখে থাকে। এগুলো শিশুর সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে।

ভাই বোনের প্রভাব : এটা সামাজিকীকরণকে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করে। শিশু কিভাবে বড় ও ছোটদের সাথে আচরণ করবে এবং অন্যান্য সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি ভাই বোনের কাছ থেকেই শিখে থাকে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা : এটি সামাজিকীকরণের শক্তিশালী উপাদান। অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের সন্তানেরা সামাজিকীকরণ স্বাভাবিকভাবেই দরিদ্র পরিবারের সন্তানের সামাজিকীকরণের চেয়ে ভালো হয়।

প্রতিবেশী : শিশুর সামাজিকীকরণে প্রতিবেশীর ভূমিকা ও গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশু বেশিরভাগ সময় প্রতিবেশির সাথেই থাকে। ফলে প্রতিবেশীর প্রভাব শিশুর জীবনকে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করে।

সমবয়সী দল : শিশুর জীবনে এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। প্রধানত ঋণাত্মক আচরণগুলো শিশু এদের কাছ থেকেই শেখে। অবশ্য অনেক ভালো কিছুও শিশু সমবয়সী দলের কাছে শিখে থাকে।

সামাজিক উদ্বিগ্নতা : শিশু ভালো আচরণের জন্য সমাজ দ্বারা প্রশংসিত হয়। অন্যদিকে খারাপ আচরণের জন্য তাকে বকা খেতে হয়। আর এই যে সমাজ কর্তৃক প্রশংসিত বা বকা খাওয়ার উদ্বিগ্নতা সেটা শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে তার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয়।

বিদ্যালয় : এটি শিশুর সামাজিকীকরণের অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। তবে বিদ্যালয়ের ভূমিকা প্রধানত শিক্ষামূলক। বিদ্যালয়ে শিশুর সামাজিকীকরণ নির্ভর করে বিদ্যালয়ের প্রকৃতি এবং শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের আচরণের উপর। তাই সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের স্বার্থে শিশুকে ভাল বিদ্যালয়ে পাঠানো উচিত।

সংস্কৃতি : শিশুর সামাজিকীকরণ তার সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের সংস্কৃতি অনুযায়ী সন্তানদের সামাজিকীকরণের প্রকৃতি বিভিন্নরকম হয়ে থাকে।

জাতি বা শ্রেণি : শিশুর জাতিগত বা গোষ্ঠীগত অবস্থাও তার সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে। সংখ্যাগুরু দলের শিশু নিজেকে সংখ্যালঘু দলের শিশুতে তুলনায় উত্তম ভাবে।

ধর্মীয় আদর্শ : প্রত্যেক ধর্মেরই মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা। ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলেই ভেদাভেদ ভুলে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে। এভাবে পরস্পর পরস্পরের সন্নিধ্যে আসে এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সামাজিকীয়করণ ঘটে।

রাষ্ট্র : সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনন্য। রাষ্ট্র সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। রাষ্ট্র হলো একটি কর্তৃত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সমাজের সদস্যদের সমাজ আকাঙ্ক্ষিত ধারা অনুযায়ী পরিচিত করে। ফলে রাষ্ট্রের মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ঘটে। সামাজিকীকরণের উপযুক্ত মাধ্যমগুলো বা বাহনগুলো ছাড়াও সাহিত্য, গণমাধ্যম, পেশাগত সংস্থা, বাজার, ভ্রমণ, বিভিন্ন ক্লাব, খেলার মাঠ প্রভৃতি সামাজিকীকরণের মাধ্যমে হিসেবে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

সুতরাং ব্যক্তির প্রচলিত আচরণধারা গ্রহণ করার নামই হলো সামাজিকীকরণ। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব শিশু সমাজের একজন কাঙ্ক্ষিত পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় সামাজিকীকরণ। আর ব্যক্তির সামাজিকীকরণে উপরে বর্ণিত মাধ্যমগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিবার সামাজিকীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পরিবারের মধ্যেই সামাজিকীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের পরিবার রয়েছে। আর যে ধরনের পরিবারেই আমরা বেড়ে উঠি না কেন, পারিবারিক জীবনের মধ্যেই আমাদের শৈশব কাটে। স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক জীবনের ভালো দিক এবং মন্দ দিক সবই আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে। পরিবারের মধ্যেই সামাজিক নীতিবোধ ও নাগরিক চেতনার সূচনা হয়। আমরা সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, ত্যাগ, ভালোবাসা প্রভৃতি গুণগুলো পরিবারের মধ্য থেকেই অর্জন করি। পরিবারের মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা হলো মা-বাবার মধ্যকার সম্পর্ক। মা বাবার মধ্যে সু-সম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আবার মা-বাবার মধ্যকার দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্ট করে। শিশুর সবচেয়ে কাছের মানুষ হচ্ছেন মা ও বাবা। আবার মা ও বাবা এ দুজনার মধ্যে অধিকতর কাছের হলেন মা। স্বভাবতই সামাজিকীকরণের সূত্রপাত ঘটে মার মাধ্যমেই। মা শিশুর খাদ্যাভ্যাস গঠন ও ভাষা শিক্ষার প্রথম মাধ্যম। মা শৈশবে শিশুকে যেসব খাদ্যের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করবেন, শিশুর পরবর্তী জীবনের আচরণে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মায়ের ঘুমপাড়ানি গঠন, বর্ণ শেখার কৌশল, ছড়া শেখার অনেক বিষয়ই আমরা অতীত অভিজ্ঞতা ও শিখনের ফল থেকে নিজ পরিবারে প্রয়োগ করে থাকি।

৩.৪ বাংলাদেশের ভূমিরূপ ও জলবায়ু

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় একটি দেশ। দেশটির উত্তর অক্ষাংশ ২০° ৩৪" থেকে ২০° ৩৮" এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ৮৮°০১" হতে ৯২°৪১" এর মধ্যে অবস্থিত যার মাঝ বরাবর চলে গেছে ২৩°৩০" অক্ষাংশের কর্কটক্রান্তি রেখা। দেশের উত্তর প্রান্ত ভারতের মেঘালয় ও পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তর পূর্বাংশে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও মিজোরাম এবং দক্ষিণ পূর্বাংশে মায়ানমার। এ সীমানার মধ্যে প্রায় ১,৪৭,৫৭০ কি.মি এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ। উত্তরাংশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেটের সীমান্ত এলাকার টিলা, বৃহত্তর সিলেট, পার্বত্য চট্রগ্রাম ও বৃহত্তম চট্টগ্রামের উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত পাহাড়ি এলাকা ব্যাতিরেকে দেশের বাকি প্রায় ৮৫% এলাকা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় পদ্মা-মেঘনা, যমুনা নদী বিস্তৌর্ণ বিস্তীর্ণ পলল সমভূমি। এ সমতলের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে কিছুটা উঁচু চত্বর ভূমি ও নিচু জলাভূমি এবং দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে সুন্দরবনের গরান জলাভূমি।

ভূমিরূপ

ভূমিরূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে W.M.Davis যৌবন, পরিণত, বার্ধক্য ভূমিরূপ, পর্যায়িত ঢাকা, সুগঠিত প্লাবন ভূমি প্রভৃতি পদবাচ্য ব্যবহার করেছেন। অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিরূপ বর্ণনায় ভূমির ঢাল, ব্যবচ্ছেদ, উচ্চ বর্ণতা, প্রভৃতির পার্থ্যকের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে গুণগত বর্ণনা যথেষ্ট নয়। হটন, স্টলার, প্রভৃতি বিজ্ঞানী আঞ্চলিক ভূমিরূপ বর্ণনায় সংখ্যা তাত্ত্বিক রাশির প্রয়োগে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে বিজ্ঞান সম্মত বিচার বিশ্লেষণ করে ভূমির ঢাল, ব্যবচ্ছেদ, বন্ধুরতা প্রভৃতি ভূমিরূপ বৈশিষ্ট্যের উপস্থাপন অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও কার্যকর হয়।

ভূমিরূপ হচ্ছে ভূপৃষ্ট গঠনকারি সামগ্রিক অবয়বের একমাত্র এবং বৈশিষ্ট্যসূচক একক। একটি নিঃসঙ্গ পর্বত, একটি পাহাড়, একটি উপত্যকা, একটি বালিয়াড়ি, একটি নিমগ্নজলা ইত্যাদি সবই এক একটি ভূমিরূপ। ভূমিরূপ শব্দটি দ্বারা কোনো এক পদ্ধতিতে সৃষ্ট পৃথক পৃথক উৎপাদনকে বুঝায়। আর ভূদৃশ্য শব্দটি দ্বারা ঐ সব প্রক্রিয়াসমূহের স্থানিক বা আঞ্চলিক বহিঃপ্রকাশকে বুঝায়। ভূমিরূপের উৎস ও উন্নয়নের ব্যাখ্যা করা হয় প্রাপ্তিসাধ্য তথ্যের ভিত্তিতে এবং এই তথ্য সংগৃহীত হয় এদের বর্ণনা ও শ্রেণিবিভাগ থেকে। ভূমিরূপের ব্যাখ্যায় উপনীত হওয়া যায় নানা পদ্ধতির মাধ্যমে। যেমন– (ক) জলবায়ু ও ভূমিরূপের মধ্যে সম্পর্কে স্থাপনের মাধ্যমে খ) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভূমিরূপ উৎস ও উন্নয়ন, এবং গ) প্রক্রিয়া ও গঠনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে।

প্রখ্যাত ভূগোলবাদী ওয়ালথার পেঙ্ক ভূপৃষ্ঠে ভূমিরূপ গঠইকারী শক্তিগুলোকে প্রধান দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন–

১। অভ্যন্তরীণ বা অন্তঃজ শক্তি (endogenetic forces)	ভূগাঠনিক পাতের গতি, ভূমিকম্প, আগ্নেয়ক্রিয়া ইত্যাদি
২। বহিঃজ শক্তি (exogenetic forces)	সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, বরফ, হিমবাহ ইত্যাদি।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ দ্বারা যে ভূমিরূপ গঠিত হয়, সেগুলোকে প্রাথমিক পর্যায়ের ভূমিরূপ বলা হয়। বহিঃজ শক্তির মধ্যে রয়েছে আদিম ভূমিরূপ সৃষ্টির পর থেকে ভূপৃষ্ঠের বাইরের শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা জটিল ব্যাপার, কারণ উভয়ে একই সাথে সংঘটিত হয় এবং এভাবেই ভূখণ্ডে নানা বৈশিষ্ট্যের ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। যদি পাতগুলো গুরুমণ্ডলে উপর দিয়ে মহাদেশগুলোকে বহন করে নিয়ে যেতে থাকে, তাহলে ভূভাগ সংকুচিত, কুঞ্চিত, অবনমিত হতে থাকবে।

বিভিন্ন ভূমিরূপগুলোর কোনো কোনোটির সাথে সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য থাকলেও আকার আকৃতিতে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। সবগুলো ভূমিরূপ একত্রে বা একসঙ্গে হয়নি। সাধারণত বৃহত্তর ভূমিরূপ হতে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রতম ভূমিরূপগুলো উৎপত্তি হয়েছে। ভূমিরূপের পর্যায়ক্রমিক উৎপত্তি বা সৃষ্টি এবং আকৃতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভূগোলবিদ উল্লিখিত ভূমিরূপগুলোকে মোটামুটিভাবে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যেমন–

১। **প্রথম পর্যায়ের ভূমিরূপ :** ভূত্বক গঠনের প্রথম পর্যায়ে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলো সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবী প্রথম অবস্থায় একটি জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল। এ উত্তপ্ত বায়ুবীয় পৃথিবী ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে উপরিভাগ শীতল হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে কোনো কোনো স্থান উপরে উত্থিত হয় এবং আবার কোনো কোনো স্থান নিচে অবনমিত হয়। উপরে উত্থিত অংশগুলোর সমন্বয়ে মাহাদেশীয় ভূভাগ গঠিত হয় এবং অবনমিত অংশগুলো মহাসাগরী তলদেশ গঠিত হয়। ভূত্বক সৃষ্টি শুরুতে ভূমিরূপের এ দুটি অংশই সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য এদের প্রথম পর্যায়ের ভূমিরূপ বলা হয়ে থাকে।

২। **দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ :** মহাদেশীয় ভূভাগের ও মহাসাগরীয় তলদেশে প্রথম পর্যায়ের পরপরই যে প্রধান প্রধান ভূমিরূপ গঠিত হয়েছে সেগুলোকে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ বলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাদেশীয় ভূভাগের ভূমিরূপগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা : ক) পর্বত, খ) মালভূমি, গ) সমভূমি। একইভাবে মহাসাগারগুলোর তলদেশকেও নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন- ক) মহীসোপান, খ) মহীঢাল, গ) গভীর সমুদ্রের সমভূমি এবং ঘ) গভীর সমুদ্রখাত। মহাদেশ এবং মহাসাগরগুলোর ভূমিরূপের এ পর্যায়ে প্রকৃত স্বরূপ ফুটে ওঠে।

৩। **তৃতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ :** তৃতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ বলতে ভূপৃষ্ঠের উপর বিশেষ করে স্থলভাগের উপর প্রতিনিয়ত কোনো না কোনোভাবে ক্ষয় ও গঠন কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপকে বোঝায়। এ পর্যায়ের ভূমিরূপই প্রকৃতপক্ষে ভূপৃষ্টকে অপূর্ব বৈচিত্র্যে সুষমা মন্ডিত করেছে। তৃতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ গঠনে প্রায় সব ধরনের পদ্ধতিই কাজ করে থাকে। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এবং ধীর ও আকস্মিক পদ্ধতির সবগুলো মাধ্যমই ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। বিভিন্ন প্রকার ভূআন্দোলন ও অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নানা ধরনের ভূমিরূপ গঠিত হয়। এছাড়া নদী, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রতরঙ্গ, ভূগর্ভস্থ্য জলধারা এবং জৈবিক প্রণালী দ্বারা অবিরত ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়ক্রিয়া চলছে। এরূপ ক্রিয়ার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার শিলা, বালুকা, কর্দম, পলি প্রভৃতি উল্লিখিত মাধ্যমগুলোর দ্বারা অন্যত্র পরিবাহিত ও সঞ্চিত হচ্ছে। এভাবে ভূপৃষ্ঠ একদিকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উপত্যকা, সার্ক গিরিখাত, ইয়ারডাঙ্গ, সমুদ্রখারি, ল্যাপিজ প্রভৃতির সৃষ্টি করছে। অপরদিকে সঞ্চিত হয়ে প্রবালদ্বীপ, প্রবাল প্রাচীর বেলাভূমি, ব-দ্বীপ, বালিয়াড়ি, চর, অ্যাটল, গ্যাবরেখা, ড্রামলিন প্রভৃতি অসংখ্য ছোট ছোট ভূমিরূপের সৃষ্টি করছে।

ভূতাত্ত্বিক কাঠামো

বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলকে ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. প্রাক-ক্যামব্রিয়ান ভারতীয় দৃঢ় ভূখণ্ডের অংশ (Pre Cambrian Indian Platform)
২. বেসিন (Basin) বা অনমিত (Geosynclines) অঞ্চল।

১. প্রাক ক্যামব্রিয়ান ভারতীয় দৃঢ় ভূখণ্ডের অংশ (Pre Cambrian Indian Platform): বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত প্রাক ক্যামব্রিয়ান ভারতীয় প্লাটফর্ম অঞ্চলটি রংপুর দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলটি ভূ-গাঠনিকভাবে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল বলে এর উপর সৃষ্ট পাললিক শিলাস্তরের গুরুত্ব বেসিন অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। এই অঞ্চলটিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. দিনাজপুর ঢাল (Dinajpur Slope)
২. রংপুর চত্তর (Rangpur Saddle)
৩. বগুড়া চত্তর (Bogra Shelf)

দিনাজপুর ঢাল ও রংপুর চত্তর : এই অঞ্চলটি পূর্বে রংপুর থেকে পশ্চিমে দিনাজপুর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের ভিতশিলা অতি অল্প গভীরতা বিশিষ্ট। ভূ-পৃষ্টের নিচে ১২৮ মিটার থেকে ৭৫০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

বগুড়া চত্বর : এই অঞ্চলটি রংপুর চত্বরের দক্ষিণে অবস্থিত এবং আরও দক্ষিণে জিত্ত-সিনফ্লাইন অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। রংপুর চত্বরে নিম্নসমভূমি অঞ্চলের সংকীর্ণ মধ্য ভাগ 'কবজা বলায়' নামে পরিচিত। প্রায় ১২০ কিলোমিটার প্রশস্থ এ অঞ্চলটি জামালপুর, বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলে প্রাক ক্যামব্রিয়ান ভিত এবং তার উপর অবস্থিত নবীন শিলাস্তরসমূহ দক্ষিণ পূর্ব দিকে ঢালু।

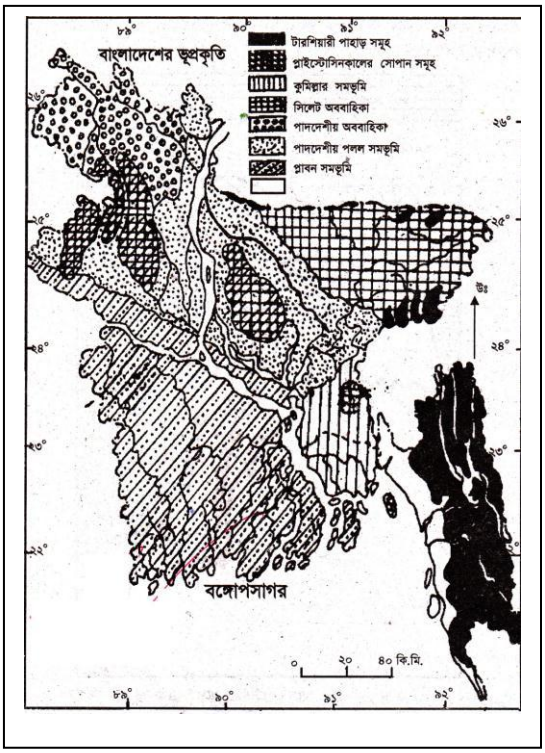

চিত্র: বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

২. বেসিন বা অবনতিত অঞ্চল: বগুড়া চত্বরের দক্ষিণে বাংলাদেশের দক্ষিণ এবং পূর্বাংশ বরাবর এই বেসিন অঞ্চল বিস্তৃত। এখানে পাললিক শিলাস্তর অত্যধিক পুরু বা সাধারণভাবে ১২ থেকে ১৫ কিলোমিটার এবং সর্বোচ্চ প্রায় ২০ কিলোমিটার পুরু।

বাংলাদেশের ভূমিরূপের পরিবর্তন

প্রায় ১৭ কোটি বছর পূর্বে ভারতের দৃঢ় ভূখণ্ড গণ্ডোয়ানা ভূভাগ থেকে উত্তর দিকে সরতে আরম্ভ করলে বঙ্গীয় বেসিন বা বঙ্গখাত গঠনের সূত্রপাত হয়। সেই সময়ে বর্তমান হিমালয় পার্বত্য এলাকা টেথিস সাগরে অন্তর্গত ছিল। অনুমানিক ৭.৫ কোটি বছর পূর্বে ভারতীয় দৃঢ় ভূখণ্ড উত্তর দিকে সরে ইউরেশিয়া প্লেটের সাথে ধাক্কা খায়। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের উত্তর সীমানায় আসাম উপসাগরের ও বার্মা উপসাগর সৃষ্টি হয়। বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা এই উপসাগরের অন্তর্গত ছিল।

মহাযুগ	যুগ	উপযুগ বা কাল	শুরু আনুমানিক সময় (বছর আগে)	বাংলাদেশের প্রধান ভূগঠন	প্রাণী ও শিলা
নব-জীবীয়	কোয়া টারনারি	হেলো সিন	১০ হাজার (এই সময় কাল এখনও চলছে)	নবীন পলিমাটি ও পলিমাটি, (পুরুত্ব ৬০ মিটার) সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চল।	আধুনিক মানুষ, বালি, সিস্ট কাদা।
		প্লেইস্টোসিন	১০ লক্ষ	প্রাচীন পলিমাটি, চত্বর বা সোপান এলাকা বরেন্দ্রভূমি, ভাওয়াল ও মধুপুর গড় এবং লালমাই পাহাড় পুরাতন পলল, ভূআলোড়ন ও উত্থিত ভূভাগ।	আদিম মানুষ, নুড়ি, কাঁকর, বালু, কাদা, মধুপুর ক্লে মূলত কাদা শিলা

মহাযুগ	যুগ	উপযুগ বা কাল	শুরু আনুমানিক সময় (বছর আগে)	বাংলাদেশের প্রধান ভূগঠন	প্রাণী ও শিলা
	টার সিয়ারি	প্লাইওসিন	১.২ কোটি	হিমালয় পর্বত শ্রেণির উত্থান টেথিস সাগরের বিলুপ্তি ঘটে।	মূলত বেলে পাথর ও কিছু কাদা শিলা
		মাইওসিন	২.৫ কোটি	বঙ্গখাতের সমুদ্রসীমা উত্তর দিকে বিস্তার রোধ, বাংলাদেশে টারশিয়ারি পাহাড় শ্রেণির উত্থান হয়। হিমালয় পর্বতের পাদদেশে পলি জমা শুরু হয়।	কাদাশিলাও বেলে পাথর। অঙ্গারময় কাদাশিলা ও বেলে পাথর।
		ওলিগোসিন	৩.৫ কোটি		
		ইয়োসিন	৬ কোটি	ভারতীয় প্লেট ইউরেশিয়া প্লেটের সাথে ধাক্কা খাওয়ার বঙ্গখাত (আসাম উপসাগর ও বার্মা উপসাগর)	মূলত কাদা শিলা ও কিছু চুনাপাথর এর সৃষ্টি হয়।
		পলিওসিন	৭.৫		

প্রায় ৫.৫ কোটি বছর পূর্বে ভারতীয় দৃঢ় ভূখণ্ড ইউরেশিয়া প্লেটের সাথে দ্বিতীয়বার ধাক্কা খাওয়ার ফলে চুনাপাথর জমার মধ্য দিয়ে আসাম উপসাগর বা বঙ্গখাতের সমুদ্রসীমার উত্তরদিকের বিস্তার রোধ হয়। আবর ২১.৭ কোটি বছর পূর্বে তৃতীয়বার ভারতীয় প্লেট ইউরেশিয়া প্লেটের সাথে ধাক্কা খায়। যার ফলে ভাঁজ খেয়ে হিমালয় পর্বত শ্রেণির উত্থান ঘটে এবং টেথিস সাগরের বিলুপ্তি ঘটে। হিমালয় পর্বতের পাদদেশীয় অঞ্চলে পলি জমার সূত্রপাত হয়। শেষ পরিবর্তন হয় প্লাইস্টোসিন উপযুগে, যার ফলে মধুপুর-বরেন্দ্র চত্ত্বর বা সোপান ভূমির সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের ভূমিরূপ গঠন

ভূ-গাঠনিক দিক থেকে বাংলাদেশকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. অব হিমালয়া অগ্রবর্তী অঞ্চল (সমুদ্রের অংশ)
২. দিনাজপুর ঢাল ও রংপুর মঞ্চ এবং
৩. বঙ্গীয় অববাহিকা।

বঙ্গীয় অববাহিকাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়–

ক) বগুড়া চত্ত্বর খ) নিম্নসমভূমি ও উচ্চ মহাকর্ষীয় এলাকা গ) ত্রিপুরা চট্রগ্রাম ভূঁভাজ অঞ্চল।

কলকাতা থেকে ময়মানসিংহ পর্যন্ত দীর্ঘ সংকীর্ণ 'কবজা বলায়' বগুড়া মহীসোপান এলাকা থেকে নিম্নসমভূমি ও মহাকর্ষীয় এলাকাকে পৃথক করেছে।

নিম্নসমভূমি ও মহাকর্ষীয় এলাকাকে দুই ভাগে বিভক্ত।

১. ফরিদপুর নিম্নসমভূমি অঞ্চল ও
২. বরিশাল উচ্চ মহাকর্ষীর অঞ্চল।

ফরিদপুর সমভূমি অঞ্চলের উত্তরে সিলেটের নিম্নে সমভূমি অবস্থিত। টাঙ্গাইল চত্ত্বর বা সোপান এলাকা ফরিদপুর সমভূমি থেকে সিলেট সমভূমিকে পৃথক করেছে। বাংলাদেশের রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুরের উচ্চভূমির কাছে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান সময়ের একাধিক খাত ও চ্যুতি রয়েছে। জামালগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল এসব চ্যুতি রেখার মধ্যে অন্যতম। মেসোজোইক মহাযুগে আসামের মালভূমি উত্থিত হয়। ক্রিটেশিয়াস যুগে মোহনা ও সোপান এলাকায় ফাটল ও মহাদেশ গঠনের সময় কোনো কোনো স্থানের ভূমি অবনমিত হয়ে মহীখাতের সৃষ্টি হয়। ক্রিটেশিয়াস যুগ ও টারশিয়ারি যুগে মায়োসিন কালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকা উত্থানের আগে বেশ কয়েকবার বঙ্গখাতের উত্থান ও অবনমন হয়।

প্যালিওসিন কালে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মহাদেশীয় ভূভাগ ছিল, কিন্তু মায়োসিন কালে ভূ-আলোড়নের ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা নিমজ্জিত হয়। ইয়োসিন কালে কলকাতা থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত যে 'কবজা বলায়' সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে নাগাপাহাড়ে ডকিচ্যুতির সৃষ্টি হয়। ফলে ভূতাত্ত্বিক কারণে বাংলাদেশের নদীগুলো বহুবার বিভিন্ন সময়ে তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। ওলিগোসিন কালে মায়ানমায়ের পর্বতশ্রেণি উত্থানের ফলে মায়ানমার থেকে বঙ্গখাত পৃথক হয়ে যায়। একই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভঙ্গিল পাহাড়গুলো ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের উত্থান হয়। মায়োসিন যুগে বঙ্গখাতে ভূআলোড়ন ঘটে, ফলে ত্রিপুরা চট্টগ্রাম ভঙ্গিল পর্বত আরো বেশি উত্থিত হয়। অপরদিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ভূঅবনমনের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।

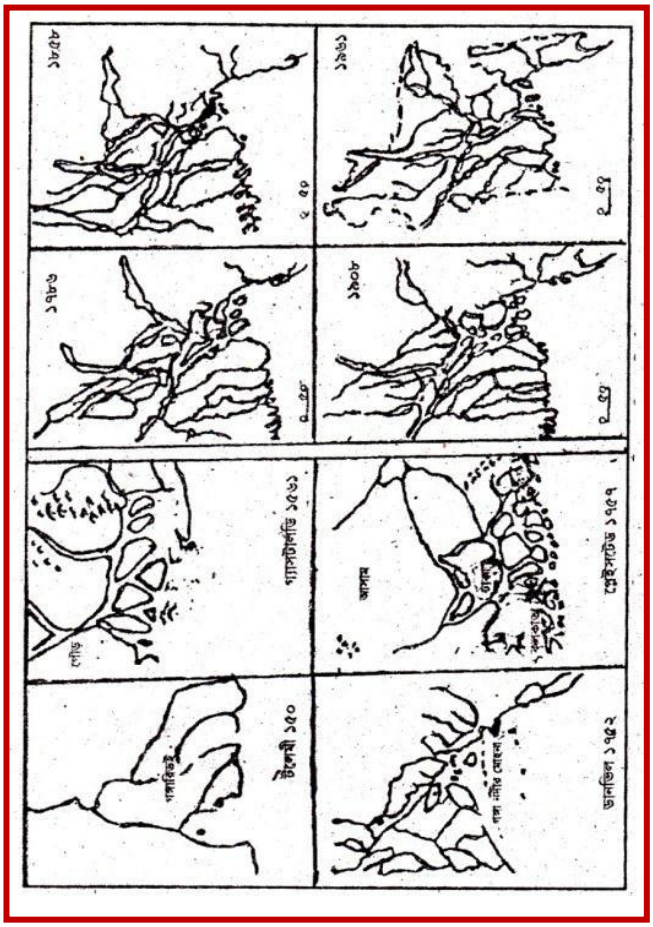

চিত্র: বাংলাদেশের নদীগুলোর গতিপথ পরিবর্তন

কোয়াটারনারি যুগের (শুরু ১০ লক্ষ বছর আগে) প্লেইস্টোসিন কালের সঞ্চয় প্রাচীন পলি দিয়ে গঠিত। ভূআলোড়নের প্রভাবে এই সব ভূভাগ সাধারণ ভূমিতল থেকে উত্থিত হয়ে চত্বর বা সোপানে পরিণত হয়েছে। প্লেইস্টোসিন কালের শেষ ভাগে (১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার বছর আগে) শেষ বরফ যুগে তুষার গলনের ফলে থিতানো নুড়ি, কাঁকর চত্বর বা সোপানগুলোতে সঞ্চিত হয়। বরেন্দ্র ভূখণ্ড, মধুপুর ভূখণ্ড লালমাই পাহাড় ও দক্ষিণ হবিগঞ্জের কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় কোয়াটারনারি যুগে উত্থিত হয়েছে। প্লেইস্টোসিন কালের পর হেলোসিন বা সাম্প্রতিক কাল শুরুহয় আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে। বিগত ১০ হাজার বছরে বাংলাদেশের সমভূমি অঞ্চলের ভূ-সংস্থানে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বঙ্গ অববাহিকায় নদীগুলো বার বার তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। নদীর কক্ষ বহন ও সঞ্চয় কাজের ফলে সমভূমি উপর সঞ্চিত পলিরাশি প্রাচীন যুগে গঠিত ভূ-ভাগগুলোকে উঁচু করে তুলেছে। স্তরে স্তরে সঞ্চিত পলি গড়ে তুলেছে দেশের বৃহত্তর প্লাবন সমভূমি।

কোয়াটারনারি (চতুর্থ) পর্যায়ের পাললিক অনুক্রম

কোয়াটারনারি যুগ শুরু হয় বর্তমান সময় থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে। এই যুগ দুটি উপযুগ বা কালে বিভক্ত, ক) প্লেইস্টোসিন কাল ও খ) হেলোসিন কাল। কোয়াটারনারি যুগে বঙ্গ অববাহিকায় বেলে পাথর, পলি, শেল, বালি এবং কাদামাটির স্তর জমেছে। বাংলাদেশের ভূমির গঠন ও পলি সঞ্চয়ের সময় অনুসারে দেশের ভূতাত্ত্বিক অঞ্চল নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন ধরনের অবক্ষেপ সঞ্চিত হয়ে বর্তমান ভূতাত্ত্বিক অঞ্চল বিকাশ লাভ করেছে। এখনও এর বিবর্তন চলছে। কোয়াটারনারি পর্যায়ের পাললিক অনুক্রমকে প্রধানত ৬টি শ্রেণিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন–

১। **উপকূলীয় অবক্ষেপ অঞ্চল :** চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত বরাবর সংকীর্ণ এলাকায় বালির অবক্ষেপণ পড়েছে। প্রায় গোলাকৃতির মিহি দানাদার এই বালির রং হালকা সাদা ধূসর। বালির সাথে ভারি খনিজ, শেলচূর্ণ ও কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে। চট্টগ্রাম উপকূল থেকে শুরু করে কক্সবাজার হয়ে দক্ষিণে টেকনাফ পর্যন্ত এবং উপকূলের অদূরে কুতুবদিয়া ও মহেশখালী দ্বীপের কিছু অংশে এরকম অবক্ষেপ দেখা যায়।

২। **ব'দ্বীপীয় অবক্ষেপ অঞ্চল :** ব'দ্বীপীয় অবক্ষেপ হচ্ছে সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলে সঞ্চিত পলিকণা। পদ্মা নদীর দক্ষিণ অঞ্চল এবং মেঘনার মোহনার পশ্চিম অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় এরকম পলি কণার অবক্ষেপ সঞ্চিত হয়েছে। বদ্বীপীয় অধিকাংশ এলাকা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে গড়ে ১৫ মিটার উঁচু। সামুদ্রিক জোয়ার প্রবণ বদ্বীপ অঞ্চল সমুদ্র পৃষ্ট থেকে গড়ে ৩ মিটার উঁচু। ভূমির ঢাল প্রতি ২০ কিলোমিটারে ১ মিটার। বদ্বীপীয় অবক্ষেপ অঞ্চল ৬ ভাগে বিভক্ত। যেমন-

ক) **গরান ভূমির অবক্ষেপ অঞ্চল :** পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা নদী থেকে পূর্বে হরিণঘাটা পর্যন্ত সুন্দরবন এলাকা এবং বরগুনার কিছু অঞ্চলে এ রকম অবক্ষেপ জমেছে। অবক্ষেপের বর্ণ গাঢ় ধূসর। এছাড়া কালোমাটি ও কাদা দেখা যায়। সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে পাতলা সৈকতবালির স্তর জমেছে। এই মাটি চাষের অযোগ্য এবং গরান উদ্ভিদে আচ্ছাদিত।

খ) **জোয়ার কাদা অঞ্চল :** হাতিয়া ও ভোলার দক্ষিণাংশ এবং সন্দীপের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ জোয়ারের সময় কাদা অবক্ষেপ জমে। কাদার রং গাঢ় নীলাভ ধূসর। এতে পলি, সৈকত বালি এবং জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ শৈবাল মিশ্রিত থাকে।

গ) **বদ্বীপীয় জোয়ারের অবক্ষেপ অঞ্চল :** সাতক্ষীরা ও খুলনার কিছু অংশ এবং ঝালকাঠি, পিরোজপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার জোয়ার প্রবণ এলাকায় এ রকম অবক্ষেপ জমেছে। অবক্ষেপের বর্ণ হালকা সবুজাভ-ধূসর, কোথাও হলুদাভ-ধূসর। এই অবক্ষেপের সাথে পলি ও কাদাপলির সাথে মিহি বালি মিশ্রিত থাকে।

ঘ) **মোহনা অবক্ষেপ অঞ্চল :** ভোলা জেলার অধিকাংশ, বরিশালের উত্তর-পূর্বাংশ, শরিয়তপুরের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, মনপুরা দ্বীপ, হাতিয়ার উত্তর ও মধ্যঅংশ, সন্দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য অংশে মোহনা অবক্ষেপ জমেছে। হালকা ধূসর বাদামী, হলুদাভ-ধূসর কাদাপলি, পলি ও বালির অবক্ষেপ নদীর মোহনায় জমা হয়। নদীর পাড় ও দ্বীপগুলোর কিনারায় মিহি বালির অবক্ষেপ জমে। কোথাও আড়াআড়িভাবে স্তরে স্তরে, কোথাও মাছের কাঁটার মতো সারি সারি পলি ও কাদার অবক্ষেপ জমে।

ঙ) **বদ্বীপীয় পলল অবক্ষেপ অঞ্চল :** পদ্মা নদীর দক্ষিণে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, রাজশাহী ও ফরিদপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও খুলনার কিছু অংশে বদ্বীপীয় পলি জমেছে। ধূসর বর্ণের বালিযুক্ত পলি এবং কাদাযুক্ত পলি এ অঞ্চলের অবক্ষেপের বৈশিষ্ট্য।

চ) **বদ্বীপীয় বালির অবক্ষেপ অঞ্চল :** মেহেরপুর রাজশাহী, ফরিদপুর ও মাদারীপুরের কিছু অংশ এবং শরিয়তপুরের অধিকাংশ এলাকায় বদ্বীপীয় বালির অবক্ষেপ রয়েছে। হালকা হলুদাভ ধূসর বর্ণের মিহি বালি এবং পলিযুক্ত বালি এ অঞ্চলের অবক্ষেপের বৈশিষ্ট্য।

৩। **পলিজ অবক্ষেপ অঞ্চল :** পলিজ অবক্ষেপ নানা রকম হতে পারে। যেমন– বন্যার পানিতে ভেসে আসা পলি, নদীর দুই তীর থেকে ধুয়ে আসা পলি, নিচু জলাশয়গুলোতে জমে থাকা পলিকাদা। পলিজ অবক্ষেপ অঞ্চল ৫ ভাগে বিভক্ত। যেমন-

ক) **নদী বাহিত বালির অবক্ষেপ অঞ্চল :** কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, চাঁদপুর জেলার কিছু অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। তিস্তা, যমুনা, পদ্মা ও মেঘনা নদীর দুই তীরের অববাহিকায় পলিজ বালির অবক্ষেপ জমেছে। বালির বর্ণ হালকা বাদামী-ধূসর। আকৃতি গোলাকার দানাদার। যমুনা নদীর বালি মোটা ও মিহি পদ্মা ও মেঘনা নদীর বালি মধ্যম ও মিহি।

খ) **নদীবাহিত পলির অবক্ষেপ অঞ্চল :** মহানন্দা নদীর অববাহিকা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলার কোনো কোনো এলাকায় নদীবাহিত পলির অবক্ষেপ জমেছে। এই পলি হালকা, প্রায় ধূসর, মিহি।

গ) **নদীবাহিত পলি ও কাদার অবক্ষেপ অঞ্চল :** নাটোর, পাবনা, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, সিলেট নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর জেলার অধিকংশ এলাকা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, বগুড়া, গঠনবান্দা, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অল্প এলাকায় নদীবাহিত পলি ও কাদার অবক্ষেপ জমেছে। এই পলি ও কাদার রং গাঢ় ধূসর। পলি ও কাদার জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে এর বর্ণ গাঢ় অথবা হালকা হয়। এসব অঞ্চলের কয়েকটি জায়গায় নিচু এলাকায় পিট কয়লা আছে।

ঘ) **চান্দিনা পলল অবক্ষেপ অঞ্চল :** ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার অধিকাংশ এলাকায় এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সীগঞ্জ ও শরিয়তপুর জেলার অংশ বিশেষ চান্দিনা পললের অবক্ষেপ রয়েছে। এই পলল হলুদাভ বাদামী, ধূসর ও নীলাভ ধূসর। এতে পলি ও কাদা মেশানো রয়েছে। এই পলি বেশি ঘন, জমাটবদ্ধ। চান্দিনা পলল অবক্ষেপ অঞ্চল স্বাভাবিক প্লাবন মাত্রার উপরে অবস্থিত।

ঙ) **উপত্যকা পলল অবক্ষেপ অঞ্চল :** হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার সীমান্ত এলাকা, চট্রগ্রাম জেলার অধিকাংশ এবং কক্সবাজার ও খাগড়াছড়ি জেলার অল্পকিছু অংশে এই ধরনের পলির অবক্ষেপ রয়েছে। এটি গাঢ় ধূসর ও প্রায় ধূসর বর্ণের হালকা বাদামি, কাদাময় পলি ও মিহি বালির অবক্ষেপ। মোট দানাযুক্ত পলি তীব্র পানি প্রবাহের মাধ্যমে উপত্যকায় এসে পড়ে এবং নদী প্রবাহের ফলে মিহি দানায় পরিণত হয়। এসব অঞ্চলে মাঝে মাঝে ভূমিধ্বস ও কর্দম প্রবাহের ফলে অবক্ষেপ জমে।

৪। **উপ-বদ্বীপীয় পলিজ অবক্ষেপ অঞ্চল :** বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অংশে তিস্তা নদীবক্ষে অবক্ষেপ জমে চর সৃষ্টি হয়েছে। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল থেকে পলি বয়ে এসে নদীর বাম দিকে চর তৈরি হচ্ছে, ওদিকে তিস্তা ও তার শাখা নদীর পানি প্রবাহের কারণে ডান দিকে তীর ভূমিক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এ অঞ্চলে ৩ ধরনের শিলাপূর্ণ বালির অবক্ষেপ জমেছে।

ক) **উপ-বদ্বীপীয় শিলাপূর্ণ বালি :** তিস্তা উপ-বদ্বীপের দক্ষিণে এ ধরনের অবক্ষেপ রয়েছে। এই ধরনের অবক্ষেপে হালকা বাদামি ধূসর এবং হালকা হলুদাভ ধুসর পলিযুক্ত মিহি বালির সাথে শিলাখণ্ড মিশে আছে। শিলাখণ্ডগুলো উঁচু নিচু মানের রূপান্তরিত শিলা এবং সামান্য কিছু আগ্নেয়ও পাললিক শিলা থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

খ) **শিলাপূর্ণ নবীন বালি :** নীলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার এবং দিনাজপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলার কিছু কিছু এলাকায় এ ধরনের বালির অবক্ষেপ দেখা যায়। তিস্তা উপ-বদ্বীপের পূর্ব অংশ প্রতি বছর প্লাবিত হয়। প্লাবনের সাথে ভেসে আসা বালি মিহি ও পলিযুক্ত।

গ) **শিলাপূর্ণ প্রাচীন বালি :** পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় শিলাপূর্ণ প্রাচীন বালির অবক্ষেপ রয়েছে। হেলোসিন কালের শেষ দিকে তিস্তা নদীর গতিপথ পূর্ব দিকে সরে যাওয়ায় উপ-বদ্বীপের পশ্চিম অংশে এখন আর নতুন করে অবক্ষেপ জমতে পারছে না।

৫। **জলাভূমির অবক্ষেপ অঞ্চল :** রাজশাহী, নওগাঁ ও পাবনা জেলার বেশকিছু অঞ্চল, বৃহত্তর যশোর, ফরিদপুর, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জের অংশবিশেষ; শেরপুর, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে কিছু অঞ্চল; ঢাকা, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ও গাজীপুরের অংশ বিশেষ; সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাটের বেশকিছু অংশবিশেষ এবং সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার বেশিরভাগ এলাকাজুড়ে জলাভূমির অবক্ষেপ দেখা যায়। এই অবক্ষেপগুলো ধূসর, নীলাভ-ধূসর, কাদা, কালো জৈব পীট এবং হলুদাভ-ধূসর পলি। বিল ও জলাভূমিগুলোতে পীট কয়লা সঞ্চিত রয়েছে।

৬। **অবশেষ অবক্ষেপ অঞ্চল :** বাংলাদেশের মধুপুর গড় ও বরেন্দ্রভূমি এলাকায় অবশেষ অবক্ষেপ জমেছে। মধুপুর চত্বর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬-৩০ মিটার উঁচু। বরেন্দ্রভূমির বেশিরভাগ অঞ্চল উপ-বদ্বীপীয় অবক্ষেপের নিচে ঢাকা পড়েছে। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের কিছু অংশে এই অবক্ষেপ দেখা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের কিছু অংশ এবং রংপুর ও গাইবান্ধার কিছু এলাকা নিয়ে গঠিত বরেন্দ্র অঞ্চলে অবক্ষেপ হালকা বাদামি, কমলা, হালকা লাল, হলুদাভ-ধূসর, নীলাভ-ধূসর এবং কোথাও কোথাও সাদাবর্ণের পলিযুক্ত কাদা। এর মাঝে বালি, কোয়ার্টাজ, দস্তা ও অল্প পরিমাণে ফেলসপার মিশ্রিত আছে। টাঙ্গাইল, ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, নরসিংদী ও কুমিল্লার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত

মধুপুর গড়, ভাওয়ালের গড় ও লালমাই পাহাড় অঞ্চলের অবক্ষেপ হালকা হলদাভ ধুসর, কমলা, পাটকিলে ও ধূসর সাদা বর্ণের পলি, বালি, নুড়ি, কাঁকড় মিশ্রিত বালিযুক্ত কাদা রয়েছে। কাদার সাথে জৈব পদার্থ, দস্তা, কোয়ার্টজ ও ফেলসপার মিশ্রিত রয়েছে। বাংলাদেশে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগের মূলভিত্তি শিলাস্তরের উপরের পার্মো-কার্বোনিফেরাস যুগের গণ্ডোয়ানার পলি সঞ্চিত হয়েছে। এর পুরুত্ব ৪৮৮ মিটার কোয়াটারনির যুগে বেলে পাথর, শেল, বালি, পলি এবং কাদামাটির স্তর জমেছে। কোয়াটরনারি যুগের বেলেপাথর, শেল ও পলির পুরুত্ব ৩.৬ কিলোমিটার এবং স্তরীভূত বালি ও কাদামাটি ১.০৬ কিলোমিটার পুরু।

বঙ্গ অববাহিকার সবচেয়ে প্রাধান্য বিস্তারকারী শিলা শ্রেণি হচ্ছে বালু, কাঁদা, এবং পলি। অতীত ও বর্তমানের প্লাবন সমভূমির ও বদ্বীপের অগণিত জলাশয় পিট এবং কালো কাঁদা এর মতো কার্বনজাত সঞ্চয়ের নজির ধারণ করে রয়েছে। দিনাজপুর, রংপুর ও সিলেট জেলা এবং সিলেট জেলা থেকে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ প্রান্তর পূর্ব পাহাড় অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্ত বরাবর পর্বত পাদদেশীয় পলিরাশির মধ্যে নুড়ি ও শিলাচুর্ণ রয়েছে। মালভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলগুলো শিলার উপর বহুস্থানে কয়েক ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পুরু মাটি আবৃত করে রয়েছে। প্রবাল ও সমুদ্র শেলগুলোর মধ্যে এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপের চারিদিকে চোরা পাথরের শাখা রয়েছে। সমুদ্র ও চট্টগ্রাম থেকে টেকনাফের উত্তরে বহু স্থানে বেষ্টনকারী উপকূল বরাবর বহু প্রবাল ও প্রবালজাত কাঁদা সঞ্চিত রয়েছে। খাতবালু ও কাদা বাংলাদেশের নদীগুলো বরাবর বিকাশ লাভ করেছে এবং উচ্চতর অংশে বালু ও কাঁদা যথেষ্ট। বিশেষ করে ব'দ্বীপীয় নদী সঞ্চয়গুলোর মধ্যে কাঁদা ও যথেষ্ট সূক্ষ্মবালূ দেখা যায়। পাহাড়ি নদীগুলো নদী সঞ্চয়ের মধ্যে বোল্ডার ও নুড়ি প্রাধান্য লাভ করেছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের মধ্যভাগ প্রায় ১২ ফুট পুরু সামুদ্রিক বালুর ছোট ছোট স্তর রয়েছে। সৈকত বালুগুলো উপকূল বরাবর গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের জলবায়ু

ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত কিন্তু এর বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশে এর জলবায়ুর প্রভাব সবচাইতে বেশি দেখা যায়। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান হলো ২০°৪৫´ পূর্ব উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°৪০´ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮০°০৫´পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২°৪০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত । দক্ষিণ পূর্বের পাহাড়ি অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাই হলো নিচু সমতল ভূমি। এদেশকে ঘিরে রয়েছে পূর্বে আসামের পাহাড় শ্রেণি ও উত্তরে মেঘালয়, মালভূমি এবং তার ও উত্তরে হলো সুউচ্চ হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিম পশ্চিমে বঙ্গের সমভূমি এবং তারও উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বত আর পশ্চিমে হলো বিস্তীর্ণ গাঙ্গের সমভূমি।

তবে উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বতমালা ও তৎসংলগ্ন গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়, পূর্বে পাতকাই-নাগা-লুসাইন ও আরাকান-ইয়ামা ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর ও তৎপরবর্তী ভারত মহাসাগারের সুবিশাল জলরাশি এবং পশ্চিমে বিশাল গাঙ্গেয় সমভূমি ও থর মরুভূমি বাংলাদেশের জলবায়ুকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। শীতকালে উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু (চলতি ভাষায় পূবালি বাতাস) গ্রীষ্মের শুরুতে উত্তর-পশ্চিম বায়ু প্রবাহ (কাল-বৈশাখী) এবং গ্রীষ্ম পরবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর পরিবর্তিত প্রবাহ (মৌসুমী বায়ু) এদেশের জলবায়ুর চালিকা শক্তি হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশ, ভারতের আসামের কিয়দাংশ, পশ্চিম বাংলা এবং বিহার উড়িষ্যার কিয়দাংশ আবহমান কাল থেকে ষড়ঋতুর দেশ হিসাবে বিবেচিত। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত, বসন্ত এখানে পর্যায়ক্রমে নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়। তবে বিগত দু'দশকে জলবায়ুর তাৎপর্য্যপূর্ণ পরিবর্তনে ষড়ঋতুর বৈশিষ্ট্য সেভাবে পরিস্ফুটিত হচ্ছে না। বর্তমানে গ্রীষ্মকাল, পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বর্ষাকাল ও স্বল্পস্থায়ী শীতকাল এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই অধিক স্পষ্ট। বাংলাদেশের উষ্ণ-আর্দ্র-সমভাবাপন্ন ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর মূল বৈশিষ্ট্যে আমূল পরিবর্তন না হলেও সাম্প্রতিক সময় গ্রীষ্মের প্রখরতা বৃদ্ধি, দিবা-রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য বৃদ্ধি (বিশেষত উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে) প্রলম্বিত অথবা অসময়োচিত বর্ষা, স্বল্পস্থায়ী অথবা অস্থিতিশীল শীত ঋতুর আর্বিভাব প্রভৃতি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বসন্তর বৈশিষ্ট্য কিছুটা বজায় থাকলেও শরৎ হেমন্তর আদি বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত প্রায়।

জলবায়ুর উপাদানগত অবস্থা (Element of Climate)

বাংলাদেশের সার্বিক তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ নিম্নরূপ-

তাপমাত্রা (Temperature)

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার স্থানগত মানওয়ারী প্রভেদ রয়েছে। গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত (চৈত্র-আষাঢ়) সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। স্থানভেদে তাপমাত্রা ৪০°-৪৪° সেলসিয়াস ও রেকর্ডকৃত হয়েছে। গড়ে এপ্রিল ৩৪° মে তে ৩৩° সেলসিয়াস। বর্ষাকালে এ মাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়। তবে বৃষ্টিহীন আষাঢ়ে ৪০° সেলসিয়াস পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের রাজশাহীর লালপুর দেশের উষ্ণতম স্থান। এতদাঞ্চলের বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা গ্রীষ্মকালে তাপপ্রবাহ দ্বারা আক্রান্ত হয় ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চল তাপদাহের পরিমাণ কম। উপকূলবর্তী এলাকাতেও তাপমাত্রা চরমে পৌঁছায় না। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি (অগ্রহায়ণ-মাঘ) তাপমাত্রা নিম্নমুখী থাকে। বিশেষত উত্তরবঙ্গে বৃহত্তর দিনাজপুর, পাবনার ঈশ্বরদী, বৃহত্তর কুষ্টিয়া, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে তাপমাত্রা কখনও কখনও ৫° সেলসিয়াস বা তারও নিচে নেমে যায়। যেমন–

বাংলাদেশের জলবায়ুর সাধারণ চিত্র

- গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ২৬.১০ (৭৯০ ফা.)
- গড় তাপমাত্রার পার্থক্য (দিবারাত্রি) ৯০ সে.
- গড় মাসিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪০ সে. (৯৩০ ফা.) এপ্রিল মাসে;
- গড় মাসিক সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ডিসেম্বরে ১৪০ সে (৫৭০ ফা.)
- বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৮৭৫ মিলিমিটার;
- গড়ে বছরে ১৩৬ দিন ০.১ মিলিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত হয়;
- ডিসেম্বর বছরের শুষ্কতম মাস হিসাবে বিবেচিত (গড় বৃষ্টিপাত ৫ মিলিমিটার);
- সর্বাধিক আর্দ্র মাস হল আগস্ট (গড় বৃষ্টিপাত ৩৩৭ মিলিমিটার)
- গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫.৫% । গড় মাসিক আর্দ্রতা মার্চে ৪৫% জুন-জুলাইয়ে ৭৯% এর উন্নীত হয়;
- বাংলাদেশে বছরের কোনো তুষার দিবস নেই।

সম্প্রতি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পঞ্চগড়ে ৩° সেলসিয়াস পর্যন্ত রেকর্ডকৃত হয়েছে। শৈত্য প্রবাহে বৃহত্তর দিনাজপুরে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে থাকে। তবে উপকূলীয় এলাকা এবং মধ্য পূর্বাঞ্চল তাপমাত্রা ততটা নিম্নগামী হয় না। দেশে গড় তাপমাত্রা ডিসেম্বরে ১৪° সেলসিয়াস ও জানুয়ারিতে ১৫° সেলসিয়াসের মতো থাকে।

আর্দ্রতা (Humaidit)

বাংলাদেশে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে শুষ্কাবস্থা থাকায় আর্দ্রতা কম থাকে। মার্চ এপ্রিলে বায়ুর গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫% এর কাছাকাছি থাকে। কিন্তু জুলাই-আগস্টে সেটা ৭৮%–৭৯% এ পৌঁছায়। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে আর্দ্রতা বেশি। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মে পর্যন্ত (মাঘ-বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য) বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যায়।

বৃষ্টিপাত (Rainfall)

বাংলাদেশে শীতকালে শুষ্ক আয়ন বায়ু প্রভাব বিস্তার করায় বৃষ্টিপাত প্রায় শূন্য। হঠাৎ লঘুচাপের প্রভাবজনিত বৃষ্টি ছাড়া আর কোনো নিয়মিত বৃষ্টিপাত হয় না। ঐ সময় গ্রীষ্মের শুরুতে নিম্নচাপজনিত সাময়িক বৃষ্টি এবং জুন-জুলাই থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে মৌসুমী বায়ু প্রবাহজনিত কারনে একটানা বর্ষণ শুরু হয়। বাংলাদেশের বর্ষাকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৃষ্টিপাত। বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক তারতম্য রয়েছে। সিলেট বিভাগে দেশের সর্বাধিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় রাজশাহী বিভাগে অত্যান্ত কম। এছাড়া সিলেট সংলগ্ন কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, বৃহত্তর নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় এলাকাতে বৃষ্টিপাত হয়।

বায়ুচাপ (Wind Pressure)

বাংলাদেশে শীতকালে উচ্চচাপ ও গ্রীষ্মকালে নিম্নচাপ বিরাজ করে। জানুয়ারি মাসে পৌষ-মাঘ বায়ুচাপ গড়ে ১০২০ মিলিবার এবং মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (ফাল্গুন-আশ্বিন মাস পর্যন্ত) এই চাপ কমে ১০০৫ মিলিবারে পৌঁছায়। বায়ুচাপের তারতম্যের ফলেই ঐ সময় বিপরীতমুখীবায়ু প্রবাহ ও তজ্জনিত ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে।

বায়ুপ্রবাহ (Wind movement)

সাধারণভাবে বাংলাদেশে শীত ঋতুতে উত্তর পূর্ব দিক থেকে, গ্রীষ্মে উত্তর-পশ্চিম এবং বর্ষায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে। শীতকালে দেশের উত্তরাঞ্চলে মহাদেশীয় হিমপ্রবাহ এবং গ্রীষ্মকালে স্থানীয়ভাবে নিম্নচাপ বিরাজ করায় উত্তর পশ্চিমের উচ্চচাপ বায়ু প্রবলভাবে এদেশে আঘাত করে কালবৈশাখী সৃষ্টি করে। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হয় মূলত নিরক্ষরেখার উত্তরে আন্তঃক্রান্তীয় অভিসরণ এলাকা সৃষ্টিজনিত কারণ। বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রভাগ অতিক্রম করে উত্তরাঞ্চলে পার্বত্য এলাকায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। শরৎকালে বিলম্বিত মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশ ও সংলগ্ন পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা ও আন্ধ্র উপকূলে ঘন ঘন ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়।

কুয়াশা, কুজ্ঝটিকা ও শিশির (Fog, mist & Dew)

নভেম্বর-মার্চ (কার্তিক-মাঘ) কুয়াশা ও শিশিরপাত বাংলাদেশের আবহাওয়ার সাধারন বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কুয়াশা থাকলেও ডিসেম্বর জানুয়ারিতে কোনো কোনো বছর সুর্যোদয়ের পরও দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ঘন কুয়াশার আবরণ অব্যাহত থাকে। ঐ দুই মাস শিশিরপাতও হয় অত্যধিক। সাধারণত হেমন্তর শুরুতে কার্তিক শিশিরপাত আরম্ভ হয়। পশ্চিমা শীতল বায়ুর প্রভাবে উত্তরবঙ্গে কখনও কখনও কুজ্ঝটিকা দেখা যায়।

সামুদ্রিক ঝড় (Cyclones)

সামুদ্রিক ঝড় বাংলাদেশে ও তৎসংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যেগুলির উপকূলীয় অঞ্চলের সাধারণ ঘটনা। বঙ্গোপসাগরের এই ঝড়গুলি সাইক্লোন হিসাবে পরিচিত। চীনে টাইফুন এবং মধ্য আমেরিকার হারিকেন ঘূর্ণিঝড়ের সাথে সাইক্লোনের সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বাংলাদেশের উপকূলে বর্ষাঋতুর শেষের দিকে ঘন ঘন ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা ছিল যা সাধারণের কাছে আশ্বিনের ঝড় নামে অখ্যায়িত। আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণ (আক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর) পর্যন্ত ঐ ঝড়গুলি আঘাত হানার সময়। সাইক্লোন বছরের যে কোনো সময়ই এসে থাকে। তবে বর্ষা শেষ থেকে গ্রীষ্মের প্রারম্ভ পর্যন্ত প্রবণতা বেশি থাকে। ১৯৬৫ সালের ঝড়, ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়, ১৯৯১ সালে ঘূর্নিঝড়সহ সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় আইলা সুপার সাইক্লোন সিডর এবং মিয়ানমারের ইরার্বতী ব-দ্বীপ লণ্ডভণ্ডকারী সাইক্লোন নার্গিস ঐ সময়ের মধ্যেই সংঘটিত।

ঋতুচক্র

বাংলাদেশ ঘড়ঋতুর দেশে হিসেবে সুপরিচিত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্বে (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) বৃহত্তর বাংলাদেশের (পশ্চিম বাংলাসহ বর্তমান বাংলাদেশ, আসাম, বিহার-উড়িষ্যার কিয়দাংশ) গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত– এই ছয় ঋতুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক প্রাঞ্জল সাহিত্যকর্ম পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের সময়ও ষড়ঋতুর বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকৃতির মাঝে স্বমহিমায় প্রকাশিত হতো। কিন্তু আশির দশকের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশের জলবায়ুতে কিছু কিছু পরিবর্তন সূচিত হয় এবং বর্তমানে ষড়ঋতুর বৈশিষ্ট্যাদি পূর্বের মত সুপ্রকাশিত বা পরিস্ফুটিত নয়। এখন মূলত শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা তিনটি ঋতুর প্রধান্যই বেশি এবং তাও পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্তমান পরিবর্তন বিবেচনা করলেও ষড়ঋতুর বিষয়টি এতদঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জলবায়ু প্রপঞ্চ হিসাবে ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ

জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বাষ্পীভবনের পার্থক্য, বায়ুচাপ ও প্রবাহের তারতম্য প্রভৃতিকে নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা হয়। সার্বিকভাবে বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত হলেও বিভিন্ন এলাকার তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের গড় এক রকম না। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা, বাষ্পীভবনের হার প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে। যেগুলি বিবেচনায় বিভিন্ন অঞ্চলের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ জলবায়ু চিহ্নিত করা যায়।

বাংলাদেশের জলবায়ুর শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উনিশ'শ ষাটের দশকে। প্রখ্যাত ভূগোলবিদ প্রফেসর নাফিস আহমদ বাংলাদেশের জলবায়ু কয়েকটি উপ-অঞ্চলে ভাগ করেন। যেমন–

নাফিস আহমদ কৃত বাংলাদেশের জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ

জলবায়ু শ্রেণি	প্রভাবিত অঞ্চল
মহাদেশীয় জলবায়ু	বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া
নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু	বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহের পশ্চিমাংশ, ফরিদপুর ও কুমিল্লা
উন্নত মহাদেশীয়	অধুনা রংপুর বিভাগ
সামুদ্রিক জলবায়ু	বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী অঞ্চল
শীতল বৃষ্টিবহুল জলবায়ু	সিলেট বিভাগ এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের পূর্বাংশে (বর্তমান নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা)
পাহাড়ী জলবায়ু	পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকা।

অধ্যাপক নাফিস আহমদের শ্রেণিবিভাগটি সাধারণ পর্যবেক্ষণভিত্তিক। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়পূর্বক এটা করা হয়নি। এক্ষেত্রে হারুন আর রশিদ কৃত বাংলাদেশের জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগটি অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি কোপেন ও মেয়ার প্রদত্ত শ্রেণিবিভাগের অনুকরণে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ নির্ধারণে প্রয়াসী হন। তাঁর শ্রেণিবিভাগটি নিম্নোক্ত সারণিতে প্রকাশ করা যায়।

হারুন আর রশিদ কৃত বাংলাদেশের জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ

জলবায়ুর শ্রেণি	গড় তাপমাত্রা	গড় বৃষ্টিপাত	অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল
দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল	১৩° সে.–৩২° সে	২৫৪ সে.মি এর অধিক	চট্টগ্রাম থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত উপকূলীয় সংকীর্ণ এলাকা, কুমিল্লার দক্ষিণাংশ (চাঁদপুর) পর্যন্ত বিস্তৃত।
উত্তর পূর্বাঞ্চল	১০° সে–৩২° সে.	৭০০ সে.মি (৩০০˝) প্রায়	উত্তর পূব সিলেট
জলবায়ুর শ্রেণি	গড় তাপমাত্রা	গড় বৃষ্টিপাত	অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল
উত্তর বঙ্গের উত্তরাংশ	১০° সে.–৩২° সে.	২০০–৩০০ সে.মি	পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারীও রংপুরের উত্তরাংশ।
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	১০° সে. –৩২° সে.	৩০০ সে.মি. এর কম	বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর বা রংপুর বিভাগের দক্ষিণাংশ
পশ্চিমাঞ্চল	৩৫০ সে. এর বেশি (গ্রীষ্মে)	১৫০ সে.মি এর কম	রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল	৩৫° সে. এর বেশি (গ্রীষ্মে)	১৫০ সে.মি এর কম	কুষ্টিয়া যশোর অঞ্চল
দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চল	৩২° সে. এর অধিক	১৯০ সে.মি এর অধিক	বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর

উপরের সারণীতে হারুন আর রশীদের সাতটি জলবায়ুগত অঞ্চল, তাদের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতগত বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ষড়ঋতুর বৈশিষ্ট্য

ষড়ঋতু মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতের বিশেষ এবং একক জলবায়ুগত প্রপঞ্চ যা বর্তমানে ঐতিহ্যের অংশ হতে চলেছে। এই ষড়ঋতুর স্থায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্যাদি নিম্নরূপ :

গ্রীষ্মকাল : বাংলা বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস (ইংরেজি মধ্য এপ্রিল মধ্য জুন) গ্রীষ্মকাল হিসেবে পরিচিত। এসময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য উচ্চ তাপমাত্রা ও তজ্জনিত নিম্নচাপ। ঐ স্থল নিম্নচাপের ফলে উত্তর-পশ্চিম দিক হতে উচ্চচাপের বায়ু প্রচণ্ডবেগে নিম্নচাপ কেন্দ্রে ধাবিত হয়ে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে যা কালবৈশাখী হিসেবে খ্যাত। কালবৈশাখীতে আমের মুকুলসহ ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে কালবৈশাখী ছাড়া গ্রীষ্মের অন্যতম ঘটনা হলো শিলাবৃষ্টি। অতিরিক্ত উত্তাপে জলীয়বাষ্প ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে এবং একপর্যায়ে কালবৈশাখী ও শিলা বৃষ্টি ছাড়াও গ্রীষ্মকালে টর্নেডো ও বজ্রঝড় সংঘটিত হয়ে থাকে।

বর্ষাকাল : আষাঢ় ও শ্রাবণ (মধ্য জুন-মধ্য আগস্ট) ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতের বাংলা ভাষা ভাষী প্রদেশসমূহে বর্ষকাল হিসেবে পরিচিত। মূলত দক্ষিণ, পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে ক্রমাগত ভারি বর্ষণ এই ঋতুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্রমাগত বর্ষণে এই সময় শুকনো জলাশয়গুলি ভরে যায় এবং কখনও কখনও বন্যা সৃষ্টি হয়। পানি চক্রের সমতা রক্ষা এবং পলি পড়ার মাধ্যমে জমির উর্বরতা রক্ষায় বর্ষাকাল অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ফসলাদির উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ছাড়া ও বর্ষ ঋতুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই সময় প্রাকৃতিকভাবে মৎসের বংশ বৃদ্ধি ঘটে।

শরৎকাল : ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। বর্ষাকালের বৃষ্টিপাত শরৎকালেরও অব্যাহত থাকে। তবে মাঝে মধ্যে মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ এবং ভ্যাপসা গরম শরৎকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শরৎকালে বায়ুচাপের তারতম্যে ঘন ঘন লঘুচাপ ও তজ্জনিত ঝড় সৃষ্টি হতে দেখা যায় (আশ্বিনের ঝড়)। এই সময় মৌসুমী বায়ুর পশ্চাদপসারণ শুরু হয় ফলে বাতাসের চাপ বৃদ্ধি পেয়ে মৌসুমী বায়ুর সাথে সংঘর্ষে বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে।

হেমন্তকাল : কার্তিক ও অগ্রাহায়ণ দুই মাস হেমন্তকাল হিসেবে বিবেচিত। এ সময়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাপমাত্রার হ্রাসমান অবস্থা এবং শীতের আগমন বার্তা। এক সময় হেমন্ত এতদাঞ্চলে নবান্নের মাস হিসেবে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ নতুন ধান উত্তোলন এবং তজ্জনিত উৎসব। তবে বর্তমানে সারাবছর ধান উৎপাদন হওয়াতে ঐ বিষয়টি আর দেখা যায় না। হেমন্তকালে একটি অন্যতম জলবায়ুগত প্রপঞ্চ হলো উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়। মৌসুমী বায়ুগতি বদলানোর সময় নিরক্ষীয় বলয়ে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়ে বঙ্গোপসাগরের উপর কেন্দ্রীভূত হয় এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ও ভারতীয় উপকূলে প্রচণ্ড বেগে আঘাত হানে।

শীত ঋতু : বাংলা পৌষ মাঘ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শীতঋতু হিসেবে বিবেচিত। শীত ঋতুতে গ্রীষ্ম এবং বর্ষা অপেক্ষা তাপমাত্রা অনেক কম এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে মাঝারি ঘনকুয়াশা লক্ষ্য করা যায়। উত্তরে হিমালয় পর্বতের বাধার কারণে গঠনবেরিয়া থেকে চরম শৈত্য এখানে আসতে পারে না। ফলে তুষারপাত ও তুষারঝড় সৃষ্টি মতো পরিবেশ থাকে না। শীতকালে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। তবে মাঝে মধ্যে মাঘ বা মাঘের শেষার্ধে পশ্চিমা লঘু চাপের প্রভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়। ঐ বৃষ্টিপাত নতুন ফসল বপন ও বৃক্ষের নবপত্র জন্মানোর ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। এখানে উল্লেখ্য হেমন্তর শেষে ও শীতের প্রারম্ভে পর্ণোমোচী বৃক্ষের পাতা ঝরে যায় এবং বসন্তর প্রারম্ভে নবপত্রোদয় শুরু হয়।

বসন্ত ঋতু : বাংলা ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত ঋতু হিসেবে সুপরিচিত। প্রচণ্ড শীতের শেষে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, বৃক্ষে নবপত্রের আগমন ঋতুরাজ বসন্তর বৈশিষ্ট্য। বসন্তর শেষার্ধে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং চৈত্রের শেষার্ধে নিম্নচাপ কোষের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় পরিচলন বৃষ্টিপাত ছাড়াও গ্রীষ্মের প্রথমার্ধে সৃষ্ট কালবৈশাখী ঝড়ও কোনো কোনো বছর পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের ক্রান্তিয় ঘূর্ণিঝড়

বঙ্গোপসাগর এবং এর উপকূলীয় দেশগুলো হলো পৃথিবীর উল্লেখ্যযোগ্য ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় প্রবণ অঞ্চল। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি ঘূর্ণিঝড়গুলো কোনো কোনোটি বাংলাদেশের উপকূলে হানা দেয় আবার কোনো কোনোটি বছরে একটি যেমন (১৯৬৩–১৯৬৬) এবং কোনো কোনো বছরে একাধিক যেমন ১৯৬০ সালে দুটি ১৯৬৫ সলে তিনটি ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলে হানা দিয়েছিল। আবার এমনও হয়েছে যে পর পর কয়েক বছর কোনো ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলে হানা দেয়নি। বাংলাদেশের দুটি ঋতুতে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয় একটি বর্ষার প্রাককালে এপ্রিল ও মে মাসে এবং অপরটি বর্ষার পরে অক্টোবর ডিসেম্বর মাসে এ দুটি ঘূর্ণিঝড় ঋতুর মধ্যে প্রাক বর্ষা ঋতুতে ৪০% এবং বর্ষা পরবর্তী ঋতুতে ৬০% ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। বাংলাদেশের উপকূলে যেসব ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে তার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি সংঘটিত হয় ফেনী নদীর মোহনা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল অঞ্চলে। তার পরবর্তী ঘূর্ণিঝড় প্রবণ অঞ্চল হলো বরিশাল থেকে ফেনী নদীর মোহানা পর্যন্ত উপকূল অঞ্চল যেখানে প্রায় এক চতুর্থাংশ ঘূর্ণিঝড় হানা দেয়। সুন্দরবন থেকে উপকূল অঞ্চলে বাদবাকী ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়।

৩.৫ বাংলাদেশের নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। যুগে যুগে বাংলার ছোট বড় অসংখ্য নদী বাংলার ইতিহাস রচনা করেছে, বাংলাকে গড়েছে, বাংলার আকৃতি প্রকৃতি নির্ণয় করেছে। তাই বাংলার ইতিহাস এক হিসেবে নদ-নদীর ইতিহাস। এই নদ-নদীই বাংলার প্রাণ, বাংলার আশীর্বাদ। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বড় বড় নদী হচ্ছে গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি। ছোট বড় অনেক উপনদী এসে এসব নদীতে মিশেছে। আবার এ নদীগুলো থেকে অসংখ্য স্রোত ধারায় অগণিত শাখা-প্রশাখা বের হয়ে শিরা উপশিরার মতো সাগর পানে বয়ে চলেছে। এত সংকীর্ণ পরিসরে এত অধিক নদ-নদীর সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। তাই বাংলাদেশে মাকড়শার জালের মতো নদ-নদী, খাল-বিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যার দৈর্ঘ্য হবে কমপক্ষে ১৫,০০০ মাইল। এর মাঝে রয়েছে খরস্রোতা, পার্বত্য নদী, শান্তক্ষীর্ণকায় উপনদী বা পদ্মা মেঘানার মতো উত্তাল নদী। আমাজান প্রবাহের পরই মোট প্রবাহের পরিমাণের দিক থেকে পদ্মা মেঘনার অবস্থান।

দেশজুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নদ-নদী বাংলাদেশের অহংকার। এদের মধ্যে গঙ্গা,পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের, মেঘনা, সুরমা, কর্ণফুলি এবং তিস্তা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এদের শাখা নদী ও উপনদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০। বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবাহিত এ সকল নদীর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২৪,১৪০ কিলোমিটার। গঙ্গা,পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র যমুনা এবং মেঘনা এই তিনটি বৃহৎ নদীর মিলিত নিষ্কাশন অববাহিকার আয়তন প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। নদীগুলো বঙ্গোপসাগরে বয়ে নিয়ে আসে প্রচুর পরিমাণ পলি। বাংলার এ সব নদ-নদী উচ্চতর ভূমি হতে প্রচুর পলি বহন করে এনে বাংলার ব-দ্বীপের নিম্নভূমি গড়ে তুলেছে। পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব বাংলার কিছু কিছু অংশ বাদে ভূতত্ত্বের দিক থেকে বাংলার প্রায় সবটাই নতুন পলিপড়া মাটি বা নবসৃষ্ট ভূমি। এই নতুন ভূমির উপর দিয়ে বাংলার বিভিন্ন নদ-নদী কতবার যে খাত বদলেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই, আবার

অনেক পুরনো নদী যেমন মরে গেছে, তেমনি অনেক নতুন নদীরও জন্ম হয়েছে। বাংলা গোটা পূর্ব ভারতের নদীসমূহের সমতল। তাই বাংলার এই নদীগুলোকে গোটা পূর্ব ভারতের বোঝা বইতে হয়। উত্তর ভারতের প্রধান দুটি নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বিশাল জলরাশির পলিপ্রবাহ এবং পূর্ব যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও আসামের বৃষ্টির জলধারা সাগরে নিয়ে যাওয়ার যে দায়িত্ব বাংলার কোমল নরম ও কমনীয় মাটিকে বহন করতে হয় বাংলার মাটি সব জায়গায় তার উপযুক্ত নয়।

এভাবে নদ-নদীর ভাঙা গড়ার খেলায় বদলে যায় নদীর খাত। এক সময়ের প্রসিদ্ধ নগর হয় পরিত্যক্ত, গড়ে ওঠে নতুন নগর। নদীপথের পরিবর্তনের জন্য কত জনবহুল জনপদ আর বন্দর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বাংলার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলার নদ-নদীর প্রবাহ গত একশ বছরেও যা বদলেছে, তা সত্যিই ব্যাপক। এভাবে ভাঙা গড়াকে বুকে নিয়ে জোয়ার-ভাটার দেশ বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। নদ-নদীর সাথে বাঙালির নাদীর টান অবিচ্ছেদ্য। বাঙালি নদীপথে বাণিজ্যের পসরা ভাসিয়ে বিদেশে যাত্রা করে। নদীর পানিতে সঞ্চিত মাটির বুকে ফসল উৎপাদন করে। এই নদ-নদীই বাংলাদেশকে সুজলা সুফলা করেছে। তার দুই তীরে মানুষের বসতি কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প, সাহিত্য, দর্শনকর্ম সবকিছুরই বিকাশ ঘটেছে। তাই বাংলার মানুষ ভালোবেসে আদর করে নদ-নদীর নাম রেখেছে ইছামতি, ময়ূরাক্ষী, কপোতাক্ষ, চূর্ণী, রূপনারায়ণ, মহানন্দা, দ্বারাকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মধুমতী, কৌশিকী, দামোদর, অজয়, করতোয়া, সুরমা, লৌহিত্য ইত্যাদি।

আর্দ্র ভূমিরূপীয় পরিবেশ

যেসব প্রাকৃতিক শক্তি ভূমিরূপ গঠনের ক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে নদী এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে মেরু অঞ্চল ব্যতীত ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় সকল অঞ্চলেই নদীর কার্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত পার্বত্য অঞ্চল অথবা উচ্চ মালভূমি থেকে সৃষ্ট ঝরণা প্রসবণ হিমবাহ বা তুষার গলা পানি নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট খাত পথে সমুদ্রে বা হ্রদে পতিত হয়। এই জলধারাকে বলে নদী। পাহাড়, পর্বত, হ্রদ, হিমবাহ প্রভৃতির জলধারা একত্রে মিলিত হয়ে একটি নদীর সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে যেটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয় তাকে নদীর উৎস বলা হয়। তবে নদী সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে বৃষ্টিপাত বা তুষার গলা পানি ভূমির ঢালকে অনুসরণ করে প্রবাহিত হলে ভূ-অপেক্ষাকৃত নিচু অংশে একত্রিত হয়ে অসংখ্য অনুখাতের সৃষ্টি করে। এই সকল অনুখাতের আকৃতি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বৃহত্তম খাত এর সৃষ্টি হয়। পানি পরবর্তী সময়ে এই সকল খাতগুলি একত্রিত হয়ে বড় আকারের খাতে পরিণত হয়ে তখন তাকে নদী খাত বলা হয়।

বৃষ্টিপাতের পানি যখন ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে কোনো নদী বা কোনো পানি ভূগর্ভস্থ ধারার মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয় তখন তাকে পানি নিকাশ বলা হয়। ভূগর্ভস্থ পানি যখন কোনো নদীর মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয় তখন তাকেও পানি নিস্কাশনের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। ভূগোল শাস্ত্র মতে কোনো জলধারা যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ভূমির ঢাল বরাবর একটি খাতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোনো বড় জলাশয় বা সাগরে পড়ে তখন সেই পানিস্রোতকে নদী বলে। মেরি মরিসাওয়া (Mary Morisawa) নদীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন æA stream may be defined as a channelised flow of water." অর্থাৎ শ্রীমতী মারিসাওয়ার মতে খাতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জলধারাকে নদী বলে।

পানি বিজ্ঞানী Jackie Smith বলেন, নদী হলো æA large stream of fresh water flowing downhill within a channel to enter another river, or a lake or sea" অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট খাতের মধ্য দিয়ে নিম্নঢালের দিকে প্রবাহিত এবং সমুদ্র, হ্রদ অথবা অন্য কোনো নদীতে পতিত সুপিও পানির বৃহৎ জলধারাকে নদী বলে। মরু অঞ্চলের নদীর খাতগুলো বছরের বেশির ভাগ সময়ে শুকনো থাকে। বছরে অল্প কিছুদিন এদের মধ্যে দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে দেখা যায় এরূপ স্বল্পকালীন জলধারা আরব দেশে ওয়াদি (Wadi) যুক্তরাষ্ট্রে অ্যারোয়া (Arroya) ভারতে নালা (Nullah) নামে পরিচিত।

নদীর উৎপত্তি

নদী যেখানে সুনির্দিষ্ট প্রবাহরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে সে স্থানটিকে নদীর উৎস বলা হয়। উৎসের উজানে সাধারণত অনেকগুলো ছোট ছোট সাময়িক পানিধারা ক্রমশ মিলিত হয়ে সুস্পষ্ট নদীর রূপ নেয়। তাই নদীর উৎস বলে কোনো বিশেষ স্থানকে চিহ্নিত না করে নদীর উৎসাঞ্চলরূপে একটি বিশেষ অঞ্চলকে বুঝায়। পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টির পানি ও বরফগলা পানি পাওয়া যায় বলে পৃথিবীর অধিকাংশ নদীই পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। হিমালয় পর্বতে বৃষ্টি, বরফগলা পানি ও প্রসবনের পানি মিলিত হয়ে গঙ্গা বা পদ্মা নদীর সৃষ্টি হয়েছে। নদীর উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও

ঢালু জায়গা-প্রতিটি নদী একটি খাতে প্রবাহিত হয়ে এবং এ প্রবাহ নিম্নোক্ত নিয়ম বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন– নদীর প্রস্থ ,গভীরতা, ঢাল, বেগ ও পানির ধারণকৃত অংশের সীমানা দ্বারা প্রভাবিত।

১. প্রস্থ : নদীখাতের দুই তীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব। এটি মিটারে প্রকাশ করা হয়।

২. গভীরতা : একটি নদীখাতের তলদেশ থেকে খাড়াভাবে পানির ওপর পর্যন্ত দূরত্ব, যা মিটারে প্রকাশ করা হয়।

৩. ঢাল : অনুভূমিক ও নদীতলের কৌণিক অবস্থান।

৪. বেগ : নদীখাতে যে গতিতে পানি প্রবাহিত হয় তাকে বেগ বলে। নদীর বেগ উপরিভাগে সবচেয়ে বেশি এবং দুই তীর ও তল বরাবর ঘর্ষণের কারণে কম হয়।

৫. পানির ধারণকৃত অংশের সীমানা : নদীখাত এবং পানির সংযোগরেখার দৈর্ঘ্য।

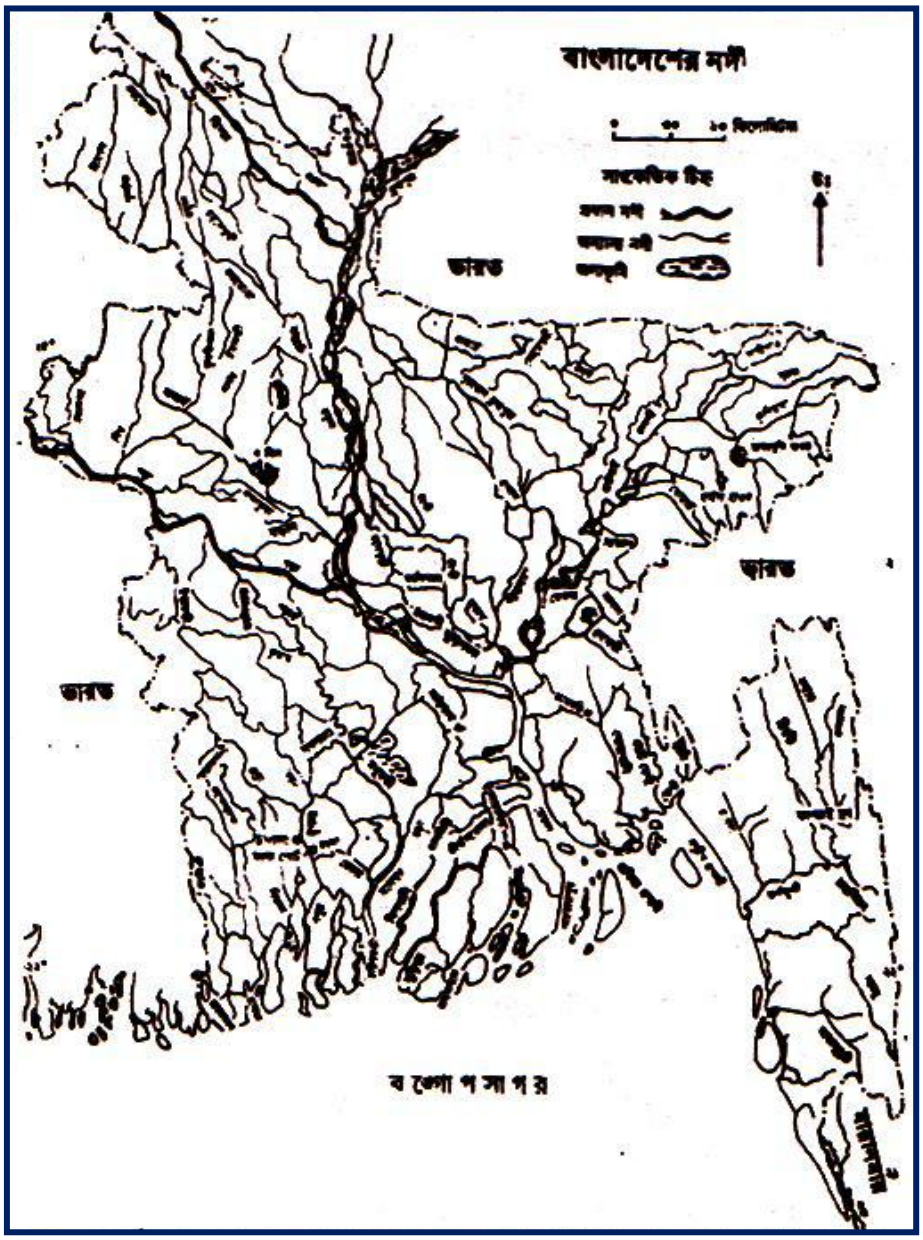

নদীর শ্রেণিবিভাগ

ভূমিভাগের প্রারম্ভিক ঢাল নদী অববাহিকা অঞ্চলের শিলার প্রকৃতি, ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস, নদী উপত্যকা অঞ্চলে ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অবস্থার ওপর নির্ভর করে নদীসমূহকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে ।

১। **ক্ষয়চক্রের পর্যায় অনুসারে উপত্যকার বিভাজন :** ক্ষয়চক্রের পর্যায় অনুসারে উপত্যকাসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

ক) নবীন উপত্যকা : নবীন নদী উপত্যকার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

- যৌবনবাবস্থায় (প্রাথমিক পর্যায়ে) ভূমির প্রারম্ভিক ঢাল অনুযায়ী কয়েকটি প্রধান অনুগামী নদী ও অল্প সংখ্যক বড় উপনদী থাকে।
- উপত্যকাগুলির আড়াআড়ি পার্শ্বচিত্র 'V' আকৃতির হয়। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা অনুযায়ী উপত্যকাগুলি অগভীর বা গভীর হয়ে থাকে।
- সাধারণভাবে প্রধান নদীর উপত্যকা ছাড়া অন্যত্র প্লাবনভূমি খুব একটা গড়ে ওঠে না।
- দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বা দোয়ার যথেষ্ট বিস্তৃত হতে পারে (Interstream tracts may be extensive)।
- নদীর গতিপথ যেখানে শক্ত শিলাকে অতিক্রম করে, সেখানে জলপ্রপাত বা খরস্রোত থাকতে পারে।
- পানি বিভাজিকাগুলি প্রশস্থ হবে ও তাদের সীমা সুনির্দিষ্ট করা যায় না (Stream divides will be broad and poorly defined Thornbury)।

খ) পরিণত নদীর উপত্যকা :

এই উপাত্যকার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-

- এই উপত্যকাগুলো বিস্তৃত হয়েছে তাই অঞ্চলটিতে এখন সুসংহত পানি নিষ্কাশন ধরন গড়ে উঠেছে।
- যৌবনাবস্থায় যে হ্রদ বা জলপ্রপাত ছিল, তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।
- নদী বিভাজিকাগুলো সুস্পষ্ট ও শৈলশিরার মতো অবস্থান করে।
- নদীর মধ্যবর্তী উচ্চভূমি কম চওড়া হয়।
- নদী উপত্যকার বেশ কিছু অংশজুড়ে থাকে প্লাবন সমভূমি।
- নদীতে বাঁকে আধিক্য লক্ষ করা যায়, কিন্তু নবীন উপত্যকার তুলনায় বাঁকগুলো তাদের অবস্থান পাল্টাতে পারে।

গ) প্রবীণ নদী উপত্যকার বৈশিষ্ট্য : এই নদী উপত্যকার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- পরিণত অবস্থার তুলনায় প্রবীন অবস্থায় উপনদীর সংখ্যা কম হয়, কিন্তু নবীন উপত্যকার তুলনায় অনেক বেশি হয়। (æTributaries to trunk streams are usually fewer in number than in maturity but more numerous than in youth"-Thornbury)
- উপত্যকাগুলি আড়াআড়িভাবে ও অনুদৈর্ঘ্য খুব প্রশস্থ ও মৃদু ঢালবিশিষ্ট হয়ে থাকে। (æValleys are extremely broad and gently sloping both laterally and longitudinally"-Thornbuty)
- যথেষ্ট প্রশস্থ প্লাবনভূমির নদীগুলো খুব আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হয়।
- দোয়াব অঞ্চলের উচ্চতা কমে যায়। পানি বিভাজিকাগুলি পরিণত উপত্যকার মত তীক্ষ্ণ থাকে না।
- বন্যাগঠিত সমভূমি অঞ্চলে হ্রদ, জলাভূমি থাকতে পারে।
- নদীর কার্যের চেয়ে পুঞ্জিত ক্ষয় ও রাসায়নিক ক্ষয় প্রধান হয় (Mass wasting and chemical denudation are dominant over fluid processes)
- বেশিরভাগ অঞ্চল ক্ষয়সীমার কাছাকাছি উচ্চতায় অবস্থান করে।
- সমপ্রায়ভূমি গড়ে ওঠে।

২। **পতনস্থলের তারতম্যের বিচারে শ্রেণিবিভাগ :** পতনস্থলের তারতম্যের বিচারে পৃথিবীর যাবতীয় নদী দু'ভাগে বিভক্ত : যেমন ক) অন্তর্বাহিনী নদী এবং খ) বহির্বাহিনী নদী।

ক) অন্তর্বাহিনী নদী (Inland River) : যেসব নদী দেশের প্রান্তসীমা অতিক্রমে না করে অভ্যন্তরভাগেই সীমাবদ্ধ থাকে তাদের অন্তর্বাহিনী নদী বলে। এরা দেশের অভন্তরে অবস্থিত কোনো হ্রদ বা জলাশয়ে পতিত হয়। কাস্পিয়ান সাগরে পতিত ভোলগা, আরল সাগরে পতিত আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া, ভারতের সম্বর হ্রদে রূপনগর ও মেধা, কচ্ছের রনে পতিত লুনি ইত্যাদি অন্তর্বাহিনী নদীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

খ) বহির্বাহিনী নদী (Outland River) : যে সব নদী স্থলভাগের মধ্যে নয়, সমুদ্রের এসে পতিত হয়, তাদের বহির্বাহিনী নদী বলে। আমাজন, মিসিসিপি, সিন্ধু, নীল প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান নদী সবই বহির্বাহিনী।

৩। নদীগোষ্ঠী অনুসারে শ্রেণিবিভাগ : কোনো একটি মূল নদী এবং তার উপনদী, প্র-উপনদী, শাখানদী ইত্যাদি মিলিত হয়ে এক একটি নদী পরিবার গড়ে ওঠে একেই বলা হয় একটি নদীবিন্যাস বা নদী গোষ্ঠী। যেমন– আমাজন নদী গোষ্ঠী বা বিন্যাস, গঙ্গা নদী গোষ্ঠী বা বিন্যাস ইত্যাদি। নদীগোষ্ঠীতে কোনো নদী কি ভূমিকা গ্রহণ করে এবং কোনো নদীখাত দিয়ে কতটা পানি পরিবাহিত হয়, তার বিচারে পৃথিবীর যাবতীয় নদীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা ক) মূল নদী, খ) উপনদী, গ) শাখা নদী।

ক) মূলনদী (Principal River) : কোনো একটি নদী গোষ্ঠীর প্রধান নদীকে বলা হয় মূল নদী। এরা ভূপৃষ্ঠের সাধারণ ঢাল অনুসারে প্রবাহিত হয়ে শেষে সমুদ্র,হ্রদ বা জলাভূমিতে পতিত হয়। উপনদী, প্রা-উপনদীগুলো পানি পরিবহন করতে হয় বলে মূল নদীতে পানির পরিমাণ বেশি থাকে। একটি মূল নদীর অসংখ্য উপনদী, প্র-উপনদী, শাখানদী, প্র-শাখানদী থাকে। যেমন– আমাজন, নীল, গঙ্গা, বোলগা, ইয়াংসি কিয়াং ইত্যাদি।

খ) উপনদী (Tributary) : একটি সাধারণ ঢালের উপর দিয়ে মূল নদী প্রবাহিত হবার সময় বিভিন্ন দিক থেকে ছোট ছোট নদী এসে তার সাথে মিলিত হয়, এদেরকেই বলা হয় উপনদী। উপনদীগুলো মূল নদীর চেয়ে ছোট হয়ে থাকে। তাই এগুলোতে মূল নদীর তুলনায় পানির পরিমাণ কম থাকে। যমুনা, গণ্ডক, কোশী, কোনো প্রভৃতি হলো গঙ্গার এবং তিস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, ইত্যাদি হলো সিন্দুর উপনদী। আবার উপনদীর উপনদীকে বলা হয় মূল নদীর প্র-উপনদী। যেমন– যমুনার উপনদী, চম্বল, বেতোয়া হলো গঙ্গানদীর প্র-উপনদী।

গ) শাখা নদী (Distrbutary) : মূল নদী যখন মোহানার কাছে এসে পৌঁছায় তখন পানির পরিমাণ বৃদ্ধির দরুন মাত্র একটি নদীখাত দিয়ে সমস্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে না। সে সময়ে পানি প্রবাহ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে (অর্থাৎ নতুন নতুন নদীখাত সৃষ্টি করে) সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, এদের বলে শাখানদী। ব-দ্বীপ অঞ্চলে শাখা নদীর সৃষ্টি হয়। ভাগীরথী ও পদ্মা গঙ্গার এবং রোসেটা ও ডেমিয়েটা নীল নদের শাখানদী।

৪। উৎপত্তিগত বিচারে নদীসমূহের শ্রেণিবিভাগ : নদীর ক্ষয়কার্য বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে। যেমন–

ক) ভূমির প্রারম্ভিক ঢাল (Initial Slope)
খ) শিলার ভূতাত্ত্বিক গঠন (Rock Structure), নদীর আপেক্ষিক বয়স (Relative age),
গ) নদীর মস্তকমুখী ক্ষয়কার্যের ক্ষমতা।

প্রধান শ্রেণিবিভাগ

ক) অনুগামী নদী (Consequent Stream) : ভূ-পুষ্ঠের প্রাথমিক ঢাল অনুযায়ী যে নদী প্রবাহিত হয় তাকে অনুগামী নদী বলে। প্রাথমিক ঢাল হলো সেই ঢাল যা ভূমিভাগের প্রথম অবস্থা থেকেই বিরাজমান আছে। সমুদ্র থেকে উত্থিত নতুন ভূমিভাগের ঢাল সেই অঞ্চলের ভূমিভাগের প্রারম্ভিক ঢাল। উদাহরণ হিসেবে গঙ্গা নাম করা যায়। প্রাথমিক ঢালের সাথে সমতা রেখে এখানকার নদীগুলো প্রধান নদীকে অনুসরণ করে প্রবাহিত হয়। তাই এদের নাম হয়েছে অনুগামী নদী। আবার ভূ-ভাগ সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে বলে এদের অপর নাম প্রাথমিক নদী।

খ) উপ-অনুগামী নদী (Sub Consecquent River) : যেসব ছোট ছোট নদী ভূমির প্রাথমিক ঢাল অনুসরণ করে প্রবাহিত হয়ে পরবর্তী নদীগুলোর সাথে মিশে যায় তাদের বলা হয় উপ-অনুগামী নদী। এরা ভূ-ভাগ সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে উৎপন্ন না হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে উৎপত্তি লাভ করে। দৈর্ঘ্য ছোট হলেও এদের গতিবেগ তীব্র হয়ে থাকে।

গ) **পরবর্তী নদী (Subsequent River) :** এই প্রকার নদীগুলি অনুগামী বা প্রাথমিক নদী পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাত্তিলাভ করে। তাই এদের নাম হয়েছে পরবর্তী নদী। যৌবন অবস্থায় শুরু থেকেই অনুগামী নদী গাঠনিক ঢালে ক্ষয় করতে থাকে ও ভবিষ্যতে নিম্নস্থ নরম শিলাস্তরকে উপত্যকার মধ্যে উন্মুক্ত করে। এই সময় উপত্যকাটি আরও চওড়া হয় ও অনুগামী নদীর পার্শ্বর্স্থনালি নরম শিলার ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পরবর্তী নদী সৃষ্টি করে।

ঘ) **পূনর্ভবা নদী (Resequent River) :** যেসব নদী অনুগামী নদীর মতোই ঢালের সাথে সমতা রেখে প্রবাহিত হয় তাদের পূর্নর্ভবা নদী বলে। ক্ষয়চক্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সব নদী উৎপত্তি হয় এবং অনুগামী নদীর তুলনায় পুনর্ভবা নদী নিচু স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়।

ঙ) **বিপরা নদী (Obsequent Stream) :** যেসব নদী খাড়া ঢালের (নতির) বিপরীতে এবং অনুগামী নদীর বিপরীতে প্রবাহিত হয়, তাকে বিপরা নদী বলে। অনুগামী নদীর বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় বলে এদের বিপরীত অনুগামী বলা হয়। ভূগুতটের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এদর ভুগুতট নদীও বলা হয়।

চ) **অসংগত নদী (Insequent Stream) :** যেসব নদীর অভ্যন্তরীণ গঠনের সাথে কোনো সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি থাকে না, সেই সব নদীকে অসংগত নদী বলে। নদীর মাথার দিকে ক্ষয়ের ফলে এই ধরনের নদীর সৃষ্টি হয়। প্রধান নদীর সাথে এই ধরনের নদী তির্যকভাবে মেলে এবং যে স্থানে এই নদী প্রধান নদীর সাথে মেলে তাকে নদী সঙ্গম বলা হয়।

ছ) **অধ্যারোপ নদী (Superimposed River) :** কোনো প্রাচীন ভঙ্গিল অঞ্চল বহুকাল সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকার পর আবার উত্থিত হলে তার উপর নতুন পাললিক শিলাস্তর অনুভূমিকভাগে সঞ্চিত হয়। এই নতুন সঞ্চিত শিলস্তরের উপর প্রারম্ভিক ঢাল অনুযায়ী একটি নদীগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। কালক্রমে এই নতুন শিলাস্তরটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আবার আগের ভঙ্গিল অঞ্চলটি উন্মুক্ত হলেও সেই শিলা গঠনকে উপেক্ষা করেই বর্তমান নদীগোষ্ঠী তার প্রবাহের দিক বজায় রাখে।

জ) **পূর্ববর্তী নদী (Antecedent Drainage) :** কোনো স্থানে নদী আগে থেকেই প্রবাহিত হতে পারে। পরবর্তীকালে ভূ-আলোড়নের ফলে সেই নদীর গতিপথে কোনো ভূমিভাগ উচু হয়ে গেলে নদী তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সেই ভূভাগ কেটে নিচে অবতরণ করবে। অন্যথায় নদীটির প্রবাহপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন– সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্রের, শতদ্রুম হিমালয় পর্বত গঠনের আগে থেকেই এই অঞ্চলে প্রবাহিত ছিল। হিমালয়ের উত্থানের সাথে সাথে এই নদীসমূহ তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু বেশ কিছু ছোট নদী হিমালয়ের উত্থানের সাথে তাল রাখতে না পেরে নিজ নিজ প্রবাহপথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। মানস সরোবর অঞ্চলের অসংখ্য হ্রদ এই ধরনের পরাজিত নদীর সাক্ষী।

ঝ) **নিমজ্জিত উপত্যকা (Drwned Valleys) :** ভূ-আলোড়নের ফলে ভূমিভাগের উত্থান বা পতন হতে পারে। ভূমিভাগের নিমজ্জনের ফলে সমুদ্র তল দেশের অভন্তরে প্রবেশ করে। ফলে নদীর নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। উদাহরণ : যুক্তরাষ্ট্রের (ডেলাওয়ার) Delaware, Potomac (পোটোম্যাক) ইত্যাদি এই ধরনের নদীর উদাহরণ।

নদীর কাজ : নদীর বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপণ এ তিন ধরনের কাজ করে থাকে। এছাড়া একটি নদীর গতিপথকে তিনটি নির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত করা যায়। যেমন–

ক) ধারণ অববাহিকা।
খ) নদীখাত।
গ) পলি সঞ্চিত ত্রিকোণাকার ভূখণ্ড।

ধারণ অববাহিকা নদী তার পানিধারা এবং প্রস্তর খণ্ডসমূহ সংগ্রহ করে থাকে। নদীখাত বা উপত্যকায় নদী তার ঊধর্ষ্ব অংশের দ্রব্যসমূহ বহন করে নদীখাতকে পরিষ্কার রাখে। ক্ষুদ্র পার্বত্য পানিধারা যে সব দ্রব্য প্রধান নদীতে বহন করতে পারে না তা নিম্ন প্রবাহে ক্রমশ সঞ্চিত হয়ে পলি সঞ্চিত ত্রিকোণাকার ভূখণ্ড গঠন করে। পার্বত্য পানিধারার এ তিনটি অংশ একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। নদীর গতিপথে ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপণ কাজের জন্য জনশক্তির প্রয়োজন। নদীর শক্তি নির্ভর করে তার ক) পানির পরিমাণ খ) পানির গতিবেগের ওপর। এ দুটিকে একত্রে নদীর প্রবাহ বলে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত সমগ্র গতিপথে নদী তার তিনপ্রকার কার্যের দ্বারা উপত্যকার পরিবর্তন ঘটায়। যেমন–

১. ক্ষয়সাধন (Erosioon)
২. পরিবহন (Transportation)
৩. সঞ্চয় বা অবক্ষেপণ (Deposition)

১। নদীর ক্ষয়সাধন (Erosioon of river) : নদীর ক্ষয়কাজ প্রধানত নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন-

পানিপ্রবাহ ক্ষয় (Hydraulic Action) : প্রবাহমান নদীর প্রবলস্রোত নদীখাত ও নদীর উভয় পাশে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করলে অপেক্ষাকৃত কোমল ও অসংলগ্ন পাথরখণ্ডগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙে যায় এবং নদীর স্রোতের সাথে বহু দূরে সরে যায়। বাংলাদেশের পদ্মা নদী এ প্রক্রিয়ায় প্রতিবছর এর তীরবর্তী স্থানে ব্যাপকভাবে ক্ষয় করে থাকে।

অবঘর্ষ (Corrasion) : নদীখাতের সাথে নদীবাহিত পাথরখণ্ডের সংঘর্ষের ফলে নদী ক্ষয়সাধিত হয়ে থাকে। নদী বাহিত পাথরখণ্ডগুলো নদী স্রোতে ঘুরতে ঘুরতে চলে এবং নদীখাতের সাথে সংঘর্ষের ফলে নদীখাতে ছোট ছোট গর্ত বা বর্তুলাকার গর্তের সৃষ্টি করে। এরূপ গর্তের সৃষ্টির ফলে নদীখাত আরো দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ প্রক্রিয়াকে অবঘর্ষ প্রক্রিয়া বলা হয়।

ঘর্ষণ ক্ষয় (Attrition) : নদীবাহিত পাথরখণ্ড একটি অপরটির সাথে ঘর্ষণের ফলে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরখণ্ডে এবং অবশেষে বালুকণায় পরিণত হয় যা নদী অতি সহজেই এগুলো বহন করতে পারে।

দ্রবণ (Solution or Corrosion) : নদীর পানিতে অনেক সময় পাথরখণ্ড দ্রবীভূত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চুনাপাথর অঞ্চলে এ প্রকার ক্ষয়কার্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। একে দ্রবণ প্রক্রিয়া বলা হয়।

বুদবুদজনিত ক্ষয় (Caviation Erosion) : বিক্ষিপ্ত নদীস্রোতের জটিল জলাবর্তে বুদবুদের সৃষ্টি হয়। এছাড়া নদী ছিদ্রপথে বা ফাটলের মধ্যে পানি প্রবেশ করলে বুদবুদের সৃষ্টি হয়। বুদবুদের ভেতর বাতাসের চাপ থাকে প্রচণ্ড; এর প্রভাবে নদীগর্ভের শিলাস্তর চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এরই নাম বুদবুদজনিত ক্ষয়।

নদীর ক্ষয়কার্য নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর- ।

ক) জলবায়ু : নদীর ক্ষয়কার্যের ওপর নদীর গতিবেগের প্রভাব অধিক, কিন্তু নদীর গতিবেগ আবার প্রবল বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। এজন্য জলবায়ু নদীর ক্ষয়কার্যকে পরিচালিত করে।

খ) নদীগর্ভের শিলার উপাদান : নদীগর্ভ কোমল শিলা দ্বারা গঠিত হলে নদীর ক্ষয়কার্য অধিক হয়। কিন্তু কঠিন শিলাংশে ক্ষয় খুবই কম হয়ে থাকে।

গ) বাহিত শিলার কঠিন্যতা : নদীবাহিত পর্দাথগুলো অধিক কঠিন হলে নদীর ক্ষয়কার্য বেশি হয়। কিন্তু পদার্থগুলো নরম হলে সহজেই গলে যায় এবং ক্ষয়কার্য খুবই কম হয়ে থাকে।

ঘ) নদীর পানির গলানো শক্তি : অনেক সময় নদীর পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকায় নদীর ক্ষয়কার্য বৃদ্ধি পায়।

ঙ) নদীগর্ভে ফাটল ও সন্ধির অবস্থান : নদীগর্ভে বহু ফাটল ও সন্ধি থাকলে সেগুলোর ভেতরে পানি প্রবেশ করে এবং শেষে নদীগর্ভের এক বিরাট অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

২। নদীর পরিবহন কাজ : নদীর মোট শক্তির শতকরা ৯৫ থেকে ৯৭ ভাগই ঘূর্ণি ও ঘর্ষণজনিত কারণে ব্যয় হয়ে যায়, বাকি অংশ শুধু পরিবহন কাজে ব্যয় হয়। যে কোনো বৃহৎ নদী পাথরখণ্ড, বালু, কাদা প্রভৃতি তার বোঝারূপে বহন করে থাকে। নদী তার এ বোঝা চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে থাকে। যেমন–

দ্রবণ প্রক্রিয়া : নদী তার গতিপথে চলার সময় কোনো কোনো পাথরখণ্ডকে পানির সাথে দ্রবীভূত করে তা পানিস্রোতের সাথে বহন করে থাকে। চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে নদী এ দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারবহন করে থাকে। নদীর দ্রবীভূত বোঝার পরিমাণে খুব পার্থক্য হয়। নদীতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এর ঘনত্ব হ্রাস পায়।

ভাসমান প্রক্রিয়া : ভাসমান বোঝা বেশিরভাগ মোট বাহিত পদার্থের প্রধান অংশ। নদীর ঘোলাপানি থেকে সহজেই ভাসমান বোঝার ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ভাসমান বোঝার প্রধান অংশ মূলত বালি, পলি ও কাদা আকৃতির পদার্থে গঠিত। অনেক সময় ক্ষুদ্রাকার পাথরখণ্ড নদীর স্রোতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ভেসে যায়, একে ভাসমান বোঝা বলে।

লম্ফন প্রক্রিয়া : তুলনামূলকভাবে বৃহদাকার পাথরখণ্ডগুলো স্রোতের বেগে নদীর তলদেশে ঠেকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে, একে লম্ফ প্রক্রিয়া বহন বলে। নদীর উচ্চপ্রবাহে এ প্রক্রিয়া বেশি দেখা যায়।

আকর্ষণ প্রক্রিয়া : নদীর বোঝার বড় আকৃতির পদার্থ বোল্ডার থাকতে পারে যা ভাসমান অবস্থায় রাখা সম্ভব হয় না। এ ধরণের ভারী ও বড় পর্দাথসমূহ নদীর তলদেশীয় ভার নদীবাহিত বিভিন্ন দ্রব্যসমূহ নদীর তলদেশ দিয়ে স্রোতের টানে বাহিত হয় বলে এক নদীগর্ভ বোঝা বা টান বা আকর্ষণ ভার বলা হয়। এই টান বা আকর্ষণের দ্বারা নদী বহন করে থাকে।

নদীর বহন করার ক্ষমতা নিম্নলিখিত কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। যথা :

১) নদীতে পানি কমে গেলে;
২) নদীঢালের পবির্তন হলে;
৩) নদীর শক্তির তুলনায় অধিক পরিমাণ পাথরখণ্ড নদীতে আসলে;
৪) নদী কোনো হ্রদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে;

এরূপ অবস্থায় নদীর তলদেশে কিছু কিছু পাথরখণ্ড জমা হতে থাকে। বৃহদাকার পাথরখণ্ডগুলো নদীর উচ্চপ্রবাহে এবং ক্ষুদ্রাকার পাথরখণ্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি নদীর নিম্নপ্রবাহে এবং মোহনার কাছে জমা হয়। একে নদীর অবক্ষেপণ বলে।

৩। নদীর সঞ্চয় কাজ/অবক্ষেপণ : নদীর বোঝা পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এই পরিবহন কাজ চালাতে থাকে। নদীর শক্তি নিঃশেষ হলে এর বোঝা সঞ্চিত হয়। নদীর এ শক্তি বিভিন্ন কারণে নিঃশেষ হতে পারে। যেমন-

১. নদীর ঢাল হ্রাস পেলে
২. নদীর খাল প্রশস্থ হলে
৩. নদীর খাত সর্পিল হলে
৪. নদীর পানি হ্রাস পেলে

নদীর পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে প্রথমে বড় পাথর এবং নুড়ি পাথর এবং পদার্থসমূহ সঞ্চিত হয় এবং পরে মিহি পলি ও কর্দম জমা হয়। নদীর এ পলি জমানোর কাজ খাতের যে কোনো অংশে ঘটতে পারে। তবে নদীখাতের কোনো অংশের সঞ্চিত পলি দীর্ঘদিন এক জায়গায় থাকে না। পূর্বেও সঞ্চিত পদার্থসমূহ পুনরায় ক্ষয়িত হয়ে তা আবার নিম্নঢালে জমা হয়। এভাবে পলি উজান থেকে ভাটির দিকে ক্রমাগত স্থানান্তরিত হয়। বন্যাকালীন নদীর পাড় উপচে বিপুল পরিমাণ পানি নদীর উভয় তীর থেকে পশ্চাৎদিকে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। এ সময় বন্যার পানির সঙ্গে বয়ে আসা ভারি পলিসমূহ নদী তীরের কাছাকাছি সঞ্চিত হয় এবং মাঝারি ও সূক্ষ্ম পলিসমূহ তীর থেকে দূরে সঞ্চিত হয়। এভাবে পলি সঞ্চয়নের মাধ্যমে তীর থেকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত প্লাবণ ভূমি গড়ে ওঠে। এভাবে প্রাচীন বাংলার নদ নদীসমূহের খাত বা গতিপ্রবাহ পরিবর্তনের ফলে অনেক জনবহুল জনপদ জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে সমৃদ্ধ নগরী হয়েছে পরিত্যক্ত। বন্দর নদীগর্ভের হয়ে গিয়েছে বিলীন, রাজধানী ও রাজ্যপাট জনবসতিহীন বিরাম অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। আবার নদীর নতুন গতিপ্রবাহের দরুন এককূল ভেঙে আর এক কূল গড়ে উঠেছে। তীরে তীরে আবার নতুন শহর, নগর, বন্দর, জনপদ এবং রাজ্যপাটের ও পত্তন হয়েছে আর এভাবেই প্রাচীন বাংলার নদ-নদীগুলো বহু পুরনো অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছে। ফলে কিছু পরিমাণে ভৌগোলিক পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই নদী আখ্যায়িত হয়েছে কীর্তিনাশা নামে।

বাংলার নদ নদী পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো এই নদ নদীগুলো ছিল মাছের উৎস, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি সহায়ক জল নিঃসারক এবং সহজ ও সস্তা জলপথ। তাই জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছিলেন। বাংলার নদ নদী কমপক্ষে ৩০,০০০ মাঝির অন্নের সংস্থান করেছিল।

সুতারং বলা যায়, চর বা বিল যাই হউক না কেন, এ সবকিছুই নদ-নদীর খাত বদলের ফলে তৈরি হয়ে থাকে। মোটকথা নদ নদীই আমাদের ভৌগোলিক পরিবেশকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। বাংলার কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে নদ নদী, এদের বিপুল জলরাশি, অসংখ্য স্রোতধারা, উপনদী, শাখানদী, খাল, বিল, নৌকা, মৎস্য সম্পদ। নদী বাংলাকে প্রাকৃতিক শোভায় সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। বর্ষাকালে যখন নদী দু'কূল ছাপিয়ে প্লাবিত হয় তখন সবুজ বৃক্ষলতা শোভিত পল্লীঅঞ্চল ও গ্রামগুলো যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্যামল দ্বীপপুঞ্জ সমন্বিত এক বিস্তীর্ণ সাগর এর রূপ ধারণ করে। নদীগুলো বাংলার সংস্কৃতি গঠন করেছে। ভাটিয়ালি সুর ও সারি গঠন বাংলার নদ নদীরই দান। বাংলা নদ নদী পরিবেষ্টিত হওয়ায়, নৌকা ছিল যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। আর সে কারণেই বাঙালিরা নৌকা নির্মাণ ও পরিচালনায় ও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আবুল ফজল বাঙালিদের দক্ষতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন বাঙালিরা বিভিন্ন প্রকারের নৌকা যুদ্ধের কাজে এবং পরিবহনের জন্য ব্যবহার করে। দুর্গ আক্রমণের পক্ষে সুবিধা হয়। আর এ কারণে মুসলিম শাসনামালে নৌযুদ্ধই বেশি সুবিধাজনক ছিল। সে সময় নৌবহন ও নৌবাহিনীর উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হতো।

পরিশেষে বলা যায়, নদ নদীকে ঘিরেই বঙ্গবাসীর জীবন রচিত হয়েছে। এই নদীগুলোই বাংলার জনগণের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছ। নদী কিভাবে পূর্ববাংলার জনগণের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে তার চিত্র পাওয়া যায়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি নামক উপন্যাস দু'টিতে এমনকি অনেক কবিতায়ও বাংলা নদ নদীর চিত্র ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে ভূমি, নদ-নদী, বনভূমি, মৎস উপকূল, সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ অন্যতম। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ সব প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্যে নিরাপত্তা বিধান এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করা সম্ভব। প্রাকৃতিক সম্পদই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ ত্বরান্বিত করছে। এদেশের মানুষরা বিভিন্ন প্রয়োজনে এ সব প্রাকৃতিক সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার করে আসছে।

বাংলাদেশের মাটি আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। অত্যন্ত উর্বর এই মাটিতে ফসল ফলাতে বেশি পুঁজির প্রয়োজন পড়ে না। মাটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আমাদের কৃষিজ ফসল, ফুল, বনজ সম্পদের প্রসার ঘটাছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে তিনগুণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পেরেছে। উন্নত প্রযুক্তি, বীজ, চাষাবাদের নিয়ম কানুন মেনে বাংলাদেশ এই মাটিতে আরও বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারবে। বিভিন্ন দেশি বিদেশি ফল ফলিয়ে মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ সম্ভব, শাক সবজির দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি বাড়িঘর, কলকারখানা, পুল, রাস্তাঘাট, শহর-উপশহর নির্মাণে বাংলাদেশের উর্বর ভূমির ব্যাপক চাহিদা বেড়ে গেছে। এর জন্য পরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে ভূমির ব্যবহার আরও বেশি পরিকল্পিতভাবে করতে হবে। আমাদের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে পানির গুরুত্বও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নদ নদী, খাল বিল, হাওড় বাঁওড়, পুকুর ইত্যাদির পানির উপর কৃষি ও শিল্পঅর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যোগাযোগ ব্যবস্থাও পানির মতো প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। দেশের খনিজ, বনজ, সৌরসহ সকলেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এদেশের খনিজ, বনজ, সৌরসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে। দেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগই আসে এ সব সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে। দেশে যেসব শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছে বা উঠছে তার পিছনে রয়েছে দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার। এর ফলে মানুষজন কর্মসংস্থানের সুযোগ পচ্ছে, দেশীয় চাহিদার পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে, বিদেশে রপ্তানিজাত দ্রব্যসামগ্রীও এ সব সম্পদকে ব্যবহার করেই তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন নতুন উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সেই সব উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে। কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা ও যোগঠন বাড়ছে, পণ্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৈরিকৃত পণ্য দিয়ে দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে এবং এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। মানুষ খাদ্যশস্য উৎপাদন, বনজ সম্পদের ব্যবহার, প্রাকৃতিক অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারে আরও বেশি আগ্রহী ও সচেতন হচ্ছে। এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের নানামুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন আনছে এবং মানুষ উন্নত জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। যেমন– মাটি, পানি, বনভূমি, সৌরতাপ, মৎস, খনিজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত, মিয়ানমার ও নেপালের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় একই রকম। নিম্নে প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ দেওয়া হলো।

কৃষিজ সম্পদ : দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এবং নেপাল বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কৃষি প্রধান। এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি, নদ-নদী, ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কৃষকগণ এখানকার কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন করে থাকে। এই কৃষি উৎপাদনে একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রার তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের দরকার হয়। যার কারণে অঞ্চলভেদে কৃষি উৎপাদনে তারতম্য ঘটে। অত্যন্তশীতল জলবায়ুর কারণে কিংবা বৃষ্টিপাতের অভাবের কারণে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে শস্য উৎপাদন ব্যঘাত ঘটে। নেপালে হিমালয়ের পাদদেশে শস্য উৎপাদন সীমিত আকারে হয়, অথবা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে নদী বিধৌত উর্বর অঞ্চল ধান, গমসহ কৃষিজ পণ্য বছরে কয়েকবার উৎপাদন করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে ধান, আলু ও পাটের উৎপাদন ব্যাপক হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এবং বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ে চা উৎপাদিত হয়। গম, ভুট্টা, সরিষা, ইত্যাদির ফলনও বেশ ভালো হয়। এই অঞ্চলে কৃষি পণ্য উৎপাদনের পিছনে মাটির গুণাগুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারত ও মিয়ানমারে তুলা, চা, ডাল, মরিচ ইত্যাদি অধিক পরিমানে উৎপাদিত হয়।

বনজ সম্পদ

জলবায়ুগত অবস্থার সঙ্গে বনজ সম্পদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত, মিয়ানমার ও নেপালের মধ্যে জলবায়ুগত তারতম্য রয়েছে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে সারাবছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে সেখানে নিবিড় ও বড় বড় অরণ্য বেড়ে উঠেছে। যেমন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্রগ্রাম, ভারতের পূর্বাঞ্চল ও মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলে চির হরিৎ

অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ খুবই কম, তাই এদেশের বনজ সম্পদও অতি নগণ্য। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ বনভূমি প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৯০৯৩.৪৮ বর্গ কিলোমিটার, অর্থাৎ দেশের আয়তনের প্রায় শতকরা ১২.৯৩ ভাগ। বনের গুরুত্ব কেবল বনরাজির অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই নয় বরং বনজ সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান চাহিদাও নিহিত। কাঠ পূর্বে জ্বালানি হিসেবে এবং ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের ফলে কাঠের ব্যবহার দ্রুত প্রসার লাভ করছে। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির সময়েও ঘরবাড়ির সাজ সরঞ্জাম, কৃষি যন্তপাতি, গরুর গাড়ির চাকা, নৌকা, রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি, বাস, ট্রাক, লঞ্চ, স্টীমার প্রভৃতি তৈরির কাজে ব্যাপকভাবে কাঠ ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়াও বনজ সম্পদ এখন বেশ কয়েকটি কাষ্ঠভিত্তিক শিল্প ও কুটির শিল্পের কাঁচামাল যোগায় এবং এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের সমগ্র বনভূমিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১। সংরক্ষিত বন : সুন্দরবন, চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম ও সিলেটের অধিকাংশ বনাঞ্চল।

২। আশ্রিত বন : চট্রগ্রাম ও সিলেটের কিছু কিছু বন। এ বনগুলো জেলা প্রশাসকের কর্তৃত্বাধীন, যদিও বনের আয় বন বিভাগের খাতেই জমা হয়।

৩। দায় প্রদত্ত বন : ঢাকার ভাওয়াল ও টাঙ্গাইলের আটিয়ার বন। রংপুর ও দিনাজপুরের বন এই শ্রেণিভুক্ত। এ বনগুলোর মালিক ছিল উক্ত অঞ্চলের জমিদারগণ। তাদেরই অনুরোধে আটিয়ার বন ১৯২৫ সালে এবং ভাওয়ালের বন ১৯৩৪ সালে তাদের ব্যবস্থাপনায় চালানো হয়। বর্তমানে এগুলো সংরক্ষিত শ্রেণীর।

৪। অশ্রেনীভুক্ত বন : দেশের বিচ্ছিন্ন বনশ্রেণিগুলো অশ্রেণিভুক্ত বনের অন্তর্গত। মোট ২৩,৫২০ বর্গকিলোমিটার বনভূমির মধ্যে ১২,৮৩০ বর্গকিলোমটিার সরকারি ব্যবস্থাধীন। দেশের ১৪টি জেলায় সরকারি ব্যবস্থাধীন বনভূমি রয়েছে। আর সরকারি ব্যবস্থার বাইরে সমগ্র দেশব্যপী ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বনের আয়তন ১০,৬৯০ বর্গ কিলোমিটার।

এ দেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বনজসম্পদ বৃদ্ধি ও বিস্তরণের অনুকূল অবস্থান সৃষ্টি করেছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এখানকার বনভূমি বিস্তরণের ক্রান্তীয় জলবায়ুর প্রভাব বিদ্যমান। নদীমাতৃক এদেশের ওপর দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়ে একটা বিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। সীমিত উচ্চভূমি ব্যতীত সমগ্র দেশ এক বিস্তীর্ণ বৈচিত্র্যহীন সমভূমিক। উচ্চভূমির পরিমাণ সীমিত হলেও দেশের বেশিরভাগ বনভূমি এই উচ্চভূমিতেই সৃষ্টি হয়েছে। ছোট বড় পাহাড় ও চত্বর নিয়ে গঠিত এ সব উচ্চভূমি। পাহাড়ী অঞ্চলগুলো এদেশের দক্ষিণ পূর্ব ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এ অঞ্চলগুলোতে বৃষ্টিপাতের আধিক্য, উর্বর মৃত্তিকা এবং পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য ক্রান্তীয় চির হরিৎ ও পত্র পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ পূর্বঞ্চলের বনভূমিগুলো বার্মার বনঞ্চলগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপরদিকে দেশের মধ্যাঞ্চলের চত্বর ভূমিগুলোতে দেখা যায় শুধু পত্র-পতনশীল বৃক্ষ। আবার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জোয়ারভাটার নিম্ন সমভূমিতে সৃষ্টি হয়েছে গরান বন। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বনভূমিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য ।

২. ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি।

৩. গরান বা স্রোতজ বনভূমি (সুন্দরবন)।

১। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য : এ অরণ্যকে সব সময় সবুজ দেখায়, এ জন্য চির হরিৎ নাম দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের অরণ্যের জন্য বাৎসরিক ২০৩ সে.মি. ৮০ ইঞ্চি এর বেশি গড় বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। দেশের গভীর উপত্যকাগুলোতে যেখানে পানির কোনো অভাব নেই, সে সকল স্থানে ২৪-৩০ মিটার উঁচু বৃক্ষবিশিষ্ট এ অরণ্য দেখা যায়। এ অঞ্চলগুলো হচ্ছে চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম ও সিলেট। চাপালিশ, তেলসুর ও ময়না হচ্ছে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের উদাহরণ।

২। পত্র-পতনশীল অরণ্য : পরিমিত তাপ ও বৃষ্টিপাতের অভাবহেতু শীতকালে এ জাতীয় বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়, গ্রীষ্মকালে আবার নতুন পাতা গজায়। গাছগুলোর গড় উচ্চতা ১৫-২৪ মিটার। দেশের চত্বর ভূমিগুলোতে এ অরণ্য বেশী দেখা যায়। মধুপুরের শালবন এ জাতীয় অরণ্য। গর্জন, জারুল, গামারি, শিমুল ইত্যাদি পত্র-পতনশীল বৃক্ষের অরণ্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

৩। গরান অরণ্য : জোয়ারভাটা প্রভাবিত উপকূলের বিলুয়া মৃত্তিকাঞ্চল যেখানে পানি জমে থাকে, সে সকল স্থানে গরান অরণ্য সৃষ্টি হয়। দেশের খুলনা ও পটুয়াখালী জেলায় কিছু অংশ নিয়ে গঠিত সুন্দরবন এ শ্রেণির অরণ্য। সুন্দরী, গেওয়া, ধুন্দল প্রভৃতি গরান অরণ্যের বৃক্ষ। আবার অঞ্চল ভিত্তিতে বাংলাদেশের অরণ্যকে প্রধানত ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

১. চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চল
২. সিলেট অঞ্চল
৩. সুন্দরবন (খুলনা-পটুয়াখালী) অঞ্চল
৪. ঢাকা-টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ বা মধুপুরে গড় অঞ্চল

বনজ সম্পদের গুরুত্ব

বনজ সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রসারিত করেছে। এ দেশে বনজ সম্পদের অবদান মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ। নিচে বনজসম্পদের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

কৃষিক্ষেত্র : কৃষির উন্নয়নে বনজ সম্পদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বনভূমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে, বন্যা ও প্লাবন হতে ভূমিকে রক্ষা করে গাছের পাতা পচে ভূমির উর্বর শক্তি বৃদ্ধি পায়।

শিল্পক্ষেত্র : বাংলাদেশে শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে বনজ সম্পদ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, দিয়াশলাই, রেয়ন, প্লাইউড, ফাইবার বোর্ড, রবার এবং খেলার সরঞ্জাম তৈরির উপকরণ হিসেবে বনজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এসিড, স্পিরিট, আলকাতরা, প্যাকিং বক্স, বারুদ প্রভৃতি প্রস্তুত করতে বনভূমির গাছপালা প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য কুটির শিল্পের কাঁচামালের অধিকাংশই বনজ সম্পদের অন্তর্গত।

পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্র : পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বনজ সম্পদের ভূমিকা রয়েছে। বৈদুৎতিক লাইনের খুটি, রেল লাইনের স্লিপার, নৌকা, স্টীমার, লঞ্চ, ট্রাক ও গাড়ির বডি প্রভৃতি প্রস্তুত করতে বনভূমি হতে কাঠ সংগ্রহ করা হয়। ঘর-বাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ ও বসবাসের জন্য বিভিন্ন রকম ঘর বাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরি করতে বনজ সম্পদের প্রয়োজন হয়।

সরকারের আয়ের উৎস : সরকারের উল্লেযোগ্য আয়ের উৎস বনভূমি। বনজ সম্পদ বিক্রয় এবং বনজ সম্পদের ওপর কর ধার্য করে সরকার প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র : বন হতে সম্পদ যেমন কাঠ, মধু, মোম, ফলমূল, জীবজন্তুর চামড়া, শিং ইত্যাদি সংগ্রহ করে অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করে ফলে কর্মের সংস্থান হয়। তাই বনভূমি জীবকা নির্বাহের ওপর অত্যান্ত প্রভাব বিস্তার করে।

পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্র : বৈদেশিক পর্যটকগণ বনভূমির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন। ফলে প্রতি বছর বহু পর্যটক বনভূমি সৌন্দর্য উপভোগের জন্য বাংলাদেশে আগমন করেন। এতে সরকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেন এবং অপরদিকে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ : বনভূমি বাতাসে আর্দ্রতা রক্ষা করে এবং বৃষ্টিপাত সংঘটনে সাহায্য করে। অন্যদিকে উপকূলবর্তী বনভূমি বিশেষত সুন্দরবন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের করালগ্রাস হতে বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ নিয়ন্ত্রণের ফলে একদিকে জীবন ও সম্পদ রক্ষা পায় অপরদিকে সরকারের অর্থের অপচয় রোধ করে।

প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বনভূমি হতে সংগ্রহ করা যায়। বনভূমি হতে কাঠ, ফলমূল, বাঁশ, বেত, মধু, মোম, জীবজন্তুর চামড়া শিং, ঘাসও ঔষধের কাঁচামাল প্রভৃতি বনভূমি হতে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক গুরুত্ব : বনভূমি আমাদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্ববহন করছে। সীমান্ত অঞ্চলে বনভূমির অস্তিত্ব থাকলে দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে সহজেই রক্ষা করা যায়।

খাদ্যের উপাদান হিসেবে : দেশের সুন্দরবনাঞ্চলে নদী থাকায় সেখান থেকে প্রচুর মৎস্য ধরা পড়ে। দেশের জনগণের প্রোটিন জাতীয় উপাদান পূরণে মৎস্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মৎস সম্পদ

আবহমান কাল থেকে মাছ বাংলাদেশের নিজস্ব মৌলিক এবং রূপালী সম্পদ হিসেবে পরিচিত।' মাছে-ভাতে বাঙালী' প্রবাদটি সম্ভবত আজও ব্যাপক ও যথার্থ অর্থে এ দেশে ব্যবহৃত হয়।খাদ্য তালিকায় তরিতরকারি যাই হোক না কেন ভাতের সাথে খানিকটা মাছ আমাদের আহার্য বস্তুকে উপাদেয় করে। বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ যান্ত্রিক এই বিশ্বে একটি ক্ষুদ্র দরিদ্রতম দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণই পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। পুষ্টি রক্ষায় প্রয়োজনীয় প্রাণিজ প্রোটিনের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি মাছ থেকে পাওয়া সম্ভব। এ কারণেই হয়ত ভাতের সাথে মাছ আমাদের প্রধান খাদ্যরূপে জাতীয় খাদ্যের একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। মাছ ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হতে আমিষ ও প্রোটিনের প্রয়োজন বা চাহিদা মেটানো এ দেশে কল্পনাই করা যায় না। নদীমাতৃক আমাদের এ বাংলাদেশে অসংখ্য নদী নালা ও খাল বিল, ৬ লাক্ষের বেশি পুকুর, দীঘি এবং পুকুর গুলোতে একর প্রতি অনায়াসে ৩০ থেকে ৩৫ মন মাছ আমরা চাষ করতে পারি। বর্ষাকালে দেশের অভ্যন্তরে পানি আরও বৃদ্ধি পেয়ে কৃষিভূমির শতকরা ৪৪ ভাগ পানিতে ডুবে যায়। এ বিস্তৃত জলাভূমি ছাড়াও বঙ্গোপসাগরের ৪৫০ মাইল (৭২০ কিলোমিটার) দীর্ঘ উপকূলের অভ্যন্তর ও বহিঃভাগে রয়েছে ১১৪০ বর্গমাইল বা ২৯১৮.৪০ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি সমুদ্রজল এলাকা। সামগ্রিকভাবে জলাভূমির এ বিশাল এলাকায় বাংলাদেশ সারাবছরই প্রচুর পরিমাণে মাছ জন্মে এবং বিপুল পরিমাণ মাছ জলাঞ্চল থেকে উৎপাদন করা হয়। ফলে দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য হিসেবে আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়েও প্রচুর পরিমাণ মাছ আমরা বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ পাই। জাতীয় অর্থনীতিতে মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মাছের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং এর ব্যাপক উৎপাদনে মনোযোগী হওয়া আমাদের আবশ্যক কর্তব্য। অন্যদিকে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি, দেহকে রক্ষা এবং দেহের পরিচালন ক্ষমতা ও কাজকর্ম করার প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান আমরা মাছ থেকে পেয়ে থাকি।

আমাদের দেশটিতে জমির পরিমাণ কম হলেও জলাশয়ের পরিমাণ কিন্তু কম নয়। আগে আমাদের দেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণের অনুপাত হিসেব করে খাদ্য উৎপাদন করা হতো। এখন জলাঞ্চল, বিল, ডোবার অনুপাত হিসেব করে প্রদান খাদ্য উৎপাদনের অংশ হিসেবে মৎস্য চাষ ও উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এটা জমির আয়ের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। মোটামুটি যত্ন নিলে আমরা আমাদের পুকুর, বিল, হাওর, ডোবা থেকে প্রচুর পরিমাণ মাছ পেতে পারি।

মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ ও এর সুষ্ঠুরক্ষণাবেক্ষণ শুধু আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার মধ্যেই সীমিত নয়, এর ব্যাপকতা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও আনয়নের সুনিশ্চিত নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন আমাদের খাদ্যের প্রাণিজ ও প্রোটিনের প্রাচুর্য ঘটবে, তেমনি উদ্বৃত্ত মাছ রপ্তানির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। আমাদের দেহ সুস্থ সবল হওয়ার সাথে সাথে দেশের জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধির স্বার্থেই আমাদের মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে অধিক সচেতন হওয়ার সময় এখনই। যে কোনো দেশের মৎস সম্পদের সঙ্গে সরাসরি ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত, নদ-নদীর পানি প্রবাহ, খাল, বিল, হাওড়, পুকুর ইত্যাদিতে পানি থাকায় মৎস্য সম্পদের সমৃদ্ধ দেশ বলে পরিচিত। এখানে ছোট বড় নানা প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে মাছের ভাণ্ডার রয়েছে। প্রতিবেশী মিয়ানমার, ভারতও নেপালেও প্রচুর মৎস সম্পদ রয়েছে।

মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্রসমূহ

লবণাক্ত ও মিঠা পানির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদকে দু'টি প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে ভাগ করা হয়েছে।

ক) অভ্যন্তরীণ মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র, এবং

খ) সামুদ্রিক মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র।

ক) অভ্যন্তরীণ মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র : এক্ষেত্রে মিঠা পানির মাছ চলাচল করে। বাংলাদেশের মোট মৎস্য সম্পদের শতকরা ৮৮ ভাগই অভ্যন্তরীণ মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র। যেমন পুকুর, বিল, ডোবা হাওড় এবং নদ-নদী থেকে মাছ ধার হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রটিকে আবার কতকগুলো ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-

- নদ-নদী, হাওড়-বাওড় ও বিল
- বদ্ধ জলাশয়, পুকুর, দীঘি
- জলমগ্ন ধান ক্ষেত
- কর্ণফুলী কাপ্তাই হ্রদ, এবং
- মোহনা বা ট্রানজিশন অঞ্চল

খ) সামুদ্রিক মৎস বিচরণ ক্ষেত্র : বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত পানিতে বিচরণকৃত এই মৎস সম্পদ মোট জাতীয় ব্যবহারের শতকরা ১২ ভাগ মাত্র। বিরাট এই সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রের একটা বড় অংশ আমরা ব্যবহার করতে পারছি না শুধুমাত্র ট্রলার এবং মৎস্য আহরণ যন্ত্রের অভাবে মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় মোট উৎপাদনের আরও বেশ কয়েক শতাংশ বৃদ্ধি সম্ভব। এই মৎস্য ক্ষেত্রের ৪৭৫টি মাছের প্রজাতির মধ্যে ১৩৩টিই আবিস্কৃত হয়, যার মধ্যে ৪২টি প্রজাতিকে বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে চিংড়ি মাছই রয়েছে ১৮ জাতের। বঙ্গোপসাগরে ৪টি মৎস্যক্ষেত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন–

১. বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র।
২. দক্ষিণ-পশ্চিম মৎস্য চারণ ক্ষেত্র।
৩. নিমগ্ন মহাগহক্ষর।
৪. নিমগ্ন মহাগহক্ষরের পূর্বদিক।

খনিজ সম্পদ

যে কোনো জাতির অর্থনৈতিক সুফল আজকাল খনিজ সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষ করে খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার অনেক আগে থেকেই অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে বিবিধ খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কোনো একটি মাথাপিছু ব্যবহার যে কোনো জাতির সমৃদ্ধি যাচাইয়ের একটি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে খনিজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গেলে এর সীমাহীন গুরুত্বের কথা বলে শেষ করা যাবে না। প্রাথমিকভাবে খনিজ সম্পদের আহরণ, উন্নয়ন, সর্বোপরি এর বাণিজ্যিক ব্যবহার ছিল অতি অল্প মাত্রায়। কালক্রমে শিল্পে বাণিজ্যের প্রসারের প্রেক্ষিতে খনিজ সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং খনিজ সম্পদের পদ্ধতিগত উন্নয়ন প্রাথমিকভাবে ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। ভূগর্ভে লুকায়িত খনিজ একটি অন্যতম প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ভাণ্ডার, মানব জাতির বৃহৎ কল্যাণ ও সার্বিক প্রগতির চাবিকাঠি। নৈসর্গিক নানা প্রক্রিয়ার ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ এমন অসংখ্য সুপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ভূ-অভন্তরে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। মাটি খুঁড়ে এর অনুসন্ধান ও উদ্ধারে মাধ্যমে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে আরও সম্মুখে। এই গুপ্ত সম্পদ সুচারুরূপে আহরণের মাধ্যমে যে কোনো জাতি তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি জেলাসমূহের মাটির নিচে গ্যাস, কয়লা, তেল, চুনাপাথরসহ নানা ধরনের মূল্যবান খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব সম্পদ আহরণ করে দেশের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের তলদেশেও গ্যাস আবিস্কৃত হয়েছে। সেখানে আরও অনেক ধরনের প্রাণিজ এবং খনিজ পদার্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত একটি বড় দেশ। সেখানে ভূতাত্ত্বিক অবস্থা বৈচিত্র্যময়। ফলে নানা খনিজ সম্পদে ভারত অনেক বেশি সমৃদ্ধ। মিয়ানমার খনিজ সম্পদে বেশ অগ্রসর অবস্থানে আছে। তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে নেপাল।

খনিজ প্রাপ্তির উৎস

খনিজ-উৎস

১. জৈবিক, ২. অজৈবিক

জৈবিক উৎস :

১. কয়লা, ২. চুনাপাথর, ৩. গ্যাস, ৪. তেল

অজৈবিক উৎস :

১. ধাতব, ২. অধাতব

ধাতব উৎস :

১. দস্তা, ২.স্বর্ণ, ৩. সীসা, ৪. রূপা, ৫. পারদ, ৬. তামা, ৭. তেজস্ক্রিয়, ৮.খনিজ

অধাতব উৎস :

১. সালফার, ২. ক্যালসিয়াম, ৩. সোডিয়াম, ৪. শ্বেতকর্দম, ৫.পটাসিয়াম

খনিজ পদার্থগুলো আবার কঠিন ও তরল অবস্থায় বিদ্যমান। দীর্ঘকাল প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে জৈবিক রূপান্তর কিংবা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই খনিজ পদার্থের সৃষ্টি। তাই প্রতিটি খনিজ পদার্থের স্তরেই রাসায়নিক সূত্র ও গুণাগুণ সম্পন্ন। ভূতাত্ত্বিক স্তর, ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থানই কোনো অঞ্চলের খনিজ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ও এর বাণিজ্যিক উত্তোলন নির্ভর করে। এই প্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ামকগুলোও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। খনিজ সম্পদ মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। খনিজ সম্পদের অপ্রাচুর্যতার দরুন শিল্পের উন্নতি হয়নি। এদেশের খনিজ সম্পদকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

১. শক্তি সম্পদ
২. অধাতব খনিজ
৩. ধাতব খনিজ

শক্তি সম্পদ

প্রধানত জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তাপ ও আলোক শক্তি উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩৬.৮২ ট্রিলিয়ন ঘন ফুটের অধিক গ্যাস সঞ্চিত আছে। এ পর্যন্ত ২০টি গ্যাস খনি আবিষ্কৃত হলেও ১১টি গ্যাস খনি হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস উত্তোলন করা হয়।

গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ : হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র, ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র, রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্র, কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র, তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র, বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র, হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বিয়ানী বাজার গ্যাসক্ষেত্র, সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র, কুতুবদিয়া গ্যাসক্ষেত্র, কামতা গ্যাসক্ষেত্র, ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র, বেলাবো গ্যাসক্ষেত্র, জালালবাদ গ্যাসক্ষেত্র, শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র।

কয়লা : শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। বাংলাদেশে যে কয়লা পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগ পীট জাতীয় কয়লা। তবে লিগনাইট ও বিটুমিন জাতীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণির কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশের কয়লা এখনও উত্তোলন শুরু হয়নি। কয়লা এদেশের বিভিন্ন শিল্পের কাচামাল ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা অত্যধিক।

কয়লা ক্ষেত্রসমূহ : সুনামগঞ্জ জেলা কয়লা ক্ষেত্র, জয়পুরহাট কয়লা ক্ষেত্র, বগুড়া জেলার কয়লা ক্ষেত্র, বড় পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্র, নওগাঁ ও নবাবগঞ্জ জেলার কয়লা ক্ষেত্র, এছাড়া কুষ্টিয়া জেলার কয়লাক্ষেত্র, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ, দিনাজপুর জেলার দিঘীপাড়ায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব কয়লাক্ষেত্র ছাড়াও খুলনা, গোপালগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার প্রভৃতি জেলায় পীট জাতীয় নিকৃষ্ট শ্রেণির কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল : শক্তি, আলোক ও তাপ উৎপাদনের জন্য খনিজ তেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খনিজ তেলকে পরিশোধিত করে গ্যাসোলিন, ডিজেল, কেরোসিন, তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস, খনিজ তারপিন, প্যারফিন প্রভৃতি পাওয়া যায়।

তেল ক্ষেত্রসমূহ : হরিপুর তেলক্ষত্র, বরমচাল তেল ক্ষেত্র।

অধাতব খনিজ

অধাতব খনিজ ব্যবহৃত হয় সিমেন্ট, গ্লাস, ইস্পাত, সাবান, কাগজ, গৃহ নির্মাণ, ব্লিচিং পাউডার, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ইত্যাদি তৈরিতে। এছাড়াও চীনামাটি বা শ্বেতমৃত্তিকা, সিলিকা বালি, কঠিন শিলা বা পাথর, নুড়িপাথর, পারমাণবিক খনিজ বালি, লবণ, গন্ধক ইত্যাদি অধাতব খনিজ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

ধাতব খনিজ

ধাতব খনিজ সাধারণত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মুদ্রা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধাতব খনিজের মধ্যে তামা, লোহা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বৈদ্যুতিক শক্তি : পানির বেগ, কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে যে শক্তি উৎপাদন হয় তাকে বৈদ্যুতিক শক্তি বলা হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি দু ধরনের (ক) পানি বিদ্যুৎ শক্তি ও (খ) তাপ বিদ্যুৎ শক্তি।

পানি বিদ্যুৎ শক্তি : যন্ত্রের সাহায্যে নদী ও পানি প্রপাতের পানির বেগ হতে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাকে পানি বিদ্যুৎ বলে। পানি বিদ্যুৎ দ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে পানি বিদ্যুৎ শক্তি বলে। নদী, পানি প্রপাতের সাহায্যে পানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। খরস্রোতা নদী বা পানি প্রপাতের পানি পাহাড়ি অঞ্চল হতে প্রবাহিত হয়ে সমভূমিতে প্রবেশ করার মুখে বাঁধ তৈরি করে পথ সংকোচন করা হয়। এই সংকোচন পথের শেষে টারবাইন ও ডাইনামো স্থাপন করা হয়। পানির আঘাতে টারবাইনের চাকা দ্রুত গতিতে ঘোরে এবং এর সাথে সংযুক্ত ডাইনামো দ্বারা পানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এ পদ্ধতিতে পানির বেগ কম বেশি করে বিদ্যুৎতের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এদেশের কয়েকটি নদীতে বাঁধ নিয়ে পানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। যেমন কর্ণফুলি পানি বিদুৎ প্রকল্প, ব্রহ্মপুত্রের পানি বিদ্যুৎ পরিকল্পনা, সাংগু নদী বিদ্যুৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি।

তাপ বিদ্যুৎ শক্তি : প্রকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও খনিজ তেল পুড়িয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে তাপ বিদ্যুৎ বলে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার হয়। যেমন– সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শাহজীবাজার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্রগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঠাকুরগাঁও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি।

সৌরশক্তি : নিরক্ষীয় নিম্ন অক্ষাংশ অঞ্চলে সূর্য বছরের প্রায় সব সময়ই লম্বাভাবে কিরণ দেয়। ফলে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অপরাপর দেশগুলো নিরক্ষীয় বা ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে সহজে প্রচুর সৌরশক্তি পেয়ে থাকে। ইউরোপ, আমেরিকা মহাদেশের বেশ কিছু দেশে সূর্য বছরে কয়েকমাস বাকাভাবে কিরণ দেয়, কখনো কখনো সূর্য প্রায় দেখাই যায় না। সে কারণে সেই সব দেশে জনগণকে বাড়িঘর বসবাসের জন্যে উপযোগী রাখতে প্রচুর জ্বালানি সম্পদ ব্যয় করতে হয়। আমাদের এই অঞ্চলের দেশগুলোকে তা করতে হয় না। আমরা প্রকৃতি থেকে সূর্যের যে আলো অনায়াসে লাভ করি তা অনেক মূল্যবান সৌর সম্পদ। এই সম্পদ আধুনিক যান্ত্রিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে পারি। আমাদের খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ নানা ক্ষেত্রেই সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে বাংলাদেশ আরও উন্নতি লাভ করতে পারে সেই সম্ভাবনা রয়েছে।

এক সময়ে আমাদের এদেশ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমানে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। আবার কতিপয় প্রাকৃতিক সম্পদ নতুনভাবে নতুন চেতনায় ব্যবহার করণ চলছে।

৩.৬ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশ একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বলা হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং যে মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের বীর জনগণ মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন ও বীর শহীদগণ প্রাণদান করেন সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। অতএব এই চারটি সংবিধানের মূলনীতি বা আদর্শ। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশের জনগণ যাতে স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে এবং মানব জাতির প্রগতিশীল আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি রেখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিশ্চিত করা সংবিধানের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ রেয়েছে যথা : আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ।

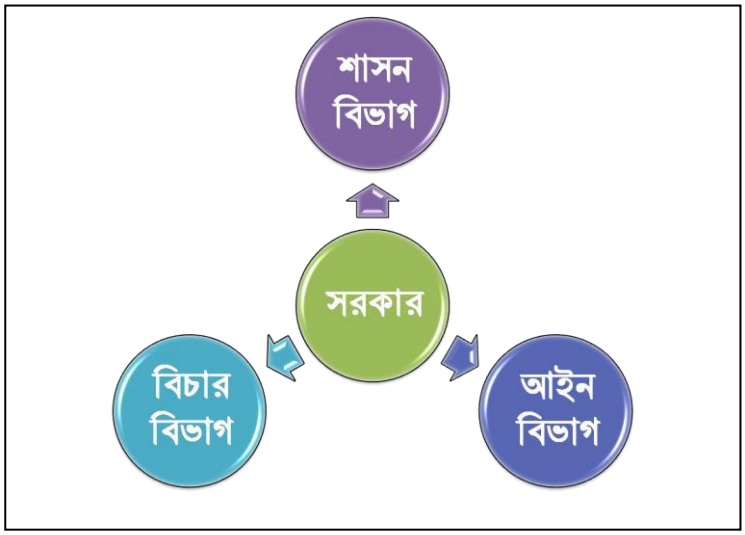

নিম্নে সরকারের তিনটি বিভাগের বিস্তারিত আলোচনা দেয়া হলো-

নির্বাহী/শাসন বিভাগ

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। শাসনব্যবস্থার পুরোভাগে ছিলেন রাষ্ট্রপতি তার নামে বাংলাদেশের শাসন পরিচালিত হতো। ব্রিটেনের রানী বা ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় তিনি ছিলেন একজন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। আসলে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদ। মন্ত্রিপরিষদ জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থেকে কার্যনির্বাহ করে থাকেন। ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনী আইন, ১৯৭৫ সালে ২০ আগস্ট, ৮ নভেম্বর ও ২৯ নভেম্বরে রাষ্ট্রপতির ঘোষণার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার ব্যপক পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত

সরকার। প্রজাতন্ত্র নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট প্রণীত ১৫ সেপ্টেম্বরের গণভোটে অনুমোদিত দ্বাদশ সংশোধন আইন অনুযায়ী দীর্ঘ ষোল বছর পরে বাংলাদেশে আবারো প্রবর্তিত হয়েছে সংসদীয় সরকার। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান বটে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী ও সরকার প্রধান। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি নামে অভিহিত। তিনি একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা দেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি সাধারণ ভোটারগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। ১৯৯১ সালে গৃহীত দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তিত হলে পুনরায় বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। এ বিধানের অধীনে জাতীয় সংসদ ১৯৯১ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে রাষ্ট্রপ্রতি নির্বাচন আইন পাস করে।

রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা : রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার জন্য যে কোনো ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে :

- বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে
- অন্যূন ৩৫ বছর বয়স্ক হবেন, এবং
- জাতীয়সংসদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে

রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ : রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি যদি তার পদ হতে আগেই অপসারিত না হন, তবে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পাচঁ বছর সে পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, তার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। মেয়াদ অবসানের পূর্বে তিনি স্পিকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন। কোনো ব্যক্তি, একাদিক্রমে হউক আর না হউক, দুই মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

রাষ্ট্রপতির মর্যাদা : রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান এবং তার স্থান অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে। রাষ্ট্রপতি সংবিধান ও আইনের দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন। তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি কোনো কাজ করলে বা না করলে সে জন্য তাকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি সরকারের বিরূদ্ধে কার্যধারা গ্রহণ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতির কার্যকালে তার বিরূদ্ধে কোনো আদালতে কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

সুতারং রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কতকগুলো বিশেষ অধিকার ও বিমুক্তি ভোগ করে থাকেন। তবে তিনি আলঙ্কারিক রাষ্ট্রপ্রধান। তার নামে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত প্রায় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আইনের দ্বারাও তাকে ক্ষমতা প্রধান ও তার ওপর কর্তব্য অর্পণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। শাসন সংক্রান্ত বা নির্বাহী ক্ষমতা, আইন সংক্রান্তক্ষমতা, অর্থ সংক্রান্তক্ষমতা, বিচার সংক্রান্তক্ষমতা ও বিবিধ ক্ষমতা। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

শাসন সংক্রান্ত বা নির্বাহী ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। প্রজাতন্ত্রর সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিভাবে সত্যায়িত হবে তা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করবেন। তিনি সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধি প্রণয়ন করবেন। যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবে রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রি, প্রতিমন্ত্রি ও উপমন্ত্রিগণ কে নিয়োগদান করবেন। তিনি বাংলাদেশের এটর্নী জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি ও সদস্য, নির্বাচন কমিশনার, রাষ্ট্রদূত, কন্সাল ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করে থাকেন। তিনি প্রতিরক্ষা বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়ক এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধান সাপেক্ষে প্রতিরক্ষা বিভাগসমূহের কমিশন মঞ্জুর ও বাহিনী প্রধানদের নিয়োগ করবেন।

আইন সংক্রান্তক্ষমতা : রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহবান ও স্থগিত করবেন এবং সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন। তিনি সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করতে পারবেন। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর এবং প্রত্যেক (ইংরেজি) বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় সংসদে ভাষণদান করবেন। সংসদ কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি বিলে সম্মতি জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে। তিনি ১৫দিনের মধ্যে হয় বিলটিতে সম্মতি দিবেন কিংবা অর্থ বিল ব্যতীত অন্য কোনো বিল পুনর্বিবেচনার জন্য তার বার্তাসহ ফেরত পাঠাবেন। যদি রাষ্ট্রপতি বিলটি ফেরত পাঠান তবে সংসদ তা পুর্নবিবেচনা করবে এবং মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিলটি পুনরায় (সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ছাড়া) গৃহীত হলে তা পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে। রাষ্ট্রপতির নিকট পুনরায় উপস্থাপনের ৭ দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতি দেবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত ৭ দিনের মেয়াদ শেষে রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য করা হবে। রাষ্ট্রপতি কোনো বিলে অনুরূপভাবে সম্মতি দান করলে কিংবা সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হলে উক্ত বিল আইনে পরিণত হবে।

অর্থসংক্রান্তক্ষমতা : রাষ্ট্রপতির সুপরিশ ব্যতীত সরকারি অর্থব্যয় সংক্রান্ত কোনো বিল সংসদে উত্থাপন করা যাবে না এবং কোনো অর্থমঞ্জুরি দাবি করা যাবে না। চলতি অর্থ বছরে কোনো বিভাগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় অপর্যাপ্ত হলে বা কোনো নতুন কর্মবিভাগের জন্য ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সংযুক্ত তহবিল হতে এ ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি এ অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ সংবলিত একটি সম্পূরক বাজেট সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

বিচার সংক্রান্তক্ষমতা : রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারককে নিয়োগ করবেন। কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার বা যে কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে।

বিবিধ ক্ষমতা : উপর্যুক্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি ছাড়াও রাষ্ট্রপতি কতকগুলো কুটনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সম্পাদন করেন। তিনি বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন এবং বাংলাদেশে বিদেশি রাষ্ট্রদূতকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিদেশ সফর করেন এবং অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে সাহায্য করেন। তিনি বাংলাদেশে আগত বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারি অতিথিগণকে সাক্ষাৎদান ও আপ্যায়ন করেন। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রি, স্পিকার, ডেপুটি স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির শপথ পাঠ করান। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সেগুলোর শোভা বৃদ্ধি করেন।

রাষ্ট্রপতি সকল বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে এবং তার অভিমত ব্যক্ত করিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী তার অভিমত গ্রহণ করতে বাধ্য নন, কিন্তু একজন জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপতির সুচিন্তিত অভিমত প্রধানমন্ত্রীতথা মন্ত্রিসভাকে প্রভাবিত করতে পারে।

মন্ত্রিসভা

সংসদীয় গণতন্ত্র নির্বাহী বিভাগের দুটি অঙ্গ থাকে যেমন অলঙ্কারিক অঙ্গ ও সক্রিয় অঙ্গ। বাংলাদেশে নির্বাহী বিভাগের অলঙ্কারিক অঙ্গ হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এবং সক্রিয় অঙ্গ মন্ত্রিসভা। রাষ্ট্রপতির নামে সকল নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, কিন্তু কার্যত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা।

মন্ত্রিসভার গঠন ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা পরিচালিত হয়ে থাকে। মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী সময়ে সময়ে যেরূপ স্থির করবেন সেরূপ সংখ্যক মন্ত্রি নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আস্থাভাজন সংসদ সদস্যকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রি, প্রতিমন্ত্রি ও উপমন্ত্রি নিয়োগ দিবেন। প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ নিজ নিজ দপ্তরের কার্য পরিচালনা ছাড়া ও সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বৈঠকে মিলিত হয়ে সরকারের সাধারণ নীতি নির্ধারণ ও পর্যালোচনা করে থাকেন।

মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত বিধান সংবিধানে নেই। ৫৫ অনুচ্ছেদের (২) দফায় শুধু বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী কৃর্তক বা তার কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগযোগ্য হবে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা সকল নির্বাহী কার্য পরিচালনা করবে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি অনুসারে মন্ত্রিসভার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হবে।

১৯১৮ সালে হ্যান্ডেল কমিটির রিপোর্টে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কার্যাবলিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন-

১. যেসব শাসননীতি পার্লামেন্টে পেশ করতে হবে সেগুলো নির্ধারণ করা,
২. পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত আইন অনুযায়ী শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা, এবং
৩. সরকারি দপ্তরগুলো ক্ষমতার সীমানির্দেশ এবং তার কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভাও অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন।

নীতি নির্ধারণ : বাংলাদেশের শাসন বিভাগীয় কার্যাবলিকে কয়েকটি দপ্তর বা বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক বা একাধিক দপ্তরের কার্যভার এক একজন মন্ত্রির ওপর ন্যস্ত করা হয়। মন্ত্রিগণ স্ব স্ব দপ্তরের প্রধান এবং তারা স্থায়ী কর্মচারীদের সহায়তা নিজ নিজ দপ্তরের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা ও তদারক করে থাকেন। কিন্তু তারা নিজের আওতায় সম্পূর্ণ স্বাধীন নন।

আইন প্রণয়ন : মন্ত্রিসভার নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। যেসব বিষয়ে আইন প্রণয়ন প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো সে সব সম্পর্কে বিল বা আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। সাধারণত মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিগণ বিলগুলো সংসদ অধিবেশনে উপস্থাপন করেন। নতুন আইন প্রণয়ন ও পুরানো আইনের রদবদলের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় সংসদ অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন। মন্ত্রিগণ সংসদের বিল উত্থাপনের পর তা পাস করবার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা চালান। যেহেতু মন্ত্রিগণ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন সেহেতু তাদের পেশকৃত বিল অনায়াসে গৃহীত হয়।

নীতি বাস্তবায়ন : মন্ত্রিসভার নির্ধারিত নীতি এবং আইনসভার প্রণীত আইন কার্যকর করা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর কতর্ব্য। এই নীতিগুলো যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তা মন্ত্রিসভা নিশ্চিত করবে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে শাসনযন্তকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার ক্ষমতা মন্ত্রিসভার রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ

বাংলাদেশের একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। কিন্তু এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তিনি এমন একজন সংসদ সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিবেন যিনি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের আস্থাভাজন। অতএব জাতীয় সংসদে যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে সে দলের নেতাকেই তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করবেন। অবশ্য সংসদের কোনো দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিচার বুদ্ধি অনুসারে এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিবেন যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাভ করতে সমর্থ।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী ক্ষমতার কর্তা : প্রজাতন্ত্রর সকল নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হবে। কিন্তু তা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বের প্রয়োগ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তার সমস্ত কর্তব্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে সম্পাদন করবেন। অতএব সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীরই ক্ষমতা। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, মন্ত্রি নিয়োগ ও তাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন, সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও তা ভঙ্গ করা, আইনে সম্মতি দান, অধ্যাদেশ জারি করা, দণ্ড মওকুফ করা ইত্যাদি সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার নেতা : প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার মূল স্তম্ভ। তাকে ঘিরেই মন্ত্রিসভা আবর্তিত হয়। মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত। মন্ত্রিসভায় কতজন সদস্য থাকবে তাও তিনি স্থির করবেন। তিনি মন্ত্রি, প্রতিমন্ত্রিও উপমন্ত্রি মনোনয়ন করেন। রাষ্ট্রপতি তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দান করেন। প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় যে কোনো মন্ত্রিকে পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে প্রধানমন্ত্রীস্বীয় পদে বহাল না থাকলে মন্ত্রিসভা ভেঙে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী আইনসভার নেতা : প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য এবং তার নেতা। তার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করেন। সংসদ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন কিংবা সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করবেন। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, কোনো সংসদ সদস্য সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন নন তবে তিনি সংসদ ভেঙে দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে স্পীকার সংসদের কর্মসূচি নির্ধারণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা : প্রধানমন্ত্রীর দলই তার ক্ষমতার উৎস। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসন লাভ করেন। তার দলের সদস্যগণ সংসদে সরকারি নীতি ও বিল সমর্থন করেন এবং তার নির্দেশ অনুসারে সংসদে ভোট প্রদান করেন। ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সদস্য সংসদে তার দলের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করলে তিনি সদস্যপদ হারাবেন। এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর হাত আরও শক্তিশালী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও দক্ষতার উপর দলের শক্তি ও ক্ষমতা নির্ভর করে। নির্বাচনের সময় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে দলের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা তার কর্তব্য।

প্রধানমন্ত্রী জাতির নেতা : আধুনিককালে সাধারণ নির্বাচন বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন। কোনো দলের পক্ষে ভোট দেওয়ার অর্থ শুধু সেই দলের নীতি ও কর্মসূচিকে সমর্থন করা নয়, তার দ্বারা সেই দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করাকেও বুঝায়। সুতারং প্রধানমন্ত্রী শুধু সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি নন, তিনি জনগণের নেতা এবং তাকে কেন্দ্র করে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী অন্য সকল সদস্য অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি জনগণের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলেন এবং সময়োপযোগী বিবৃতি ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনমত গঠন ও পরিচালনা করেন। জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও দেশের সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। এজন্য তাকে বিরোধী দলগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়।

বাংলাদেশের এটর্নি-জেনারেল

বাংলাদেশ সরকারের আইন সংক্রান্ত প্রধান উপদেষ্টা বা কর্মচারীকে এটর্নি জেনারেল বলে সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দান করবেন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হলে এবং সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন ১০ বছর কাল এডভোকেটরূপে কাজ করে থাকলে, এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন ১০ বছর কাল বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালন করে থাকলে তিনি এটর্নি-জেনারেল পদে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন।

সুতারং রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তনুযায়ী এটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পরিশ্রমিক লাভ করবেন। এটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন হলে তিনি বাংলাদেশের যে কোনো আদালতে তার বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। এটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

আইন বিভাগ (জাতীয় সংসদ)

বাংলাদেশে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। এই আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদের সাধারণ আসন সংখ্যা ৩০০। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১০ বছরের জন্য অতিরিক্ত ১৫টি আসন কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। পঞ্চম সংশোধনীতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৫জন হতে ৩০ জন এবং সংরক্ষণের সময়সীমা ১০ বছর হতে ১৫ বছরে করা হয়। ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনীতে এই আসন সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ৫০। একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে উপযুক্ত ৩০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। অন্যূন ১৮ বছর বয়স্ক বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকগণ ধর্ম, বর্ণ, পেশা, বংশ বা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সংসদ সদস্যদের নির্বাচনে ভোটদান করতে পারবেন। প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যদিগকে নির্বাচন করেন। উল্লেখ যে, সংরক্ষিত আসন ছাড়া অন্যান্য সাধারণ আসনেরও মহিলাগণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। সংসদের একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার থাকেন তারা সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

সংসদ সদস্য পদের যোগ্যতা

কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হলে এবং তার বয়স পঁচিশ পূর্ণ হলে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

সংসদের অধিবেশন : রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করবেন এবং সংসদ আহ্বানকালে তিনি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন। তবে সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যে ৬০ দিনের অধিক বিরতি থাকবে না। তাছাড়া, যে কোনো সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে।

সংসদের মেয়াদ : জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল হচ্ছে পাঁচ বছর। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে যে কোনো সময় সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পূর্বে সংসদ ভেঙ্গে না দিলে প্রথম বৈঠকের তরিখ হতে ৫ বছর অতিবাহিত হলে সংসদ ভেঙে যাবে। সংসদ ভঙ্গ হওয়ার পর এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, প্রজাতন্ত্র কোনো যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে এবং সেই যুদ্ধাবস্থার জন্য সংসদ পুঃণরায় আহ্বান করা প্রয়োজন তাহলে রাষ্ট্রপতি তা আহ্বান করতে পারেন।

কোরাম : সংসদের কেরাম বা কার্য পরিচালনার জন্য অন্যূন ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। বৈঠক চলাকালে ৬০ জনের কম সদস্য উপস্থিত আছে বলে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি অন্যূন ৬০ জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখবেন কিংবা মূলতবি করবেন।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী। তার ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে ৭টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে যথা-আইন প্রণয়ন, সরকারের তহবিল নিয়ন্ত্রণ, শাসনবিভাগ নিয়ন্ত্রণ, বিচার বিভাগ সংক্রান্তক্ষমতা, নির্বাচনী কার্য, সংবিধান সংক্রান্তক্ষমতা এবং বিতর্কমূলক কাজ।

আইন প্রণয়ন : বাংলাদেশে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত। সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে সংসদ যে কোনো নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনের রদবদল করতে পারে। সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত হয়। কোনো বিল রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার ১৫ দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি দান করবেন কিংবা তা পুনর্বিবেচনার জন্য তার সুপারিশসহ সংসদে ফেরত পাঠাবেন। সংসদ বিলটি সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতীত মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পুনরায় পাস করলে তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে এবং তিনি ৭ দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করবেন। রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিলে সম্মতি দানে অসমর্থন হলে কিংবা প্রথম ক্ষেত্রে ফেরত না পাঠালে উক্ত সময়ের অবসানে তার সম্মতি ব্যতীত বিলটি আইনে পরিণত হবে।

সরকারি তহবিল নিয়ন্ত্রণ : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা জণগণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে সরকারে অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংসদের আইন বা তার কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে না। সরকার প্রতিবছর আয় ব্যয়ের অনুমিত হিসাব সংবলিত একটি বাজেট সংসদে উপস্থাপন করবে। সংযুক্ত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয়সমূহ সংসদে আলোচিত হবে। কিন্তু তার ওপর ভোট গ্রহণ করা হবে না। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত ব্যয় মঞ্জুরি দাবির আকারে সংসদে উপস্থাপিত হবে এবং সংসদ এরূপ মঞ্জুরি দাবি অনুমোদন কিংবা প্রত্যাখান করতে পারবে অথবা তাতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস করতে পারবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো অর্থ ব্যয় সংক্রান্তবিল বা মঞ্জুরি দাবি সংসদে উত্থাপন করা যাবে না।

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা : বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং জাতীয় সংসদের অন্যতম কাজ হলো শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী। মন্ত্রিসভা যতক্ষণ সংসদের আস্থা ভোগ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতায় বহাল থাকবে। সংসদ সদস্যগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও মূলতবি প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি উত্থাপনের মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করে থাকেন। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা হারালে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলে পদত্যাগ না করে সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করতে পারেন। সংসদের সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে সংসদ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে মন্ত্রিসভাই সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা : রাষ্ট্রের বিচার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য আদালতের ওপর ন্যস্ত। সাধারণত বিচার বলতে যা বুঝায় সংসদের সেরূপ কোনো কাজ নেই। মূল সংবিধানের বিচারকদের অপসারণের ব্যাপারে সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সংসদের মোট সদস্যের অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোনো বিচারককে রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারেন। বর্তমানে সংসদের এ ক্ষমতা নেই তবে সংবিধান লঙ্ঘন কিংবা অসদাচরণের অভিযোগে সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করতে পারে।

নির্বাচনী কাজ : জাতীয় সংসদ কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করে থাকে। প্রথমত, জাতীয় সংসদের সদস্যগণ প্রকাশ্য ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। দ্বিতীয়ত, সংসদ তার সদস্যদের মধ্য হতে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করে। তৃতীয়ত সংসদ তার বিভিন্ন কমিটি নির্বাচন করে। চতুর্থত, সংসদের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনের নির্বাচনের জন্য সংসদ সদস্যগণ নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করে।

সংবিধান সংক্রান্তক্ষমতা : বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় সংসদ মোট সদস্যসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন বা রহিত করতে পারে। তবে সংবিধানের প্রস্তাবনা, মূলনীতি, মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্তবিধানাবলি কোনোভাবে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে। এছাড়া সংসদ অনেক ক্ষেত্রে সংবিধান সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন করতে পারে।

বিতর্কমূলক কাজ : জাতীয় সংসদ একটি বিতর্কসভা হিসেবে কাজ করে। এর ব্যাপক আলোচনামূলক ক্ষমতা রয়েছে। মহাহিসাব নিরীক্ষক, সরকারি কর্মকমিশন ও ন্যায়পালের বার্ষিক রিপোর্ট সংসদে উত্থাপিত হবে এবং সেগুলো সম্পর্কে সংসদে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি সংসদে বাণী প্রেরণ ও ভাষণ প্রদান করেন এবং সংসদ সদস্যগণ সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া, সংসদ সদস্যগণ যে কোনো বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন এবং অনুরূপ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা :

সংসদীয় গণতন্ত্রর রীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার সাথে জাতীয় সংসদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যূন নয় দশমাংশ মন্ত্রি সংসদের সদস্য। মন্ত্রিগণ সংসদের কার্যধারায় অংশগ্রহণ করেন এবং তারা সংসদের নিকট দায়ী। এ দায়িত্ব দুই প্রকারের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও যৌথ দায়িত্ব। মন্ত্রিগণ নিজ নিজ দপ্তর সম্পর্কে ব্যক্তিগত দায়িত্ব বহন করেন। নিজ দপ্তরের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য প্রত্যেক মন্ত্রিকে সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তার অধিনস্ত সরকারি কর্মচারীদের ভুল ভ্রান্তি, অবহেলা বা অন্যায়ের দায়িত্ব মন্ত্রিকে গ্রহণ করতে হয়। কর্মচারীদের ওপর দোষ চাপিয়ে তিনি রেহাই পেতে পারেন না।

যৌথ দায়িত্ব : যৌথ দায়িত্ব বলতে বুঝায়, সরকারি নীতি ও কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রিগণ সমষ্টিগত ভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। অর্থাৎ মন্ত্রিসভায় যা ঘটে এবং যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয় তার জন্য সকল মন্ত্রিকে দায়িত্ব বহন করতে হয়। মন্ত্রিসভার বৈঠকে মন্ত্রিদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ ঘটতে পারে। কিন্তু মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর সকল মন্ত্রি তা সমর্থন করবেন। মন্ত্রিসভার কোনো নীতির বিরূদ্ধে কোনো সমালোচনা হলে কোনো মন্ত্রি একথা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না যে, উক্ত বিষয়ে তার সম্মতি ছিল না। মন্ত্রিসভার সকল সিদ্ধান্তই তাকে মেনে নিতে হবে, নতুবা তিনি পদত্যাগ করবেন। সুতারং যৌথ দায়িত্বের অর্থ হলো সংসদের ভেতরে ও বাইরে মন্ত্রিসভা একক সংস্থা হিসেবে কাজ করবে এবং সকল মন্ত্রি একই সুরে কথা বলবেন। কোনো মন্ত্রি প্রকাশ্যে সরকারি নীতি বিরোধিতা করবেন না। বরং সকলেই তা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করবেন এবং সংসদে এর পক্ষে ভোট দিবেন। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যদি মন্ত্রিসভার নীতি সমর্থন না করেন তবে সকল মন্ত্রি একই সঙ্গে পদচ্যুত হবেন।

মন্ত্রিসভার জবাবদিহিতা কার্যকর করার পদ্ধতি

বাংলাদেশে শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রিসভা তার নীতি ও কার্যকলাপের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী। প্রশ্ন হলো, কিভাবে এ দায়িত্ব কার্যকর করা হয়, অন্যথায় সংসদ কিভাবে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে? যেসব উপায়ে বা পদ্ধতিতে সংসদ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক) অনাস্থা ভোট : মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বলবৎ করার চরম ও প্রত্যক্ষ পন্থা হলো সংসদ কর্তৃক মন্ত্রিসভার বিরূদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা। সংবিধানের ৫৭(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে। যে কোনো সংসদ-সদস্য মন্ত্রিসভার বিরূদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সংসদের প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। স্পিকার যদি উক্ত প্রস্তাবটি বিধিসম্মত বলে মত দেন এবং অন্যূন ৩০ জন সংসদ সদস্য তা সমর্থন করেন তাহলে প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গৃহীত হবে। আলোচনার পর অনাস্থা প্রস্তাব সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক গৃহীত হলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলে পদত্যাগের পরিবর্তে সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করতে পারবেন।

খ) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা : যে কোনো সংসদ সদস্য যে কোনো মন্ত্রিকে তার দপ্তর সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে কোনো সংসদ সদস্য তাঁর প্রশ্ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রির পদবি উল্লেখপূর্বক স্পিকারের নিকট ১৫ দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করবেন। স্পিকার কর্তৃক নির্ধারিত দিনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রি উক্ত প্রশ্নের উত্তর দান করবেন। প্রত্যেক দিনের বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা প্রশ্ন উত্থাপন ও উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। মন্ত্রিগণ সদস্যদের প্রশ্নের সদুত্তর দান করতে বাধ্য।

গ) মূলতবি প্রস্তাব : কোনো সাম্প্রতিক ও জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন নির্দিষ্ট বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে সংসদের কাজ মূলতবি করার জন্য কোনো সদস্য প্রস্তাব করতে পারেন। স্পিকার যদি প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়টি বিধিসম্মত বলে মত দেন এবং অন্যূন ২৫ জন সদস্য উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন, তবে তা সংসদে আলোচনার জন্য গৃহীত হবে।

ঘ) সিদ্ধান্ত প্রস্তাব : স্পিকারের অনুমতিক্রমে সাধারণ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে যে কোনো সদস্য সংসদে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। এরূপ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হলো, কোনো বিষয়ে সংসদের মতামত ঘোষণা বা সুপারিশ করা, অথবা সরকারের কোনো কাজ বা নীতি অনুমোদন করা, অথবা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা, অথবা কোনো বিষয় বা পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। স্পিকার সংসদ কর্তৃক গৃহিত প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রির নিকট প্রেরণ করবেন। সরকার সেই প্রস্তাব সম্পর্কে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে উক্ত মন্ত্রি তা পরবর্তী অধিবেশনে সংসদকে জানাবেন। সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক না হলেও তা সরকারের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।

ঙ) রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী আলোচনা : রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণদান ও বাণী প্রেরণ করেন (অনুচ্ছেদ ৭৩) । এ ভাষণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারি নীতি ও কর্মসূচির উল্লেখ থাকলে সরকারদলীয় সদস্যগণ এ ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং বিরোধী দলের সদস্যগণ উক্ত প্রস্তাবের ওপর সংশোধনী আনয়ন করেন। ফলে সংসদে পূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং সংসদ সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের সমালোচনা করতে পারে ।

চ) সরকারি বিল ও বাজেট অনুমোদন : সরকার নীতি কার্যকর করার জন্য আইনের কর্তৃত্ব ও অর্থের প্রয়োজন হয়। সংসদ আইন প্রণয়নের অধিকারী এবং তার অনুমোদন ব্যতীত সরকার অর্থ আদায় ও ব্যয় করতে পারে না। সরকারে কর্তৃক প্রণীত বিল ও বাজেট সংসদে উত্থাপিত হয় এবং সংসদে যে কোনো সরকারি বিল বা অর্থমঞ্জুরীর দাবি প্রত্যাখ্যান করতে পারে অথবা বিলের সংশোধন কিংবা অর্থের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। সংসদ কোনো ব্যয় বরাদ্দ প্রত্যাখ্যান কিংবা হ্রাস করলে রাষ্ট্রপতি বড় জোর ৬০ দিনের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করতে পারেন।

বিচার বিভাগ

সুপ্রীম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদ থেকে ১১৩ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ একটি সুপ্রীম কোর্ট, অন্যান্য অধঃস্তন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত। এর গঠন সোপানভিত্তিক (Hierarchical)। বিচার বিভাগের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের দুটি বিভাগ ১। হাইকোট বিভাগ ও ২। আপীল বিভাগ। হাইকোর্ট বিভাগ আপীল বিভাগের অধঃস্তন শাখা না হলেও প্রকৃতপক্ষে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান ক্ষমতাগুলো আপীল বিভাগই প্রয়োগ করে থাকে। সুপ্রীম কোর্টের নিচে আছে জেলা আদালত। সকল অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শাসন বিভাগের সাথে বিচার বিভাগরে পৃথককরণ। উচ্চস্তরে আদালতসমূহের বিচারকগণ বিচার বিভাগীয় ব্যক্তি এবং শাসন বিভাগ হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথক। কিন্তু নিম্নস্তরের ফৌজদারি আদালতের বিচারকগণ সম্পূর্ণরূপে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত না। যদিও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথককরণ নিশ্চিত করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা অদ্যাবধি সুসম্পন্ন হয়নি।

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল। ১১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ বরখাস্ত, দণ্ডদান ও কর্মের অন্যান্য শর্তাবলি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগসমূহের ব্যবস্থাপনা, সরকার পরিচালিত, কোনো সম্পত্তি, প্রশাসন ইত্যাদি হতে উদ্ভূত বিষয়াদির ওপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারে অন্তর্গত কোনো বিষয়ে অন্য কোনো আদালত কোনো কার্যধারা গ্রহণ করবে না। সুপ্রীম কোর্টকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা (Judicial Review) দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের কোনো বিধানের সাথে অসামঞ্জস্য কোনো আইনকে অবৈধ ঘোষণা করবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রিট জারি করার ক্ষমতাও হাইকোর্ট বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিধানের জন্য সংবিধানে কিছু ব্যবস্থা রয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের গঠন

বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্ট দুটি বিভাগকে নিয়ে গঠিত যথা : আপীল বিভাগ, ও হাইকোর্ট বিভাগ। প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগের আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগের নিযুক্ত বিচারকগণ উক্ত বিভাগের আসন গ্রহণ করবেন এবং অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হতে হলে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং ক) অন্তত, দশ বছর সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করে থাকতে হবে, অথবা, খ) অন্তত, দশ বছর বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে, অথবা, গ) সুপ্রীম কোর্টে বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভের অন্যান্য আইনানুগ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। কোনো বিচারক সাতষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে তৎপূর্বেই অসামর্থ্য বা গুরুতর অসদাচরণের কারণে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কোনো বিচারককে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন। কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে নিজের পদত্যাগ করতে পারেন। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশন বসবে। তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে অন্য স্থানেও হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

সুপ্রীম কোর্টের কার্যবলি

বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা অপরিসীম। এর মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কার্যগুলো প্রধান। নিম্নে এর আলোচনা করা হলো।

অধঃস্তন আদালত থেকে মামলা হস্তান্তর : হাইকোর্ট বিভাগ সংবিধান ব্যাখ্যার প্রশ্নজড়িত বা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক কোনো মামলা অধঃস্তন আদালত থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারে এবং তা স্বয়ং মীমাংসা বা অন্যভাবে মীমাংসার ব্যবস্থা করতে পারে।

আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি : সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায় বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানি ও তা নিষ্পত্তি করে থাকেন। আপীল বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা আদেশ জারি করতে পারেন। আপীল বিভাগের ঘোষিত রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতাও উক্ত বিভাগের আছে।

তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ : হাইকোর্ট বিভাগ তার অধঃস্তন সকল আদালতের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ চর্চা করে থাকেন।

মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ : হাইকোর্ট বিভাগ মৌলিক অধিকার বলবৎ করার উদ্দেশ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের প্রতি উপযুক্ত নির্দেশ বা আদেশ দান করতে পারেন।

উপদেশ দান : সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার বা কর্মও আছে। রাষ্ট্রপতি কোনো গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের মতামত চাইতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ বিষয়টি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করতে পারে।

বিধি প্রণয়ন : সংসদের আইন সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রত্যেক বিভাগের এবং অধঃস্তন যে কোনো আদালতের রীতি ও কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করতে পারেন।

কোর্ট অব রেকর্ড : সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব রেকর্ড।" এটি তার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান ও দণ্ডাদেশ প্রদান করতে পারে।

বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা : এ ক্ষমতাটি যে কোনো দেশের বিচারালয়ের চরম ক্ষমতা। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এ ক্ষমতার বলে জাতীয় সংসদ প্রণীত যে কোনো আইন সংবিধানের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা পর্যালোচনা করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। সুপ্রীম কোর্ট যদি কোনো আইনকে সংবিধান বিরোধী বলে প্রমাণিত করতে পারে তবে সে আইনকে উহা বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত থেকে কেবল আইন অনুসারে নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা বুঝায়। একই সঙ্গে বিচারকদের ব্যক্তিগত প্রভাব ও সামাজিক চাপ হতে মুক্ত রাখতে হবে। বিচার বিভাগের এ স্বাধীনতা নির্ভর করে বিচারকের নিয়োগপদ্ধতি, চাকরির নিরপত্তা ও অন্যান্য শর্তের ওপর বাংলাদেশের সংবিধানের বলা হয়েছে যে, বিচারকগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন। বিচারকদের এ স্বাধীনতা কার্যকর করার জন্য সংবিধানে কতিপয় বিধান রয়েছে।

নিয়োগ পদ্ধতি : বিভিন্ন দেশে বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। কোনো কোনো দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারকদের নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের বিধান ছিল যে, রাষ্ট্রপতি এককভাবে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন এবং প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারক নিয়োগ করবেন। বর্তমানেও রাষ্ট্রপতি এককভাবে প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করতে পারেন, কিন্তু কার্যত রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারকের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শের বিধান রয়েছে।

চাকরির নিরাপত্তা : বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচারকদের চাকরির স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা একটি অপরিহার্য শর্ত। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সংবিধানে উপযুক্ত বিধান রয়েছে। শাসন বিভাগ বিচারকদের নিয়োগ করে, কিন্তু নিজের ইচ্ছেমতো কোনো বিচারককে অপসারণ করতে পারে না। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত পদে বহাল থাকবেন। কেবল প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে কোনো বিচারককে তার পদ হতে অপসারণ করা যায় এবং সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি অপসারণের আদেশ দিতে পারেন। উল্লেখ যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অপর দুজন সিনিয়র বিচারপতি নিয়ে গঠিত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল একটি স্বাধীন সংস্থা রয়েছে।

কর্মের অন্যান্য শর্তাবলি : বিচারকের আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত রাখার জন্য তাদের চাকরি সম্পর্কে সংবিধানের কতিপয় বিধান করা হয়েছে যেমন–

১। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণকে দেয় পারিশ্রমিক সংযুক্ত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয়। অর্থাৎ এ ব্যয় সম্পর্কে সংসদের বাৎসরিক মঞ্জুরির দরকার হয় না।

২। কোনো বিচারকের নিয়োগের পর তার বেতন, ভাতা ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন কোনো তারতম্য করা যায় না, যা তার পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে। তবে ভারতের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানের বিচারপতিদের পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করা হয়নি; সংসদ আইনের দ্বারা তা নির্ধারণ করবে। আইনের দ্বারা বিচারকদের জন্য পর্যাপ্ত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করলে তাদের স্বাধীনতা ও দক্ষতা সংরক্ষিত হবে।

৩। বিচারপতিগণকে প্রলোভনমুক্ত রাখতে না পারলে তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয় না। এজন্য বিধান করা হয়েছে যে, কোনো বিচারক অবসর গ্রহণ বা অপসারণের পর কোনো আদালতের ওকালতি করতে পারবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় পদ ছাড়া সরকারি কোনো কর্মে নিয়োগের যোগ্য হবেন না। যখন অবসর গ্রহণের পর কোনো সরকারি পদ লাভের আশা থাকে না তখন বিচারকগণ সরকারকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা না করে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সমাধান করতে পারেন।

তাছাড়া, বিচারক পদে কর্মরত কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো লাভজনক পদে বহাল হতে কিংবা মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যেযুক্ত কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানে কোনোরূপ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এখানে যে প্রশাসনিক কাঠামো ছিল তা ছিল বৈশিষ্ট্যগতভাবে প্রাদেশিক। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রাদেশিক সচিবালয়কে জাতীয় সচিবালয়ে পরিণত করার জন্য ১৯৭২ সালে একজন উর্ধ্বতন প্রশাসকের দায়িত্বে একটি কমিটি করা হয় এবং এ কমিটি বেসামরিক সরকারি প্রশাসন পুনরুদ্ধার কমিটির নামে পরিচিত। এ কমিটি ২১টি মন্ত্রণালয় ৩১টি বিভাগ, ৩টি সচিবালয় সংস্থা এবং ৭টি সাংবিধানিক সংস্থা গঠনের জন্য সুপারিশ করে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামো নিম্নোক্ত নকশায় দেখানো হলো-

রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামো

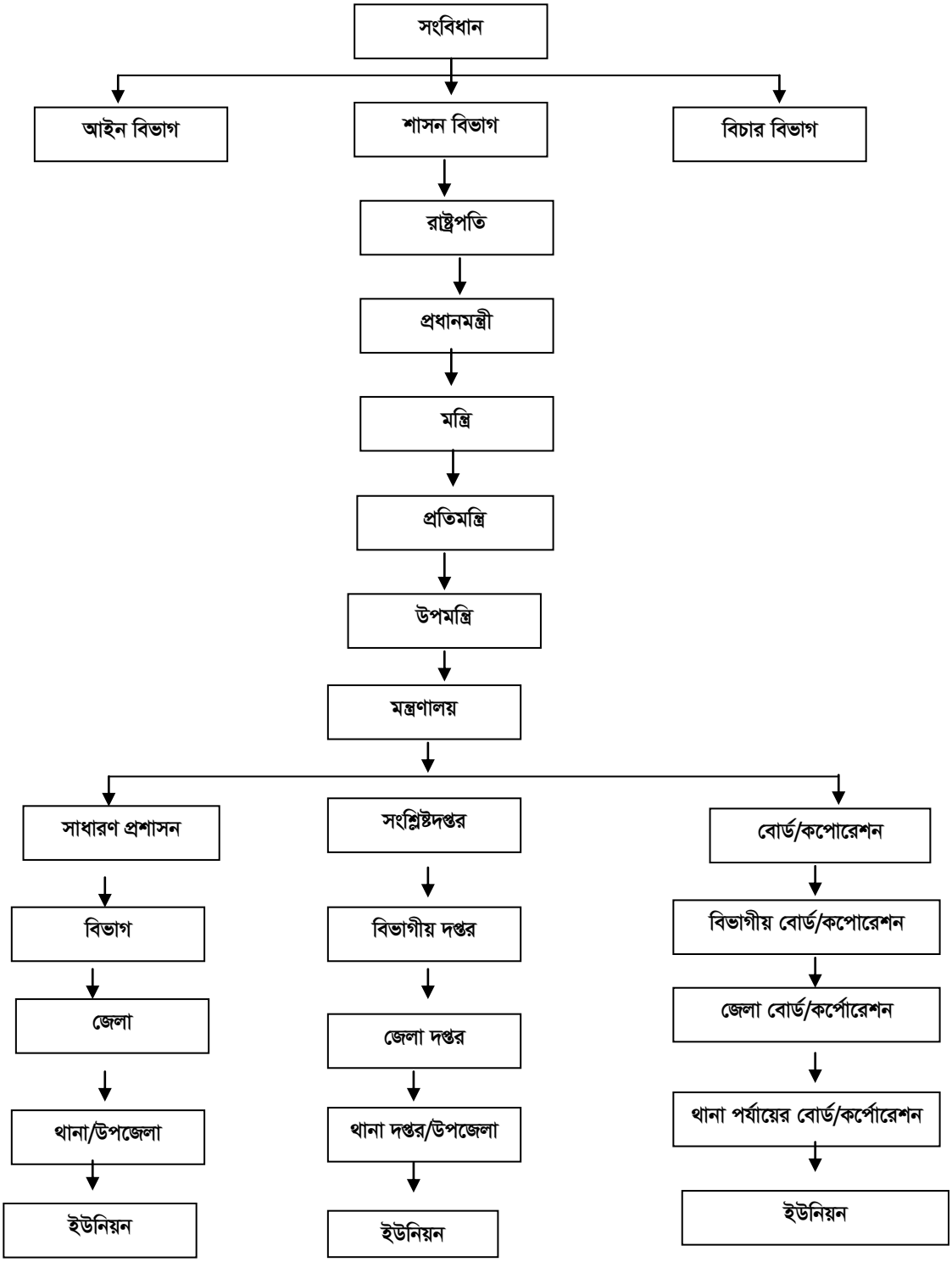

সচিবালয়ের কাঠামো ও কার্যগত দিক

প্রশাসনিক সংগঠনের পদসোপানে জাতীয় সচিবালয় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সচিবালয় হলো ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। বাংলাদেশ সরকারের নীতি ও কর্মসূচি এখানেই প্রথম জন্মলাভ করে এবং এ সচিবালয় মন্ত্রি ও সরকারি কর্মচারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সহযোগিতার কেন্দ্রস্থল। মন্ত্রি ও সরকারি কর্মকর্তার মধ্যে সম্পর্ক হলো প্রাত্যহিক ও প্রত্যক্ষ এবং এই দু'য়ের মধ্যে দ্বন্দ্বও প্রত্যক্ষ। জাতীয় সচিবালয়কে সকল প্রকার রাজনৈতিক, আঞ্চলিক এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্টগোষ্ঠীর প্রভাবাধীন হয়ে কার্যসম্পাদন করতে হয়। কেননা সচিবালয় কর্তৃক প্রণীত ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সমাজ ও সুসংগঠিত সামাজিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেজন্য বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ক্ষেত্রে সচিবালয়ের ওপর নানা প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য উপায় খুঁজে বেড়ান। সচিবালয় বিভিন্ন প্রতিযোগি স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অবগঠন ঘটাতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়ের সংগঠন

রাজনৈতিক স্তর : উর্ধ্বতন পর্যায়ে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রি, এক বা একাধিক উপমন্ত্রি/ প্রতিমন্ত্রি সাহায্য করেন।

প্রশাসনিক স্তর

- সচিব তিনি হলেন প্রশাসনিক প্রধান এবং মন্ত্রির প্রধান উপদেষ্টা। বর্তমানে বিশেষ সচিব ও অতিরিক্ত সচিবও রয়েছে।
- যুগ্মসচিব (প্রশাসন) কর্মচারী এবং কার্যালয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন অভ্যন্তরীণ অর্থ উপদেষ্টা।
- যুগ্মসচিব (সচিবালয়ের প্রত্যক্ষ কার্যসম্পাদন দায়িত্ব গ্রহণ করেন)।
- যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
- উপসচিব ও সহকারী সচিব যুগ্মসচিবকে তাঁদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ মোতাবেক সাহায্য করেন।

সচিবালয়ভুক্ত নয় এরূপ সংগঠন

- বিভাগীয় প্রধান/চেয়ারম্যান/মহাপরিচালক।
- পরিচালক (কার্যগত দিক থেকে যুগ্মসচিবের সমতুল্য)
- যুগ্ম-পরিচালক-অথবা উপপ্রধান
- উপপরিচালক কিংবা সমতুল্য কর্মকর্তা
- সহকারী পরিচালক।

সচিবালয় সংগঠনের নক্শা

সচিব

অতিরিক্ত সচিব	যুগ্মসচিব
যুগ্ম-সচিব	উপ-সচিব
উপ-সচিব	ঊর্ধ্বতন সহকারী সচিব
সহকারী সচিব	সহকারী সচিব

- সচিব-বিভাগের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন।
- অতিরিক্ত/যুগ্ম-সচিব-উপবিভাগের দায়িত্বে থাকেন।
- উপসচিব-শাখা (কয়েকটি শাখার দায়িত্ব নেন)।
- ঊর্ধ্বতন সহকারী সচিব (একটি শাখার দায়িত্ব নেন)।
- সহকারী সচিব (একটি শাখার দায়িত্ব নেন)।

মন্ত্রি ও সচিবের পরই সবচেয়ে কার্যকর সিদ্ধান্তগ্রহণের স্তরে পড়েন অতিরিক্ত ও যুগ্ম-সচিব। একজন যুগ্মসচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকেন সাধারণত ২ থেকে ৪ জন উপসচিব। একজন উপসচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকেন সাধারণত ১ থেকে ৫ জন সহকারী সচিব। সচিবের দায়িত্বভার বিভাগ, যুগ্ম সচিবের দায়িত্বভার উপবিভাগ, উপসচিবের দায়িত্বভার শাখা এবং সহকারী সচিবের দায়িত্বভার উপশাখা বা সেকশন বলে পরিচিত।

বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসন

পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ছাড়া প্রায় সব মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অফিস বিভিন্ন প্রশাসনিক এককগুলোতে বিভাগ, জেলা, থানা পর্যায়ে বিস্তৃত আছে। ১৯৮২ সাল থেকেই এ ভৌগোলিক এককের যথেষ্ট রদবদল শুরু হয়েছে। এখন বিভাগ হলো ৮টি। তবে জেলার সংখ্যা ২০ থেকে ৬৪টি তে উন্নীত হয়েছে। মহকুমা বিলুপ্ত করে সেগুলোকে জেলায় উন্নীত করা হয়েছে এবং থানা উপজেলায় উন্নীত হয়েছিল। পুনরায় উপজেলা থানায় রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে মোট ৪৬০টি থানা রয়েছে যদিও বর্তমানে মহকুমা ও উপজেলা এ দুটি একক আর নেই, তথাপি এদের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করা হল।

বিভাগীয় প্রশাসন

একটি বিভাগের আয়তন হচ্ছে গড়ে ৩৮৯৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা আনুমানিক ত্রিশ লাখের উপরে। বর্তমানে ঢাকা বিভাগে ১৭, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৫, খুলনা বিভাগে ১৬ এবং রাজশাহী বিভাগে ১৬টি জেলা রয়েছে। বিভাগের প্রধান হলেন কমিশনার। তিনি বিভাগীয় কমিশনার নামে পরিচিত। এই পদটি ব্রিটিশ ভারতে ১৯২৯ সালে বেঙ্গল রাজস্ব কমিশনারের রেগুলেশান মোতাবেক সৃষ্টি হয়েছিল। বিভাগীয় কমিশনার হলেন একজন সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তা। পূর্বে সাধারণত সিভিল সার্ভিস সদস্যদের থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারাই এই পদটি পূরণ করা হত। বর্তমানে তিনি হলেন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিক) ক্যাডারভুক্ত। তিনি বেতন ও পদমর্যাদার দিক থেকে যুগ্ম সচিবের মর্যাদা ভোগ করেন। এরূপ মর্যাদার কারণেই তার কাছ থেকে প্রেরিত কোনো প্রস্তাব সচিব ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তার দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এমনকি কোনো বিষয়ে সচিবের সঙ্গে মতানৈক্য হলে কমিশনার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রি বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন।

বিভাগীয় প্রশাসনের কাজ

বিভাগীয় কমিশনার বিভাগগুলোতে বিভাগীয় প্রধানের ভূমিকা পালন করে থাকেন। এমনকি বিভাগীয় প্রধান বিভাগের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহন করে থাকেন। যেমন-

- প্রধানত রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক কাজ তদারক করে থাকেন।
- বিভাগীয় সকল উন্নয়ন মূলক কাজের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করে থাকেন।
- তিনি আইন শৃঙ্খলা বিষয়েও সমন্বয়সাধন করেন। এ ব্যাপারে তাকে বিভাগীয় ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং জেলা পুলিশ সুপারগণ সাহায্য করে থাকেন।
- তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ক্রীড়া বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
- বিভাগীয় কমিশনার জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট এবং মামলা সংক্রান্ত বিষয়ও দেখে থাকেন।
- এ ছাড়া সংবিধিবদ্ধ মৌলিক ও আপিল সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
- তিনি হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে বিভাগের চক্ষু ও কর্ণ।

জেলা প্রশাসন

ঐতিহাসিক বিবর্তনে জেলাপ্রশাসন অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসনের একটি প্রধান একক। অক্সফোর্ড সংক্ষিপ্ত অভিধানে জেলাকে বিশেষ প্রশাসনিক উদ্দেশ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলে অভিহিত করেছে। প্রশাসনের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সরকারি কার্যাদির ব্যবস্থাপনা। সে দিক থেকে জেলাপ্রশাসন বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সরকারি কার্যের ব্যবস্থাপনা বোঝায়। সহজভাবে বলা যায় যে, জেলাপ্রশাসন হচ্ছে লোকপ্রশাসন এমন একটি অংশ বা কাজ বোঝায় যা জেলার নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সম্পাদিত হয়।

বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন বিভিন্ন দিক থেকে অঞ্চল ভিত্তিক প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ একক। বর্তমানে আমাদের এ স্বাধীন বাংলাদেশের জেলা অঞ্চল ভিত্তিক প্রশাসনের প্রধান একক হিসেবেই বিরাজ করছে। জেলাপ্রশাসন হলো একটি জেলায় সম্পাদিত সরকারের সামগ্রিক কার্যাবলি এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সামগ্রিক ও জটিল সংগঠন। এটি কোনো স্থিতিশীল সংগঠন নয় বরং এটি একটি গতিশীল সংগঠন। জেলাপ্রশাসনে সরকারের সকল কার্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। এতে জেলার সরকারি কার্য ব্যবস্থাপনার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। যেমন:- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা-জেলা বোর্ড, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি।

জেলা প্রশাসন/পরিষদের কার্যাবলি

জেলা পরিষদের কার্যাবলি সাধারণত দুই প্রকারের যথা : প্রাথমিক কার্যাবলি এবং ঐচ্ছিক কার্যাবলি। জেলা পরিষদের প্রাথমিক কার্যসমূহ নিম্নরূপ :

- হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।
- পাঠাগার ও পাঠকদের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ।
- জল সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন, মেরামত ও সংরক্ষণ।
- জনসাধারণের জন্য পার্ক, উদ্যান, মাঠ প্রভৃতি নির্মাণ ও এগুলো সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- রাস্তা, ঘাট পুল, প্রভৃতি নির্মাণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।
- বৃক্ষরোপণ এবং তাদের সংরক্ষণ।
- বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, খেলাধুলা ব্যবস্থা ও মান উন্নয়ন করা।
- খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করা ও ভেজাল পতিরোধ করা।
- জাতীয় দিবস ও সরকারি দিবস উদ্‌যাপন করা।
- জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ও সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণকল্পে বাধ্যতামূলক টিকাদানের ব্যবস্থা করা এবং সরকারি নির্দেশে অন্যান্য কার্য কর।
- মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। পর্যটক এবং আগন্তকদের নিমিত্ত বিশ্রামাগার ও ডাকবাংলা নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা।

উপরিউক্ত প্রাথমিক কাজগুলো ছাড়াও জেলা পরিষদ বিভিন্ন ইচ্ছামূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। যথা উন্নয়নমূলক শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক, অর্থনৈতিক, সেবামূলক এবং জনস্বাস্থ্যমূলক। এ কাজগুলো ঐচ্ছিক হলেও জনগণের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

উপজেলা প্রশাসন

অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসন আলোচনার প্রথমাংশেই বলা হয়েছে যে, সামরিক সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জনগণের দুয়ারে প্রশাসনকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে থানা পরিষদ অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ অনুসারে এই থানাগুলোকে অধিক ক্ষমতা ও সম্পদসহ উপজেলায় উন্নীত করেছেন। ১৯৮৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত এই উপজেলার মোট সংখ্যা ৪৬০টি উপজেলা প্রশাসনের প্রধান ছিলেন চেয়ারম্যান। তিনি উপজেলাস্থ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। উপজেলা প্রশাসনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা ছিল উপজেলা পরিষদ। এ পরিষদ দু'ধরনের সদস্য নিয়ে গঠিত। যেমন–নির্বাচিত বা জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান এবং সরকার কর্তৃক চারজন মহিলা তারা সবাই ছিলেন বেসরকারি সদস্য। পরিষদের কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ বিষয়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। সরকারি কর্মকর্তা সদস্যদের কোনো ভোটারধিকার নেই এবং তাঁর বিভিন্ন বিভাগ কর্পোরেশন যেমন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমবায়, গবাদি ও পশুপালন, মৎস্য, সমাজকল্যাণ, রাজস্ব ও পুলিশ প্রভৃতির প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি

স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থান ও প্রশাসন পুর্ণগঠন: দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদকে নিম্নোক্ত কার্যাবলি দেওয়া হয়েছিল। যেমন–

- উপজেলা পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কার্য
- ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, তাদারকিকরণ ও তা মূল্যায়ন
- ইউনিয়ন পরিষদকে সাহায্য প্রদান
- সরকারি কর্মসূচি বাস্তাবায়ন
- নিয়ন্ত্রণমূলক ও বিচার সংক্রান্ত অফিসারদের কাজ ব্যতীত উপজেলা সকল অফিসারদের কাজ কর্মের তত্তাবাধান, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন
- জেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান এবং
- সরকার কর্তৃক অর্পিত নির্দিষ্ট দায়িত্বাবলি সম্পাদন

এই কার্য তালিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বিস্তারিত দায়িত্ব উপজেলা প্রশাসন নির্দেশনামালা ২য় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের সভা মাসে অন্তত একটি হতে হবে। প্রয়োজনবোধে চেয়ারম্যান কিংবা এক তৃতীয়াংশ পরিষদ সদস্য রিকুইজেশন সভা আহ্বান করতে পারেন। এ সভায় আলোচনার বিষয়াদিকে চারভাগে ভাগ করা হত যেমন- অর্থসংক্রান্ত, উন্নয়নমূলক, সমন্বয়মূলক ও বিবিধ।

ক) অর্থ সংক্রান্তকার্য

- পরিষদ অর্থ তহবিল সম্পর্কিত সকল বিষয়
- পরিষদ অর্থ তহবিল থেকে ব্যয় অনুমোদন সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ
- কর, টোল, ফি ও হার নির্ধারণ এবং সংগ্রহ সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ
- পরিষদের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন
- পরিষদের বার্ষিক হিসাব বিবরণ
- পরিষদের সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন
- চলতি বছরের বাজেটে সন্নিবেশিত হয়নি এরূপ ব্যয়সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং
- পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত নিরীক্ষা প্রতিবেদন

খ) উন্নয়নমূলক

- সংরক্ষিত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়নমূলক প্রস্তাব ও প্রকল্প
- বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক পরিষদের নিকট ন্যস্ত সকল উন্নয়ন প্রকল্প
- সংশোধন ও সময়োপযোগী পরিবর্ধনসহ উপজেলা পরিকল্পনা পুস্তিকা সংক্রান্ত সকল বিষয়
- পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়
- পরিষদের পাঁচসালা পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়
- পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে এরূপ পরিকল্পনা অনুমোদন ও কাজের হিসাব এবং
- পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সাময়িক পর্যালোচনা

গ) সমন্বয়মূলক

- হস্তান্তরিত বিষয় সম্পর্কিত সকল সংস্থার কাজের সাময়িক পর্যালোচনা এবং সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কর্মকাণ্ড বা প্রকল্প সম্বন্ধে বিবরণ ও প্রতিবেদন।
- উপজেলাস্থ নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত কাজের সমরূপ বিবরণ ও প্রতিবেদন সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

ঘ) বিবিধ

- সরকার কর্তৃক ডেপুটেশন ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থানরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকরি সংক্রান্ত বিষয়
- কমিটি ও উপকমিটি গঠন
- পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ
- পরিষদ সচিবালয়ের সামগ্রিক কার্যের পরিচালনা
- উপজেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা
- উপজেলার ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত কাজের পর্যালোচনা
- পরিষদ কর্তৃক সকল সিদ্ধান বাস্তবায়নের পর্যালোচনা এবং
- জনগণের স্বার্থ সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়

থানা প্রশাসন

বাংলাদেশে প্রতিটি মহকুমাকে কয়েকটি থানাতে বিভক্ত করা হয়েছিল। বাংলাদেশের ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৪৭৮টি থানা ছিল। গ্রামাঞ্চলে পুলিশ প্রশাসন সংগঠনের উদ্দেশ্যেই মূলত থানা সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিছু সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা ও পুলিশ নিয়ে একজন সাব পুলিশ পরিদর্শকের আদেশাধীন এক একটি থানা সৃষ্টি করা হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এসব থানাকে উপজেলায় পরিণত করা হয়েছে, তবে প্রাক্তন বৃহত্তর জেলাগুলোর সদরে কোতোয়ালি থানা আজও থানা রূপেই রয়েছে।

থানা পরিষদের গঠন

থানা পরিষদ একজন চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও বেশকিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত ছিল। সদস্য ছিল দু'ধরনের সরকারি ও বেসরকারি। থানায় অবস্থিত সকল বিভাগের কর্মকর্তারা ছিলেন সরকারি সদস্য, আর বেসরকারি সদস্যরা থানার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের নিয়ে গঠিত হতো। সদর মহকুমার অফিসার এবং সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) যথাক্রমে এই পরিষদের ছিলেন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান। মহকুমা অফিসারের অবর্তমানে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এই পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতেন।

থানা পরিষদের কার্যাবলি

আইন নিয়মকানুন ও সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক থানা পরিষদ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করত।

- ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- থানার মধ্যে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহের প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহের অন্তর্ভুক্তিকরণ।
- পরিবার পরিকল্পনাসংক্রান্তজ্ঞান বা শিক্ষার প্রসার।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য সচিবদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ইউনিয়ন পরিষদকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান। এবং
- সামগ্রিক উন্নয়ন পরিবেশ বজায় রক্ষার্থে যথাযথ ব্যবস্থাপনা।

উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি মাসে অন্তত একবার থানা পরিষদে একটি করে সভা আহ্বান করা হতো এবং এই সভায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা অনুমোদন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হতো। এই কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রেরণ করা হতো। অর্থ পাওয়ার পর থানা পরিষদ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন তদারকিকরণের পদক্ষেপ নিয়ে থাকত। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থানা উন্নয়ন কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রণীত প্রকল্পগুলো অনুমোদন কর্তৃপক্ষ থানা পরিষদকে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পগুলো নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রণয়ন করা হতো :

ক) রাস্তার পুল ও কালভার্ট
খ) পুকুর খনন ও মজা পুকুর সংস্করণ
গ) বাঁধ নির্মাণ (ছোট খাট)
ঘ) থানা সেচ কর্মসূচিভূক্ত খাল খনন ও পুন:খনন এবং
ঙ) উলশী ধরনের প্রকল্প (বিশেষ করে পানি সংরক্ষণের জন্য খাল খনন)

থানা উন্নয়ন কমিটি

থানা উন্নয়ন কমিটি থানার আওতাভুক্ত সকল ইউনিয়ন চেয়ারম্যানকে নিয়ে গঠিত হত। তাদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান একজন সচিব এবং বাদবাকি সদস্য নিয়ে গঠিত হয়ে থাকত। কমিটি ইচ্ছা পোষণ করলে অফিসারদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিকে এ কমিটির সদস্য করে নিতে পারত। এ কমিটির চেয়ারম্যানের টাকা উঠানো এবং তা বিতরণের ক্ষমতা ছিল। থানা কমিটি প্রকল্প তৈরি করে সেগুলো থানা পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করত। থানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য থানা উন্নয়ন কমিটির নিকট অর্থ দেওয়া হতো।

ইউনিয়ন পরিষদ

কাঠামো ও কার্যাবলি

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান হবেন চেয়ারম্যান। তিনি নির্বাচিত হবেন ইউনিয়ন পরিষদের ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে। ইউনিয়ন পরিষদের তিনজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবেন। তবে কোনো ওয়ার্ড থেকে একাধিক মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবেন না। ইউনিয়ন পরিষদের দু'রকম দায়িত্ব রয়েছে।

১. উন্নয়ন সেবা ও কল্যাণমূলক এবং

২. নিরাপত্তা ও সংরক্ষণমূলক

প্রথমটিতে রয়েছে ১২টি বিষয় আর দ্বিতীয়টিতে একই সংখ্যা। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। নিম্নেলিখিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ গুলো তুলে ধরা হলো। যেমন-

উন্নয়নমূলক কাজ : প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদকে নানা প্রকার উন্নয়নমূলক কাজ ও প্রকল্প হাতে নিতে হয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করে থাকেন। যেমন-

- রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করে
- রাস্তাঘাটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে
- রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ করে এবং সেগুলো সংরক্ষণ করে
- জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রয়োজন হলে প্রাথমিক চিকিৎসালয় খোলে
- জনসাধারণের জন্য পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং এ উদ্দেশ্যে নলকূপ, পুকুর ও দীঘি প্রভৃতি খনন করে;
- জন্মমৃত্যুর রেজিস্ট্রি করে
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এলাকার জনগণকে সাহায্য করে
- অনাথ ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করে
- কবরস্থান ও শ্মশানঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করে
- ইউনিয়নে পাঠাগার স্থাপন করে
- খেলাধুলার মাঠ ও পার্ক নির্মান করে

কৃষি সংক্রান্ত কাজ : কৃষির উন্নয়নের কাজে ইউনিয়ন পরিষদ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পল্লী অঞ্চলে কৃষিই মানুষের প্রধান পেশা। সুতরাং তাদের উন্নতমানের বীজ সার ও কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ করা ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকদের বিভিন্নভাবে সাহায্য ও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে। প্রয়োজনে পঞ্চবার্ষিকী ও বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেও ইউনিয়ন পরিষদ কৃষির উন্নতির চেষ্টা করে।

রাজস্ব সংক্রান্তকাজ : ইউনিয়নের জনগণের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহ করে ইউনিয়ন পরিষদ সরকারকে সাহায্য করে। স্থানীয় যে সকল কর সেগুলো ইউনিয়ন পরিষদ আদায় করে। তাছাড়া সরকারি রাজস্ব ধার্যের বিবরণ প্রস্তুত করে এবং সেই ভিত্তিতেই সরকার কর ধার্য করে।

শান্তিরক্ষা সংক্রান্তকাজ : প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদ তার নিজস্ব এলাকায় সর্বোতভাবে শান্তিও শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করে। এজন্য সরকার নিয়োজিত চৌকিদার ও দফাদারগণ গ্রামে থাকে। তাছাড়া প্রয়োজন হলে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীন পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন করে ইউনিয়নে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে।

বিচার সংক্রান্তকাজ : প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি সালিসী আদালত আছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এই আদালতের সভাপতি। গ্রামে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও মামলার বিচার এই আদালত করে থাকে। প্রধানত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতাই এসব আদালতের লক্ষ্য।

সেবামূলক কাজ : ইউনিয়নের কোনো লোক বিপদগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করা ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য প্রদান করাও ইউনিয়ন পরিষদের কর্তব্য। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বা অন্য কোনোভাবে কোনো পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তখন তাকে ইউনিয়ন পরিষদ সাহায্য করে থাকে।

সরকারে সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা : গ্রামের জনগণের সংগে সরকারের যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র মাধ্যম হল ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা ও কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদকে অবহিত করে। তখন ব্যাপারগুলো সরকারে গোচরীভূত হয়।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব খুব বেশি। এই ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে মূল্যবান।

প্রথমত : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসনিক সমস্যা ও সমাধান কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে অবহিত হতে পারে।

দ্বিতীয় : স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণকে বৃহত্তর শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ দান করে।

তৃতীয় : এই ব্যবস্থা জনগণের স্থানীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সহায়ক।

চতুর্থ : বর্তমান যুগে বৃহদায়তন রাষ্ট্রে সরকারের কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন। এভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গণতাান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য খুবই প্রয়োজন।

৩.৭ বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

পৃথিবীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মাত্র ২৫ বছরের ব্যবধানে। প্রথমটি ছিল ১৯১৪–১৯১৮ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি ১৯৩৯–১৯৪৫ সাল পর্যন্ত । বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ দুটি ছিল মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিরাট বাধা। সেজন্য যুদ্ধের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী চলেছে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২০ সালে গঠিত হয়েছিল জাতিপুঞ্জ বা লিগ অব নেশনস। কিন্তু বিভিন্ন দেশের স্বার্থ সংঘাতের কারণে এ সংস্থাটি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে গ্রাস করে। এ যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পারমাণবিক বোমার আঘাতে জাপানে দুটি শহর (হিরোশিমা ও নাগাসাকি) সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। মারা যায় কয়েক কোটি মানুষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে বিশ্ববাসী শঙ্কিত ও হতবাক হয়ে যায়। তাদের মনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধে। এছাড়া তারা অনুভব করেন যে, মানবকল্যাণের জন্য যুদ্ধকে পরিহার করতে হবে। দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের শান্তিও সমৃদ্ধি নিয়ে আসতে হবে। ফলে ১৯৪১ সাল থেকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হাতে নেয়। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইণস্টন চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন তেহরানে এক সম্মেলনে সমবেত হন। বিশ্বের ছোট বড় সকল জাতির পরস্পর সহানুভূতি ও সমবায়ের মাধ্যমে সর্বপ্রকার অত্যাচার, নিপীড়ন, দাসত্বের অবগঠন ঘটিয়ে বিশ্বে এক বৃহত্তর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প তেহরান ঘোষণায় প্রকাশ করা হয়। তেহরান ঘোষণার পর জাতিসংঘ গঠনের প্রচেষ্টা চালানা হয় ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওক্স সম্মেলনে। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত জাতিসংঘের একটি সাধারণ সভা, একটি নিরাপত্তা পরিষদ, একটি দফতর ও একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর ভেটো ক্ষমতা নিয়েও এ সম্মলনে আলোচনা করা হয়। অতপর বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৫ সালে ২৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পরবর্তী বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় জাতিসংঘের জন্ম। শুরুতে জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা ছিল ৫০। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। জাতিসংঘের মহাসচিব হচ্ছেন এর প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। নরওয়ের অধিবাসী ট্রিগভেলি ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব। বর্তমান মহাসচিবের নাম হচ্ছে আন্তোনিও গুতেরেস। তিনি পর্তুগালের অধিবাসী। ১লা জানুয়ারি ২০১৭ সালে তিনি জাতিসংঘের মহাসচিবের দ্বায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। পতাকাটি হালকা নীল রঙের মাঝখানে সাদা জমিনের মধ্যে বিশ্বের বৃত্তাকার মানচিত্র রয়েছে। এর দু'পাশ দুটি জলপাই পাতার ঝাড় দিয়ে বেষ্টিত। জাতিসংঘের রয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা। জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার মধ্যে ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, বিশ্ব মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

বিশ্বশান্তিও সহযোগিতার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

১. শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্বশান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশন সৃষ্টি করা।
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা।
৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা এবং
৫. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

জাতিসংঘের নীতি

জাতিসংঘ কতকগুলো নীতি অনুসরণ করে থাকে এ নীতিগুলো নিম্নরূপ-

১. সকল সদস্য রাষ্ট্রকে জাতির মর্যাদা দিতে হবে।
২. চার্টার অনুযায়ী গৃহীত দায়িত্ব সকল সদস্য রাষ্ট্রই পালন করবে।
৩. আন্তর্জাতিক বিবাদ ও বিসম্বাদসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্র মিলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকবে।
৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কেউ বল প্রয়োগ করবে না।
৫. বর্তমান চার্টার অনুযায়ী জাতিসংঘ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলে সকল রাষ্ট্রই যথারীতি সাহায্য করবে।
৬. যে সকল রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য নয় তারাও যাতে জাতিসংঘের নির্দেশ মেনে চলে তা লক্ষ্য রাখতে হবে এবং
৭. কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করবে না।

জাতিসংঘের গঠন

জাতিসংঘের কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ছয়টি প্রধান সংস্থা নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল। এই সংস্থার অধীনে নানা প্রকার শাখা রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শাখাগুলো হলো নিম্নরূপ :

- সাধারণ পরিষদ
- নিরাপত্তা পরিষদ
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
- অছি পরিষদ
- আন্তর্জাতিক আদালত
- জাতিসংঘ সচিবালয়

সাধারণ পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি : সাধারন পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভার মতো। বিশ্বশান্তিও সহযোগিতা রক্ষায় এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য। সাধারণত বছরে একবার এ পরিষদের অধিবেশন বসে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে সদস্যদের ভোটে পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটিমাত্র ভোট দানের অধিকার রাখেন। সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিকশান্তিও নিরাপত্তাসহ মানবাধিকার সংক্রান্তবিষয় আলোচনা করে থাকেন। এছাড়া জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ, নতুন সদস্য গ্রহণ, বাজেট পাস, সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ, বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ পরিষদ সম্পাদন করে থাকে। এ ছাড়াও বিতর্ক ও বিশ্বমনোভাব প্রসার কার্য, শান্তিও নিরাপত্তা সংক্রান্তকার্য, আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্তকার্য, নির্বাচনমূলক কার্য ও তত্ত্বাবধান কার্য ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকেন।

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি : জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ। এটি জাতিসংঘের শাসন বিভাগ স্বরূপ। নিরাপত্তা পরিষদ মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। বাকী ১০টি অস্থায়ী সদস্য। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হলো যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। এরা বৃহৎ পঞ্চশক্তি নামে পরিচিত। অস্থায়ী সদস্যরা প্রতি দুবছরের জন্য নির্বাচিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল যাতে প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে এবং তাদের প্রত্যেকের একটা করে ভোট গণ্য হবে। সাধারণ কার্যপ্রণালী সংক্রান্তব্যাপারে যে কোনো ১১ জন সদস্যের সমর্থন পেলেই যে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারবে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে ৫ জন স্থায়ী সদস্যের ঐকমত্য দরকার হবে। অর্থাৎ এর কোনো সদস্য যদি অমত প্রকাশ করে তখন যে কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ অসম্ভব করে দিতে পারবে এবং এটাকে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা বলা হয়। প্রয়োজন অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বছরের যে কোনো সময় এবং যতবার ইচ্ছা হতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হলো আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা রক্ষা করা। নিরাপত্তা পরিষদ সম্পর্কে জাতিসংঘ সনদের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এই পরিষদ প্রয়োজনবোধে বিবদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বা তদন্তের মাধ্যমে বিবাদের কারণ দূর করে অন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধের বিষয় আন্তর্জাতিকবিচারালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। যে কোনো সময়ে নিরাপত্তা পরিষদ যে কোনো বিবাদ মিটানোর যে কোনো সুপারিশ করতে পারবে এবং জাতিসংঘের সদস্যগণ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত যে কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে বাধ্য থাকবে। আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এরূপ কোনো আশঙ্কা থাকলে নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উক্ত পরিষদ যে কোনো অন্যায়কারী রাষ্ট্রের বিরূদ্ধে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। প্রথমে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সদস্যগণকে অন্যায়কারী রাষ্ট্রের বিরূদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট প্রয়োগ করতে বা তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরাশর্ম দেবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সদস্যগণকে পদাতিক, বিমান ও নৌবাহিনী দিয়ে সাহায্য করার অনুরোধ করবে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরূদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া নিরপত্তা পরিষদ শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কোথাও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। মোট কথা, আন্তর্জাতিক শান্তিও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ এ সংস্থাটি করে থাকে।

সুতারং নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিরাট। জাতিসংঘের সকল সভ্যকেই এ পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ ও কার্যকরী করতে হয়। বর্তমানে রাজনৈতিক শঙ্কা সংঙ্কুল বিশ্বে শান্তিও নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্ব অপরিসীম। নিরাপত্তা পরিষদের বৃহৎ পঞ্চশক্তি নিজেদের প্রভুত্ব, অধিপত্য ও জোট বজায় রাখার 'ভেটো' ক্ষমতার অপব্যবহার না করে আন্তর্জাতিক বিবাদ বিসম্বাদের শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধানে প্রবৃত্ত হলেই জাতিসংঘ তার আদর্শকে বাস্তবায়িত করে বিশ্বশান্তি, ঐক্য ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠন ও কার্যাবলি : বিশ্বকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ পরিষদ গঠিত হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নের এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এটি মোট ৫৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। বছরে কমপক্ষে তিনবার এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট দানের অধিকার আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের মতো শক্তিশালী না হলেও জাতিসংঘের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বিশ্ববাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকারত্বের অবগঠন, শিক্ষার প্রসার এবং বিভিন্ন মানবাধিকারসমূহ কার্যকরী করার জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামজিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবসমাজের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা যায় তাহলে বিশ্বের বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে এবং সংগে সংগে আন্তর্জাতিক শান্তির পথ ও প্রশস্ত হবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজ বিভিন্নমুখী। জাতিসংঘের অন্তর্গত অনগ্রসর জাতিগুলোর মধ্যে জীবনের মানোন্নয়ন, বেকার সমস্যার সামাধান আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রবর্তন, নর-নারী, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দান ও তার রূপায়ণের প্রয়াস প্রভৃতি এ পরিষদের কাজ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তিপত্র প্রস্তুত করে সাধারণ পরিষদের নিকট গ্রহণের জন্য পেশ করতে পারে অথবা আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহবান করতে পারে।

এছাড়াও পরিষদ তার কাজ যাতে সুচারুরূপে পালন করতে পারে তার জন্য কতকগুলো বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো হলো খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বিশ্বস্বাস্থ্য পরিষদ প্রভৃতি। সুতরাং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ভূমিকা ও কার্যক্রম বিশ্বের স্থায়ী মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান এবং জাতিসংঘের এটাই একমাত্র বিভাগ যা সারাবিশ্বে সর্বাধিক আশা ও আস্থার সঞ্চার করেছে।

অছি পরিষদ গঠন ও কার্যাবলি : বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্ত্বা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত, এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। অছি এলাকার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। অছি পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে থাকে। অছিভুক্ত অঞ্চলের উন্নতি এবং এলাকার অধিবাসীদের শিক্ষা প্রদান ও সচেতনাতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই হচ্ছে অছি পরিষদের দায়িত্ব। এছাড়া অছি এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অছি এলাকার জনগণের আবেদন ও অভিযোগ পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া এবং অছি এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা দেখা ও প্রতিবেদন পেশ করা অছি পরিষদের কাজ। এই কাজের জন্য পরিষদকে নিম্ন লিখিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেমন–

- অছি এলাকার অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রশ্নমালা তৈরি করা। এই প্রশ্নমালাকে ভিত্তি করেই শাসনকারী রাষ্ট্রগুলোর বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করা।
- শাসনকারী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং আলোচনা করা। শাসনকারী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আবেদনপত্র সমূহ আলোচনা করা এবং
- শাসনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মাঝে মাঝে শাসিত এলাকা পরিদর্শন করা।
- অছি পরিষদের সাধারণ ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্তগৃহীত হয়। পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি মাত্র ভোট আছে। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের লেকসাকসেস এ অছি পরিষদের প্রথম অদিবেশন বসেছিল।

আন্তর্জাতিক আদালত গঠন ও কার্যাবলি : বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা হয়েছে। এর সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের দি-হেগ শহরে অবস্থিত। এটি হচ্ছে জাতিসংঘের বিচারালয় যা পনেরো জন (১৫) বিচারক নিয়ে এ আদালত গঠিত। বিচারকদের কার্যকালের মেয়াদ নয় বছর। বিচারকগণ আদালতের সদস্য হিসেবে পরিচিত। সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ পৃথকভাবে তাদের নির্বাচিত করে থাকে। বিচারকগণকে তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত করা হয়। সেজন্য তাদের জাতীয়তার প্রশ্ন বিবেচিত হয় না। অবশ্য যাতে বিশ্বের প্রধান প্রধান আইনব্যবস্থা এই আদালতে প্রতিনিধিত্ব প্রায় সেদিকে নজর রাখা হয়। একই রাষ্ট্রের দুই জন বিচারককে একসাথে আদালতের বিচারক নির্বাচন করা হয় না।

সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। জাতিসংঘের যে কোনো সদস্য রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের বিরূদ্ধে অভিযোগ এনে বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার প্রার্থনা করতে পারে। আদালত তার বিচারকার্য দ্বারা বিশ্বশান্তিরক্ষা করে। জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নিয়ে মামলা হলে এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলেও আন্তর্জাতিক আদালত তা মীমাংসা করে। এছাড়া সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ কোনো আইনের ব্যাখ্যা চাইলে তা দিয়ে থাকে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিশ্বসভ্যতা ও আইন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জাতিসংঘ সচিবালয় গঠন ও কার্যাবলি : সচিবালয় জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ। বিশ্বশান্তি সহযোগিতা ও যোগযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব, কয়েকজন উপসচিব, অধঃস্তন সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে এ বিভাগ গঠিত। এর প্রধান কর্মকর্তা হলেন মহাসচিব। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তিনি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সচিবালয় জাতিসংঘের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে। সচিবালয়ের মহাসচিবকে কেন্দ্র করে এর যাবতীয় কাজ আবর্তিত হয়ে থাকে। তিনি সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের মহাসচিব হিসেবে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক আদালত ছাড়া সকল শাখায় লোক নিয়োগের দায়িত্ব ও সকল শাখার অধিবেশন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তার। এছাড়া জাতিসংঘের বাজেট তৈরি, সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, বিভিন্ন শাখার সভা আহ্বান, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন তৈরি, অছি এলাকার রিপোর্ট তৈরি ইত্যাদি কাজ তার নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তকার্যকর করার দায়িত্ব তার। জাতিসংঘের নির্দেশ অমান্যকারী রাষ্ট্রের বিরূদ্ধে তিনি যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন। মহাসচিব আসলে জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সচিবালয়ের অন্যান্যদের সহযোগিতায় তিনি এ ব্যাপক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকেন। সাম্প্রতিকালে মহাসচিব পদের গুরুত্ব অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছে। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেক্রেটারি জেনারেল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করায় জাতিসংঘের দফতরের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। সেক্রেটারি জেনারেল এখন দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে সক্ষম।

জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে তার নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। আবার জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তাবায়নে বাংলাদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কার্যত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিচে এর কয়েকটি গুরুত্বর্পূণ দিক তুলে ধরা হলো–

- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি বাংলাদেশী শরণার্থীকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য দিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ফলে বাংলাদেশ অতি অল্প দিনের মধ্যে জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দু'বার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে, যা দেশের জন্য এক বিরল সম্মান। এছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।
- জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অকৃত্রিম বন্ধুর মতো কাজ করে যাচ্ছে। এসব সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করছে। জাতিসংঘ আমাদের ভাষা ও শহীদ দিবস ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছে। জাতিসংঘের এসব কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ট করেছে।

- ১৯৯১ সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ রেহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জাতিসংঘ ও এর বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে বিপুলভাবে সাহায্য করায় বাংলাদেশ সে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ চলছিল, যা নিয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করে। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ের মধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং এক বিশাল সমুদ্রসীমার উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

- এভাবে জাতিসংঘ বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আমাদের দেশকে সাহায্য করে যাচ্ছে। বাংলাদেশও জাতিসংঘ সনদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল থেকে এর বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্তর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পাল করছে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রম

বাংলাদেশে জাতিসংঘের সবকটি অঙ্গ সংস্থার মিশন আছে। জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ সবসময়ই জাতিসংঘের বিশেষ নজর পেয়ে থাকে। জাতিসংঘের সবকটি অঙ্গ সংস্থা সেই শুরু থেকেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে। জাতিসংঘের ৪ জন মহাসচিব ৫ বার বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের আর্থিক অবদান কম হলেও বাংলাদেশের সৈন্যরা প্রাণ উৎসর্গ করে শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। এছাড়া জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে বাংলাদেশ এই বিশ্ব সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭৯–৮০ এ সময়ে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে বাংলাদেশের নির্বাচন তার এ ভূমিকার স্বীকৃতি এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের আস্থার স্বাক্ষরবাহী। ১৯৮৪ সাল থেকে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালীতে বাংলা ভাষার ব্যবহার আমাদের জন্য খুবই গৌরবের এবং ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তার এই সভাপতি নির্বাচিত হওয়া বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের বিশেষ ভূমিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় জাতিসংঘ ঘোষিত নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ক দীর্ঘকালের সমস্যা এবং পার্বত্য চট্রগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের সফল হয়েছে। বাংলাদেশে জাতিসংঘের নিম্নোক্ত অঙ্গসংস্থাগুলো কাজ করছে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) : বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক অর্থাৎ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ইউএনডিপি মিলেনিয়াম উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ৮টি।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) : দেশের সুবিধা বঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ কাজ করছে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) : বাংলাদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সংস্থাটি কাজ করছে।

জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা (FAO) : বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা কাজ করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) : স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। যেমন– বাংলাদেশের পোলিও নিবারণের জন্য শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরণের ঔষধ খাওয়াচ্ছে এবং টিকা দিচ্ছে।

উদ্বাস্ত বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের কার্যালয় (UNHCR) : বাংলাদেশ মায়ানমার রোহিনঙ্গা ইস্যুতে এই কার্যালয় মধ্যস্থতা করছে। বিশাল শরণার্থী পালনের খরচেও অবদান রাখছে। তাছাড়া বাংলাদেশে বিহারী জনগোষ্ঠীর আবাসনসহ অন্যান্য ইস্যুতে এই সংস্থা ব্যাপক অবদান রেখেছে।

জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল (UNIFEM) : বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি পালন করছে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট করছে। বাংলাদেশের নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও এ সংস্থা কাজ করছে।

জাতিসংঘে জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল (UNFPA) : এই সংস্থাটি বাংলাদেশের জনসংখা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কাজেই আমরা দেখি বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘের কার্যাবলি খুবই প্রশংসনীয়।

বিশ্ব শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা

চিত্র : বিশ্ব শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর অন্যতম সদস্য দেশ। শুরু থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর কর্মকাণ্ডে সমর্থন জানাচ্ছে ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। সর্বপ্রথম ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণ করে। নামিবিয়াতে দুটি শান্তিরক্ষার অপরেশনে অংশগ্রহেণের জন্য তাদের পাঠানো হয়। ইরান যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সেনাসদস্যরা কুয়েত ও সউদি আরবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজে অংশ নেয়। তখন থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ২৫টি দেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষাকারী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে প্রায় ১১,০০০ সেনাসদস্য পাঠিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ১২টি দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশি সেনা সদস্যরা কর্মরত আছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান খুবই গৌরবের। এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কমাণ্ডার হিসেবে ও উর্ধ্বতন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশের ভূমিকার আরেকটি স্বীকৃতি, যা দেশের মর্যাদাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিবিসি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের "The cream of UN peacekeepers" বলে আখ্যায়িত করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছে। ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ হচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের এ অবদান আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

উপসংহার : বাংলাদেশ জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দেশ। এদেশে জাতিসংঘের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ এ শান্তিস্থাপন কার্যক্রমে বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণ করেছে। জাতিসংঘের শান্তিমিশনে বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান এবং পুলিশ বাহিনীর অবদান কালজয়ী হয়ে আছে।

৩.৮ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি

বাংলাদেশ মিশ্র অর্থনীতির দেশ। এ দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্ষীয়মান আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদমুখী বলা যেতে পারে। বাংলাদেশ একসময় ছিল সমৃদ্ধ অর্থনীতির জনপদ। কিন্তু প্রায় সোয়া দু'শ বছরব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণে বাংলাদেশকে নিঃস্ব করেছে। সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশ পশ্চিম ইউরোপের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোর মতোই সম্পদশালী ছিল। সম্ভবত তখন বাংলাদেশের মাথাপিছু বাস্তব আয় ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালির মাথাপিছু বাস্তব আয় থেকে বেশি ছিল। গ্রামগুলো স্বাভাবিক পণ্য বিনিময়ে স্বনির্ভর ছিল। কৃষিতে উদ্বৃত্ত ছিল। বিকাশমান বণিক শ্রেণির প্রাচুর্য, সম্রাটদের বিলাসী চাহিদা নিম্নমানের শ্রম-উৎপাদনশীলতার কারণে পুনরুৎপাদন সম্ভব ছিল না। ফলে এ অঞ্চলে পুঁজিবাদ বিকশিত হতে পারেনি। পনেরো, ষোল ও সতেরো শতকে ইউরোপের বহু পর্যটক বাংলাদেশকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে ও বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল বলে বর্ণনা করেছেন।

ব্রিটিশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এ অঞ্চলের লুণ্ঠিত সম্পদ। পরবর্তীকালে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয় বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডটি। যুদ্ধে বিধ্বস্ত লুণ্ঠিত অর্থনীতি, ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিপুল জনসংখ্যার চাপ, সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষতার কারণে যদিও বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি তারপরও অফুরন্তপ্রাণশক্তির অধিকারী এদেশের কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতা, স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের কল্যাণে পোশাক শিল্পের প্রসার, মানব সম্পদ রপ্তানি এবং বর্তমানে অগ্রসরমান বেসরকারি খাতের প্রসার বাংলাদেশের অর্থনীতিকে করেছে সমৃদ্ধ। দারিদ্র্য বিমোচনসহ জাতিসংঘ ঘোষিত MDG (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) অর্জনে বর্তমানে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে বিশ্বসভায় সমাদৃত।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ

যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে সংঘটিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টিগত অবদানই দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলে। এসব ভিত্তিকে অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কাঠামো বা খাত বলা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কাঠামো বা খাতকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

উৎপাদনভিত্তিক খাত

উৎপাদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
(ক) কৃষি(খ) শিল্প ও (গ) সেবা।

(ক) কৃষি খাত

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত হলো কৃষি। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ খাতের অন্যান্য উপখাত হলো– ফসল, পশুসম্পদ, মৎস্য সম্পদ এবং বনজ সম্পদ। গত কয়েক বছর ধরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে।

দেশজ উৎপাদনে কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির হার ও অবদান

খাত/উপখাত	২০০৫/০৬	২০০৭/০৮	২০১১/১২	২০১৩/১৪
শস্য ও শাকসবজি	৬.১৭ (১১.১০)	৩.৯৯ (১০.৮৮)	১.৭৫ (১০.০১)	৩.৭৮ (৯.২৮)
প্রাণি সম্পদ	২.১৫ (২.৩৮)	২.২০ (২.১৯)	২.৬৮ (১.৯০)	২.৮৩ (১.৭৮)
বনজ সম্পদ	৫.৪৬ (১.৮৬)	৫.২৬ (১.৮২)	৫.৯৬ (১.৭৮)	৫.০১ (১.৭৪)
মৎস্য সম্পদ	৫.৭৫ (৩.৬৭)	৭.০০ (৩.৭৯)	৫.৩২ (৩.৬৮)	৬.৩৬ (৩.৬৯)

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (অবদান)

(খ) শিল্প খাত

উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী স্থির মূল্যে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান ২০১২–১৩ অর্থবছরে ২৯ শতাংশ যা ২০১৩–১৪ সালে ২৯.৫৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৪–১৫ অর্থবছরে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান ৩০.৪২ শতাংশ। জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এরূপ ১৫টি খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এ চারটি খাত এর সমন্বয়ে সার্বিক শিল্পখাত গড়ে উঠেছে।

(গ) সেবা খাত

অর্থনৈতিক কর্ম যা অবস্তুগত ও অদৃশ্যমান এবং যা মানুষের অভাব পূরণ করে এবং যার জন্য বিনিময় মূল্য দিতে হয়, তাকে সেবা বলে। ২০১৪–১৫ অর্থবছরের জিডিপিতে সার্বিক সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫৩.৬২ শতাংশ যা ২০১৩–১৪ অর্থবছরে ছিল ৫৩.৯৫ শতাংশ। সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের জিডিপিতে অবদান সর্বোচ্চ যা ২০১৪–১৫ অর্থবছরে ১৪.১২ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৩–১৪ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১৪.১০ শতাংশ।

মালিকানাভিত্তিক খাত

মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

(ক) সরকারি খাত ও (খ) বেসরকারি খাত

(ক) সরকারি খাত

বর্তমানে সরকারি খাতের আওতায় তথা সরকারি মালিকানায় পরিচালিত নিম্নোক্ত খাতসমূহ বিদ্যমান:

শিল্পখাত, বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানি খাত, পরিবহন ও যোগাযোগ খাত, বাণিজ্য খাত, কৃষিখাত, নির্মাণখাত, সার্ভিস খাত, ২০১২–১৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নিট লোকগঠন ছিল ২৬০৪.৭৩ কোটি টাকা।

(খ) বেসরকারি খাত

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে সমস্ত খাত বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয় সেগুলোকে বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুক্ত বাজার ও বেসরকারি খাতের গুরুত্বক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫–১৬ অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপির ২৯.৩৮ শতাংশ যার মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ২১.৭৮ শতাংশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা

বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারি খাতে যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে প্রবৃদ্ধির হার গত এক দশক যাবত ৬ শতাংশের ঘরে ওঠানামা করছে। মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রায় মান, গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা তুলে ধরা হলো–

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

১৯৯৫/৯৬ সালে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার ছিলো যথাক্রমে ৬৩.২, ৭.৫ এবং ১২.০ শতাংশ যা ২০১৩ সালের লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার ৪৫.১ শতাংশ এবং অকৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার ৫৪.৯ শতাংশ। তথ্য হতে লক্ষ করা যায়, কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার হ্রাস পেলেও শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষি উৎপাদন

কৃষি উৎপাদনের গতিধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ কৃষিখাতে অভাবিত সাফল্য অর্জন করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মে.টন)

বছর	১৯৮০-৮১	১৯৯০-৯১	২০১২-১৩	২০১৪-১৫
মোট খাদ্যশস্য	১৪৯.৭	১৮৮.৬	৩৭২.৬৬	৩৮৪.১৯

শিল্প উৎপাদন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প খাতের অবদান এবং উন্নয়নের গতিধারা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগনের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এসবক্ষেত্রে শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প তথা মোট শিল্পখাত হতে উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি হয়। যেমন-

বছর	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
মোট প্রাপ্তি (কোটি টাকায়)	৫৪.১১ (৭.৩)	৭২৮২.৩ (৫.৩)	১৩২৯৯৪.১ (১০.৩১)	১৪৪৬৫৩.৪ (৮.৭৭)

গত দেড় দশকে অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি খাত অপেক্ষা বেসরকারি খাতের অবদান ছিল বেশি।

প্রকৃত GDP ও প্রবৃদ্ধির হার

বিপুল জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র বাংলাদেশ এর অভ্যুদয় হতে মোট দেশজ উৎপাদন এর আয়তন, মাথাপিছু GDP প্রবৃদ্ধির হার সবই ছিল স্বল্প, সন্তোষজনক নয়। অবশ্য এর পিছনে অনেক কারণ দায়ী, যেমন অদক্ষ কর ব্যবস্থা, কর-প্রশাসন, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির হার, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি, শিক্ষার অভাব এবং বেকারত্ব। প্রকৃত জিডিপি এবং প্রবৃদ্ধির হারের গতিধারা নিম্নে দেখানো হলো–

প্রকৃত জিডিপি এবং প্রবৃদ্ধির হার

বছর	জিডিপি	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৬-০৭	৫৪৯৮০০	৭.০৬
২০১০-১১	৯১৫৮২৯	৬.৪৬
২০১১-১২	১০৫৫২০৪	৬.৫২
২০১৩-১৪	১১৯৮৯২৩	৬.০১
২০১৫-১৬*	১৭২৯৫৬৭	৭.০৫

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা: ২০১৬ (*সাময়িক হিসাব) ভিত্তি বছর: ২০০৫–০৬

সূচি থেকে বোঝা যায় জিডিপি এর পরিমাণ ক্রমাগত বাড়লেও প্রবৃদ্ধির হার মাঝে মধ্যে স্বল্প ছিল। ২০০৮–১০ সময়ের বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার কবলে পড়লেও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৬% এর অধিক ছিল।

মূল্যস্ফীতি

মূল্যস্ফীতির গতিধারা সর্বদাই ছিলো অনিশ্চিত। এটি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে সৃষ্ট। নিম্নের সারণীতে এর গতিধারা তুলে ধরা হলো–

বছর	মূল্যস্ফীতি
১৯৯৪-৯৫	৫.২
১৯৯৫-৯৬	৪.১
২০১৩-১৪	৭.৩৫
২০১৫-১৬ (জুলাই এপ্রিল ২০১৬)	৬.০১

সূত্র: বা অর্থ. সমীক্ষা ১৯৯৭, ২০১৬

মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্যের মূল্যের পরিবর্তন, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগঠন, অনুৎপাদনশীল খাতে অতিরিক্ত ঋণের প্রবাহ, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যুদ্ধ পরিস্থিতি, মন্দা আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে মূল্যস্ফীতির গতিধারা পরিবর্তিত হয়। অর্থনীতিতেও অস্থিরতা তৈরি হয়।

তৈরি পোশাক শিল্প

পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অতি সম্ভাবনাময় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্রুত বিকশিত শিল্প। ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি শুরু হয়। দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী আয়ের প্রায় ৭৫% থেকে ৮২% শিল্প হিসেবে এই শিল্প বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করেছে। পোশাক শিল্পের বিকাশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত আছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ২কোটির অধিক লোক এর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ঘটেছে। ২০০১–০২ অর্থবছর হতে ২০১২–১৩ পর্যন্ত কাপড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ২০৫০ হতে ৭৪০০ মিলিয়ন মিটার পর্যন্ত যা সম্পূর্ণভাবে যোগঠন দিয়েছে বেসরকারি খাত। বাংলাদেশে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পোশাক শিল্প বাংলাদেশের সনাতনী রপ্তানি আয়ের খাতগুলোকে পিছনে ফেলে বর্তমানে বৃহৎ উৎসে পরিণত হয়েছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া নারী শ্রেণির এ শিল্পে কাজ করার সুযোগ থাকায় এ শিল্পের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্প থেকে মোট রপ্তানি আয় ছকের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হলো–

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সাল	২০০৪-০৫	২০০৯-১০	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
রপ্তানি আয়	৬৪১৭.৬৭	১২৩৪৮	২১৫১৬	২৪৪৯২	২৫৪৯২

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬

২০১৫ সালে বাংলাদেশ ২৬০০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। এক্ষেত্রে চীনের পরেই বাংলাদেশ এর স্থান। এ পোশাক রপ্তানি আয় বাংলাদেশের জিডিপি এর ১৪শতাংশ এবং মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশ। ২০১৬ সালে পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১০% এর অধিক ছিল।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের পদক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে দেশের জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা চিকিৎসা সুবিধা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দক্ষ মানবগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলাকে বোঝায়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসাধারণকে দীর্ঘসময় ব্যাপী, সুস্বাস্থ্যময় এবং পরিপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান করা উচিত। এজন্য সমাজে নারী ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসন অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ-

শিক্ষা

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভুক্ত খাত হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য উপযুক্ত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়েছে। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে যে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তম্মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রম, মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০ সাল হতে ১০০% নতুন বই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সমগ্র দেশে বিতরণ করছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্তগ্রহণের ফলে এ হার বর্তমানে প্রায় ৬৪.৯শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষা বৈষম্য কমিয়ে আনতে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই এরূপ উপজেলায় একটি করে উচ্চ বিদ্যালয়কে মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-লার্নিং চালু করার লক্ষ্যে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ স্থাপন, আইসিটি ল্যাবসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলছে। তাই শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন-২০১১ অনুমোদিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

স্বাস্থ্য সংবিধান স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকার। এ মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য খাতকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১, জাতীয় ঔষধ নীতি যুগোপযোগী করা হয়েছে। শিশু মৃত্যুহ্রাসে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (সিডিডি) এবং শ্বাসতন্ত্রর মারাত্মক সংক্রমণ (এ আরই) প্রতিরোধ কর্মসূচিসমূহ স্বাস্থ্য উন্নয়নখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সকলের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ১৩ হাজার ৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকার যুগোপযোগী জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করেছে। এ নীতির লক্ষ্য হলো বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিশ্চিত করা। চিকিৎসা সেবায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ই হেলথ কর্মসূচিসহ, মাতৃদুগ্ধপান সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ বাস্তবায়নের পদেক্ষপ নেয়া হচ্ছে।

নারী উন্নয়ন

নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুমোদিত হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বৈদেশিক সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্য বলতে একটি দেশের জরুরি প্রয়োজনে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খাদ্য, ওষুধ, প্রকল্প, দান, অনুদান, ঋণ, আর্থিক ও কারিগরি যে কোনো ধরনের দেশ বহির্ভূত সহায়তা গ্রহণ এবং প্রদান উভয়কে বোঝায়। বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। ২০১৪–১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অনুদান (৫৫৭), ঋণ (২৪৭২)সহ মোট ৩০২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার গ্রহণ করে। এ থেকে ১৮৮ (সুদ), ৯০৯ (আসল) সহ মোট ১০৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আসল ও সুদ পরিশোধ করে। বাংলাদেশে বর্তমানে এখনো ৩১.৫০ ভাগ লোক দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। জাতীয় সঞ্চয় জিডিপি এর ২৯.০১ ভাগ। মোট উন্নয়ন পরিকল্পনায় এখনো প্রায় অর্ধেক অপেক্ষা বেশি বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা মেটানো হয়। যেমন উন্নয়নের লক্ষ্যে যেরূপ বিনিয়োগের প্রয়োজন তা দেশিয়ভাবে সংস্থান করা সম্ভব হয় না বিধায় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য বাংলাদেশকে প্রতি বছর ঋণ সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ঘাটতির ফলে খাদ্য আমদানি করতে হয়। যে পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত হয় তা দ্বারা ব্যাপক চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

রেমিট্যান্স

প্রবাসে কর্মরত বাঙালি জনগোষ্ঠীর শ্রমে উপার্জিত অর্থের প্রবাহ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অনেকাংশে বাঁচিয়ে রেখেছে। মধ্যপ্রাচ্য, সৌদি আরব, কাতার, মিশর, লিবিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশিরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০০৮ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। ২০০৯ সালে তা ৮ম স্থানে পৌঁছায়। ২০১২–১৩ অর্থ বছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১১১২১.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে ২০১৫–১৬ অর্থ বছরে রেমিটেন্সের প্রবাহ কিছুটা কমেছে। ২০১৫–১৬ সালে প্রবাসী বাঙালিরা ১২২৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেশে প্রেরণ করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতিবন্ধকতাসমূহ-

- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশ প্রতিবছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। ফলে ফসলাদি, বাড়িঘর বিপর্যস্ত হয়। পর্যাপ্ত ফলন হলেও এ সমস্ত কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি সংকটে পতিত হয়।
- **শিল্পে বিনিয়োগ :** প্রায়শই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রতিযোগিতা, মূলধনী শিল্পের কাঁচামালের অভাব আমদানি-রপ্তানি জটিলতাসহ বিভিন্ন কারণে বাঙলাদেশে বৃহৎ ও মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত শিল্পোন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে।
- **গার্মেন্টস শিল্পে প্রতিবন্ধকতা :** গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় উন্নয়নমুখী খাত। কোটা পদ্ধতি বিলোপ, স্বল্প মজুরি, শ্রমিক অসন্তাষ, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের অভাব ইত্যাদি কারণে গার্মেন্টস শিল্পে নানা সমস্যার উদ্রেক হয়।
- **অব্যাহত জনসংখ্যার চাপ :** বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এ বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে সম্পদে পরিণত করতে না পারলে অর্থনীতির উপর ক্রমশই চাপ সৃষ্টি হবে যা ভবিষ্যতের জন্য সংকটময়।
- **বৈদেশিক সাহায্য :** বাংলাদেশকে অব্যাহতভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ঋণ শোধ করতে হয়। সাহায্য নির্ভরতা না কমানো গেলে অর্থনীতিতে ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পাবে এবং সংকট তৈরি হবে।
- **মূল্যস্ফীতি ও পুঁজি বাজারের অস্থিতিশীলতা :** মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনুৎপাদনশীলখাতে ঋণের প্রবাহ অনেক সময় অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি করে। এছাড়া শেয়ার বাজারের পতন ও অস্থিতিশীলতা শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব তৈরি করে। যা অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ।
- **শরণার্থী সমস্যা :** মিয়ানমারের সংঘটিত রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিতাড়নের ফলে প্রায় ৫ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চাপ তৈরি করছে।

  বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চাপ ও সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত। বাংলাদেশ এক ধরনের প্রান্তিক পুঁজিবাদের দেশ হিসেবে অর্থনৈতিক পরিচিতি লাভ করেছে। যতটুকু সঞ্চয় আছে সেটা বাণিজ্যে। নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক গতিধারাকে সচল রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে চলেছে।

৩.৯ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোর পূণর্গঠন বা রূপান্তরকে বুঝায়। একটি বিশেষ সামাজিক রূপ থেকে অন্যরূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে। এর সংজ্ঞার্থ হলো, সমাজ-কাঠামো (সমাজের আয়তন এর অন্তর্ভুক্ত) অথবা বিশেষ বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন। তবে সামাজিক গতিশীলতার কারণে পৃথিবীর প্রায় সব সমাজই কমবেশি পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সমাজের এ পরিবর্তন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সংগেও জড়িত। জ্ঞান, শিল্পকলা, বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভাবনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, পেশাগত পরিবর্তন ধর্মীয়, নৈতিক প্রভৃতি নানবিধ কারণে সমাজ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানিগণ পরিবর্তনকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ''By Social change I understand a change in social structure e.g. the size of the society, the composition or balance of its parts or the type of its organizations (Morris Ginsberg)

Social change in the alteration in patterns of social structure, social institution and social behaviour over time (Robertson 1980, P-568).

Social change refers to the modificaitons which occur in the life patterns of people (Koenig P-270)
অতএব বলা যায় সমাজের আকার, এর অংশের গঠনের বা ভারসাম্যের বা সাংগঠনিক ধরনের পরিবর্তন যা আবার মানুষের জীবন ধারাকে পরিবর্তন করে তাই সামাজিক পরিবর্তন। বৈশ্বিক সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় সমাজের আদিম অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে আধুনিক সমাজের দিকে যে অগ্রগতির প্রক্রিয়া সেটি কোনো সমাজে বিপ্লবের, সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা ধীরে ধীরে রূপান্তরের মাধ্যমে ঘটেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সনাতন সমাজ থেকে আধুনিক শিল্পসমাজে রূপান্তরের বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। মূলত সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিকীকরণ তত্ত্বের সম্পর্ক নিবিড়। Smith 1996:3 দেখান যে, Moderization theory has its roots [3] assical evolutionary explanations of social change. এ বুদ্ধিবৃত্তিক ধারায় অগাস্ট কোঁতে (August counte), এমিল দুর্খাইম, হাবার্ট স্পেন্সার এবং অবশ্যই কাল মার্কসের কথা বলতে হবে। সামাজিক পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণের ধারায় WW Rustow, Lucian W pye, E.B Taylor, Talcot Parsons samuel P Huntington, CE Black, Vilfredo Pareto, Mosca, Mishell এর নাম উল্লেখযোগ্য। আধুনিকীকরণ তাত্ত্বিকদের মতে, পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহ যে প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ও অগ্রগতি লাভ করেছে উন্নয়নশীল দেশসমূহ সে প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন লাভ করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক।

This is the process of profound social change in which tradition bound village of tribal based societies are complled to react to the pressures and demands of the modern industrialized and urban centered world.(Lucian wpye) পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকগণ সামাজিক পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ কে স্বতন্ত্রভাবে দেখান নি। তারা মনে করেন সনাতন সমাজ ভেঙে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ, বিজ্ঞান চেতনা, যুক্তিবাদি দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক সম্পর্কায়নে কুসংস্কারমুক্ত, সরকারি কার্যক্রমে ন্যায়পরায়ণ জাতি রাষ্ট্রের বিশ্বাসের মতো অবদান নিয়ে যে সমস্ত রাষ্ট্র উপ-পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয় সে সমস্ত সমাজেই পরিবর্তন ঘটে। তারা মনে করেন সামাজিক পরিবর্তনের সংঙ্গে আরও কিছু বিষয় সম্পর্কায়িত। যেমন– ভৌগোলিক পরিবর্তন, জনসংখ্যা, নেতৃত্ব, শিল্পায়ন, নগরায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ধর্মীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনশীল সাংস্কৃতিক চেতনা ও আন্তর্জাতিক উন্নত সম্পর্কের ধারা। একটি সমাজে সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবদানসমূহের পরিবর্তন ঘটে স্বভাবত আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিবর্তনমুখি প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রুত পরিবর্তনশীল কর্মসম্পাদনের উপযোগী হয়ে ওঠে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ উন্নত জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। সামাজিক পরিবর্তনকে সামাজিক গতিশীলতাও (Social mobiliy) বলতে পারে। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের তাত্ত্বিকরা আবার তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক পরিবর্তন এ ধারাকে চ্যালেঞ্জ করেন। Poor countries had no just been left in an undeveloped state by the imperial powers, they were still being underdevloped by metropoliton centers that deserved to be regarded as imperialist (AG Frank).

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন এ ধারারই অংশ। এশিয়ায় সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া পৃথিবীর উন্নত অঞ্চলগুলোর মতো নয়। বিশেষত উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের কারণে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কৃতি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ভিন্ন । বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার সাথে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ উপনৈবেশিক শাসনের পূর্বে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী এবং তার ভিত্তি ছিল এক অনড় সমাজ কাঠামো। যে কোনো দেশের সমাজ কাঠামো নির্ভর করে সেদেশের সামাজিক অর্থনীতি বা সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির উপর। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান উপাদান ছিল ভূমি কিন্তু ভিত্তি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ। রাষ্ট্রের প্রধান অথনৈতিক উৎস ছিল গ্রাম। গ্রামসমাজের শাসনতন্ত্র ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ছিল। ভারতের যে সব জায়গায় এদের গঠন-প্রণালী অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ ছিল সেখানে জমি চাষ করা হতো যৌথভাবে ও পরে ফসল বণ্টন করে দেওয়া হতো সবারে মধ্যে। রাজনৈতিক আকাশের ঝড় কোনোদিন এই গ্রামসমাজে অর্থনৈতিক কাঠামোকে স্পর্শ করেনি। অর্থনীতির অপরিবর্তনীয় অস্তিত্ব এবং সমাজের বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের প্রভাবে এ অঞ্চলে কোনো শক্তিশালী পুঁজিপতি শ্রেণিও গড়ে ওঠেনি। ভারতের শহরগুলো মূলত প্রশাসনিক কেন্দ্র আর গ্রামগুলো উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। শহরের সংগে বাণিজ্যিক যোগ ছিল না বললেই চলে। সেন, পাল, মৌর্য বা মোঘলদের সময় ভারতে নগরের বিকাশ ঘটে নি। জাতীয়তা ধ্যান ধারণাও সৃষ্টি হয়নি। ভারতবর্ষে পরিবর্তনের সূচনা হয় বৃটিশ শাসনের সময়। কারণ তারা এদেশে এসেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন আমলে সামাজিক জীবনে একটি শহরে শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মোট কথা ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত বাঙালি সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে মুসলমানরা এমনকি নিম্নবিত্ত মুসলমানরাও বিশেষত বাংলাদেশের কৃষকরাও নিজেদের অধিকার আদায়ে পাকিস্তান আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। মুসলমান কৃষকরা ভেবেছিল স্বাধীন পাকিস্তানে উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক হবেন এবং সামাজিক ক্ষমতাও তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কিন্তু ভারত পাকিস্তান বিভক্তির পর অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিক শোষণের অভিপ্রায় পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠী সামাজিক জীবনে সামাজিক শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি শাসকশ্রেণি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি, ব্যবসা, শিল্পের কিছু প্রসার ঘটালেও গ্রাম ও শহরের সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেনি। শাসন ক্ষমতা যেহেতু পশ্চিমা শাসকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফলে বাঙালি মুসলমান শ্রেণি পুনরায় পশ্চাৎপদ থেকে যায়। পূর্ববঙ্গ মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া বাজারে পরিণত হয়। শিক্ষা বেসামরিক চাকরি ও সমাজ কল্যাণে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্বপাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যকেই প্রকট করে। ভাষাগত ভিন্নতা এবং স্কুল কলেজের অভাব সে সময়কার জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। সমাজ জীবনে গতিশীলতা অর্জন কিংবা রাজনৈতিক চেতনার বিষয়ে তাদের চিন্তাভাবনা ও দরদর্শিতা তেমন ছিলনা। বর্ণ, জাতি, ধর্মভেদ ছিল। শ্রেণিভেদও ছিল। ফলে গ্রামীণসমাজের করপোরেট জীবনযাত্রা ছিল না। তবে ব্রিটিশ শাসক এবং পশ্চিমা শাসকদের সময়কালে এ অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষা, শিল্প সংস্কৃতির উন্নতির ফলে গোঁড়া ধর্মীয় চিন্তাভাবনায় কিছুটা পরিবর্তন আসে। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের আংশিক ছোঁয়া তৎকালীন সমাজে ঢেউ তোলে। রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার প্রসারে সমাজ জীবনেও পরিবর্তনের সূচনা হয়। বিশেষত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা গরিব পাটচাষীদেরও পরিবর্তনমুখী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাঙালিরা তাদের সামাজিক জীবনের ব্যাপক বৈষম্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতা, প্রগতি, উন্নয়নের আলোয় তারা পশ্চিমা শাসনের বিরোধিতা করে। বলা যায় বাঙালি তার সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক ক্ষমতা অর্জনের প্রত্যাশি হয়ে উঠছিল। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডের মানচিত্র বদলে বাংলাদেশের জন্ম হয়। শুরু হয় বাঙালির নতুন জীবনধারা ও চিন্তাচেতনা।

বাংলাদেশ সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

১৯৭১ সনের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি দীর্ঘকালীন পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ও জীবনধারণের চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া এসময়ই ঘটে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্য প্রবাহের ব্যাপক উন্নতি। বাংলাদেশের মতো স্বাধীন দেশগুলো দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। মূলত একটি সনাতন কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ আধুনিক সমাজের দিকে যাত্রা শুরু করে। বর্তমান বিশ্বে মানুষের আচার -আচরণ মূল্যবোধ পদমর্যাদা, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। আর এ পরিবর্তন দ্রুতগামী । কারণ তথ্য ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর গতি মানুষের জীবনকেও গতি এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের সমাজেও পরিবর্তনকে সাথে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। গতিশীল সমাজের সামাজিক পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। ১৯৭২ সনে সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রর মত মতাদর্শ, নিয়ে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু গণতন্ত্রর দোরগোড়ায় পৌঁছতে বাংলাদেশকে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা বারবার বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈপরিত্যের সৃষ্টি করে। ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তন, সামরিক ও কর্তৃত্ববাদী শাসন রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে যেমন পরিবর্তন করে তেমনি সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করে।

Hamza a Alavis assertation regarding brvecratic military oligarchy এ ধরনের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা সামাজিক উন্নয়নকে vulunarable করে তোলে। বারবার সংবিধানের মূলনীতির মতাদর্শগত পরিবর্তন এবং ধর্মভিত্তিক চিন্তার প্রসারতা আধুনিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকশিত করতে দেয়নি। Jahangir 2002 said that fundamentalism is a product of and recreation of modernity. It is indecd a counterforce to modernization process.

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন কোনো একটি উপাদানের ওপর নির্ভর করে না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ধরনের বিষয় সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পুনর্গঠন এবং ৭৫ এর পটপরিবর্তনের পর দীর্ঘ সময় অর্থনীতিতে বৈদেশিক নির্ভরতা, আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতি, শিল্পে অনগ্রসরতা, কর্ম সংস্থানের অভাব, মেধা স্থানান্তর বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে দারিদ্র, অসমতা, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও জনঅসন্তোষ বিরাজিত ছিল।

Politics of Bangladesh is intensely factional-fission; fusion and protefiration are pervasive aspects political culture. Two main structural features of the political culture of Bangladesh are patron clientism and neo partimonalism (Khan, Islam and Haque, 1996) সংকীর্ণ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সমাজ ও সাময়িক গতিশীলতাকে রুদ্ধ করেছে। ফলে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘ সময় সামরিক শাসন কালে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, পশ্চাৎপদতা এবং সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অভাব সমাজ জীবনকে দ্বন্দ্বমুখর, উন্নয়নবিমুখ করে তোলে।

Inclusion of new client category in development discourse has been brought into the space of visibility: Peasents, women and the Enviourment. It is reflected in new practice of vission and knowledge like panopatic gaze and as on appratous of social control (Escobar, 1995:5).

বাংলাদেশ সমাজে সামরিক আধিপত্য ও বিভিন্ন মতদার্শগত ভিন্নতায় সংবিধানের মৌলনীতিতেও বারবার পরিবর্তন এসেছে। এর প্রভাব সামাজিক জীবনেও পড়েছে। '৯০ এর অভ্যুত্থান পরবর্তী সময় থেকে রাজনীতিতে গণতন্ত্র উত্তরণ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ভিন্ন মোড় নেয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার পরেও বাংলাদেশ উন্নত জীবন ও সমাজের দিকে অগ্রসর হয়।

বর্তমান বাংলাদেশ উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ধীরে ধীরে মধ্যম আয়ের দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের একটি মাইলফলক। শহর গ্রাম ভেদে স্কুল, কলেজ, অফিস আদালত তথ্য প্রযুক্তির সেবার মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ড সহজ হচ্ছে। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল সেক্টরকে তথ্যপ্রযুক্তি সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে SDG (Sustainable Development Goal)-এর অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০৪১ সালের বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নতকরণের প্রচেষ্টা বাংলাদেশের মানুষের সমাজ জীবনকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ তার বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতাকে অনেকাংশেই কমিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। আমদানি রপ্তানি বানিজ্যেও ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন বাংলাদেশের সমাজে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবর্তন তৈরি করছে। মানুষ ধর্ম বিশ্বাসে অটল কিন্তু অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী।

বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ একই ধরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অগ্রসর হয়ে যেমন—স্বল্প আয়, দুর্বল ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পায়ন অনগ্রসরতা, সামাজিক বঞ্চনা, অসাম্য, নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ও সিভিল স্বাধীনতা। নিচের উপাদানগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ (Smith 1996:1).

(১) সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা (২) সম্পদের বৈষম্য (৩) মতাদর্শগত পার্থক্য (৪) তৃতীয় বিশ্বের আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব (৫) দেশের ভেতরকার দারিদ্র

The dual economy, the precariousness of the cash sector, big form small country, exploitation, development without exployment, corruption domestic service, disparities within poor countries etc (Gold thorpe 1975:4) .

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা করতে হলে দুটি বিশেষ ধারাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এর পূর্বেও আমরা দেখেছি সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় গ্রামীণ ও নগরে সমাজ দুটোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরে সমাজের পরিবর্তনের মাধ্যমেই সামাজিক পরিবর্তনের ধারাকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শহরাঞ্চলে পরিবর্তন

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে শহরাঞ্চলের প্রসার ও পরিবর্তন ঘটে। উন্নত জীবনযাপনের আশায় গ্রাম থেকে শহরে জনসমাগম ঘটে। শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ সামাজিক জীবনের নানাবিধ সুবিধা প্রাপ্তির আশায় মানুষ শহরমুখী হয় এবং শহরাঞ্চলের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে শহরাঞ্চলে দ্রুত শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হলেও শহরাঞ্চলে কিছু শিল্প কলকারখানার স্থাপন বিশষত গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ, ক্ষুদ্র শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে শহরের অর্থনীতি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করছে, ফলে জনসংখ্যার বাড়তি চাপ ও শহরকে বহন করতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক যোগাযোগ জনগোষ্ঠীকে বিশ্ববাণিজ্যের সাথে সাথে বিশ্ব সমাজের সাথে সংযুক্ত করেছে। শহরের আয়তন ক্রমশই বাড়ছে। সাথে সাথে কমছে শহরতলির কৃষিজমি। তথ্যপ্রবাহের অবাধ প্রবাহ রেডিও, টেলিভিশন, ডিভিডি, মোবাইলসহ বিভিন্ন মাধ্যম মানুষের জীবনযাত্রাকে যেমন সহজ ও আনন্দময় করেছে, তেমনি এর প্রভাবে শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির সামাজিক জীবনে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ঘটনা ঘটছে। দ্রুত গতির ইন্টারনেটের বিস্তারে শহর এখন আকাশ সংস্কৃতির দখলে। ফলে মানুষের জীবনের চাহিদা, বিলাসিতাও প্রতিদিনই পরিবর্তিত হচ্ছে। রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ও মানুষের জীবনে নানাবিধ পরিবর্তন আনছে। ক্ষমতা কাঠামো পরিবর্তনে শহরের সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন ঘটে।

শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে মানুষের কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদিতা হ্রাস পাচ্ছে। যৌথ পরিবারের স্থলে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা,অর্থ, চাকরি, পদমর্যাদা ইত্যাদির মানদণ্ডে সমাজে নাগরিকদের মর্যাদা ও অবস্থান নির্ণিত হচ্ছে। নারী ও পুরুষভেদে প্রতিনিয়ত পরিধেয় বস্ত্রের আধুনিক পরিবর্তন ঘটছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী কর্মের সন্ধানে শহরে ভিড় করে। জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ, চিকিৎসা, বিনোদনের জন্য প্রতিনিয়ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা মেটাতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে বাণিজ্যিক ভবন ও বিপনি বিতান বাড়ছে। বিয়ে ও পরিবার গঠনে অভিভাবকগণ সন্তানদের মতামতকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। শিল্প- সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা মানুষের সামাজিক মূল্যবোধকে বৃদ্ধি করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক মূল্যবোধ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। খেলাধুলার প্রতি গুরুত্ব বাড়ছে। অন্যদিকে-

- একক পরিবারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে পারিবারিক বন্ধন আনেকাংশেই কমেছে
- তরুণ-তরুণীর বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে
- ধনী গরিব বৈষম্য বাড়ছে
- মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবর্তে সমাজে দুটো ভাগে ভাগ হচ্ছে যথা- উচ্চ বিত্ত ও নিম্নবিত্ত
- নগরায়ন ঘটছে অপরিকল্পিতভাবে। ফলে সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে
- অর্থনীতি পুরাপুরি শিল্পভিত্তিক না হওয়াতে পর্যাপ্ত শিল্পকারখানা গড়ে উঠেনি ফলে কর্মসংস্থানের জন্য বিশাল জনগোষ্ঠীকে শহরে আসতে হয়
- পরিত্যক্ত ভূমি দখল, অপরিকল্পিত বাড়ি, শহরের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শহরে আবাসন সুবিধা না থাকায় যেখানে সেখানে বস্তি গড়ে উঠছে, ফলে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে
- অস্বাভাবিক মানুষের চাপে শহরের পরিষ্কার পরিছন্নতা বিঘ্নিত হচ্ছে
- আকাশ সংস্কৃতির প্রবাহে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে যা কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তির ঘটনা বাড়ছে
- নারী ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে
- পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, দ্রুত উন্নত ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের আশায় নৈতিক অবক্ষয় ঘটে
- দুর্নীতি, চুরি, ছিনতাই এর মতো অপরাধ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে
-

গ্রামাঞ্চলের পরিবর্তন

বাংলাদেশের শহর ও গ্রামের মধ্যকার সম্পর্ক নিবিড়। শহরের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশেরই বাড়ি গ্রামে। ফলে শহরায়নের পরিবর্তনের প্রভাব গ্রামকেও দ্রুতগতিতে পরিবর্তন করেছে। প্রাচীন বাংলার চিত্র ছিল সহজ সরল অনাড়ম্বরপূর্ণ। ধনসম্পদে গ্রামবাংলা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। (self sufficient village community) বাংলাদেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যান্ত্রিক চাষাবাদের ব্যবহার গোটা গ্রামবাংলায় উৎপাদনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যে

গ্রামাঞ্চলেও গড়ে উঠেছে পল্লী উন্নয়ন সংস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরূদ্ধে আন্দোলনের প্রবাহ গ্রামীণ সমাজ ও শহরে রাজনীতির ক্ষেত্রে জাগরণ তৈরি করেছে। ১৯৫২সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত সব আন্দোলনে বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজে সচেতন চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটিয়েছিল। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছে। ভিলফ্রেডো প্যারেটোর সামাজিক এলিট শ্রেণির অস্তিত্ব বাংলাদেশের গ্রামগুলোতেও পাওয়া যায়। কেন্দ্রস্থিত শহরে এলিট ও রাজনৈতিক যোগাযোগ গ্রামীণ এলিট শ্রেণিকে ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছে। গ্রামে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি মানুষের সামাজিক চাহিদাকে বৃদ্ধি করেছে। ফলে বর্তমান গ্রামাঞ্চলগুলিতে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি ঘটছে। গ্রামীণ সমাজের পূর্বেকার অচলায়তন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে কুসংস্কার হ্রাস পাচ্ছে।

তাছাড়া গ্রামের নতুন শিক্ষিত শ্রেণি চাকরি ব্যবসা নানাবিধ কারণে শহরে আসছে। তারা নিজস্ব পরিবার কেন্দ্রিক হয়ে পড়াতে গ্রামেও যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। পূর্বে যৌথ পরিবারে বৃদ্ধ, অক্ষম, অসুস্থতা সত্ত্বেও নিরাপদ জীবনযাপন করত। কিন্তু বর্তমানে তাদের সেই সুবিধা নেই। গ্রামীণ সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটছে। এর কারণ শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে। জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা এবং কুসংস্কার মুক্ত জীবনযাপনের ধারণা তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটছে ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা বাড়ছে এবং খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন, বিদ্যুৎ মানুষকে আধুনিক জীবনের সন্ধান দিচ্ছে। গ্রামে গ্রামে এনজিওদের সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণির জীবনধারার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে ও মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচির ফলে মহাজনী ঋণ ও সুদের চক্র থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। গ্রাম অঞ্চলে এনজিওগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের ফলে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা তৈরি হয়েছে।

আবার অন্যদিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নদীভাঙন, বন্যা, দারিদ্রের কারণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ভূমিহীন শ্রেণিতে পরিণত হচেছ। কৃষিতে যান্ত্রিক চাষাবাদের ফলে কর্মসংস্থান কমে বেকারত্ব বাড়ছে। জীবিকার আশায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শহরে এসে ভিড় করছে। কারণ মাইক্রোক্রেডিট ভূমিহীন শ্রেণির আর্থিক সমস্যার সমাধান দিলেও ঋণের জালে নতুন করে আবদ্ধ হচ্ছে। তথ্য প্রবাহের অবাধ বিস্তরণ গ্রামীণ তরুণ সমাজকেও প্রভাবিত করছে। উঠতি বয়সের তরুণদের মধ্যে দ্রুত অর্থবিত্তের নেশা কাজ করছে। যার ফলে গ্রামীণ সহজ সরল জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। এমনকি গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থার সুবিধা অপ্রতুল বলে প্রতিযোগিতায় তারা পিছিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্লেষণে বলা যায়, বাংলাদেশ স্থবির সনাতন সমাজ নয়। বাংলাদেশের সমাজের পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার সংগে তাল মিলিয়ে দ্রুত পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপট বিচারে বলা যায়, চিরায়তও আধুনিক সংস্কৃতির সংঘাত ও বৈপরিত্য বাংলাদেশেও বিরাজমান। পুরনো সামাজিক ধ্যান-ধারণাও মূল্যবোধের সংঙ্গে নতুন ও আধুনিক ধ্যান-ধারণার সংঘাতের মধ্য দিয়েই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও কলাকৌশলের ফলে শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসা, আইন, রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও পরিবর্তন ঘটছে। যেমন বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, জীবনযাত্রায় আধুনিকতা এসেছে। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির হার কমেছে। পুঁজিবাদমনস্ক অর্থনীতির বিকাশ এমনসব নতুন নতুন সামাজিক স্তর ও শ্রেণির উদ্ভব করেছে যারা আবার সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নতুন বিশ্ববিক্ষার জন্ম হচ্ছে এবং পুরানো সাংস্কৃতির সাথেও সংঘাত হচ্ছে। শহুরে এবং গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। শহুরে সমাজ যত দ্রুত পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ সমাজ তত দ্রুত নয়। গ্রামীণ সমাজের এক অংশে পরিবর্তন ঘটলে অন্য অংশে হচ্ছে না। কারণ পরিবর্তনের সাথে সংঘাত অনিবার্য। বর্তমানে উন্নয়ন বা উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা প্রণয়নের মাত্রা ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অভিন্ন। বলা যায় সামাজিক পরিবর্তনর ইতিহাসে পৃথিবীর অসংখ্য দেশের মতো বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে তার সমাজ জীবনের যুক্তিসঙ্গত ও সুচিন্তিত রূপান্তরে প্রক্রিয়ায় সক্রিয় করে টেনে আনা হচ্ছে, ফলে সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে কিছুটা পরিমাণে মানুষের উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণের আওতায়।

অর্থনৈতিক পরিসরে বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জন করলেও বড় কোনো প্রকল্প কিংবা উন্নয়নকর্মে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলাদলি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব, বিভাজন বিদ্যমান। ফলে সামাজিক উন্নয়নের ধারাও ব্যহত হয়। তদুপরি বলা যায় বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও বাংলাদেশ পরিবর্তনমুখীন।

৩.১০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান অনুসারে, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে একটি।এ শীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলভুক্ত চরম মাত্রায় বন্যাকবলিত প্রথম দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানীয়। ঝড় ঝঞ্ঝার দিক থেকে এদেশের স্থান পঞ্চম। ভূমিকম্পের ঝুঁকির দিক থেকে অষ্টম। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দুর্যোগের ভয়াবহতার মুখোমুখি হচ্ছে দেশটি। বাংলাদেশের দুর্যোগ পরিস্থিতি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগদ্বারা প্রভাবিত ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমি বৈশিষ্ট্য অসংখ্য নদ-নদী, মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব ইত্যাদি দেশটিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে ভয়াবহভাবে বিপদাপন্ন করে রেখেছে। বাংলাদেশের উপকূলভাগের গঠনপ্রকৃতি এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবকে বর্ধিত করে। বিশেষত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপকূলবাসীদের বিপদ আরও বাড়িয়ে দেয় এবং একই সঙ্গে এ অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া শ্লথ করে দেয়।

যদিও বাংলাদেশ মানবউন্নয়নের অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে, তা সত্ত্বেও উচ্চমাত্রায় দুর্যোগ সংঘটন এবং সেই সঙ্গে জনসংখ্যার চাপ, দারিদ্র, সামাজিক বৈষম্য এবং এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলস্বরূপ সৃষ্ট ক্রমবর্ধিষ্ণু মানব নিরাপত্তাহীনতা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ বর্তমানে বড় ধরনের দুর্যোগে পতিত হবার উচ্চ ঝুঁকিতে অবস্থান করছে। আর সে আশঙ্কা বাস্তবায়িত হলে এর অভিঘাত আশ্রয়, খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং টিকে থাকার অন্যান্য বিষয়গুলোর ওপরও পড়বে। বলা হয়ে থাকে যাকে গত ১০ বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছর জাতীয় অর্থনীতির যে ক্ষতি (সম্পদহানি এবং ফসল নষ্ট হওয়া) হয়েছে তার পরিমাণ দেশের জিডিপির শতকরা ০.৫ ভাগ থেকে শতকরা ১ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। যে কোনো দুর্যোগেই নারী ও শিশু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়।

দুর্যোগ বলতে সাধারণভাবে মানুষের জীবন, সমাজ ও পরিবেশে সৃষ্ট অস্বাভাবিক অবস্থাকে বুঝায় যা মানুষের ক্ষতিসাধন করে। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মানুষকে অনেক মূল্য প্রদান করতে হয়। অন্যভাবে বলা যায় কোনো প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বিষয়কে তখনই দুর্যোগ বলা যাবে যখন সেটা কোনো জনবসতিকে সামগ্রিকভাবে আঘাত করবে। বাংলাদেশে সাধারণত যে সমস্ত দুর্যোগ সংঘটিত হয় যেমন-বন্যা, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, খরা, আর্সেনিক দুষণ, লবণাক্ততা, সুনামি, অগ্নিকাণ্ড, অবকাঠামো ধ্বংস ইত্যাদি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ধারণা

পৃথিবীতে সংঘটিত যে কোনো ধরনের দুর্যোগ মানুষের জীবন এবং সম্পদের বিপুল ক্ষতিসাধন করে। দুর্যোগের হাত থেকে উত্তরণ তথা মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। দুর্যোগের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে সাধারণভাবে বুঝায় দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য গৃহীত বিভিন্ন কৌশল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য দুর্যোগের পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী সময়ে কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে, æDisaster management is an applied science which seeks by the systematic observation and analysis of disasters to improve measures relating to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery." অর্থাৎ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যার অন্তর্ভূক্ত হয় যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগে জরুরি সাড়া দান ও পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কতকগুলো উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- জীবন ও সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি চিহ্নিত করা
- পরিবেশের উপর সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি চিহ্নিত করা
- দুর্যোগ সংঘটনের প্রবণতা ও সংঘটনের সময় চিহ্নিত করা
- দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি
- দুর্যোগের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সে বিষয়ে জনগণকে তথ্য সরবরাহ এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশিক্ষণ দান

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমস্যা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগের বিভিন্নতা ছাড়াও নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। যথা :

- পর্যাপ্ত ও সময়মত সতর্কীকরণের অভাব
- যথাসময়ে পুনরুদ্ধার কার্যপরিচালনার অভাব
- পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও লোকবলের অভাব
- সরকারের সঠিক পরিকল্পনার অভাব
- জনসচেতনতার অভাব
- পর্যাপ্ত চিকিৎসা সামগ্রী ও চিকিৎসকের অভাব
- টেকসই ঘরবাড়ি নির্মাণ না করা
- শিক্ষার অভাব
- আর্থিক স্বল্পতা
- পর্যাপ্ত প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাব
- ক্ষয়-ক্ষতির বিপুলতা বা ব্যাপকতা
- বিদেশিদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যে সমন্বয়হীনতার অভাব
- দুর্নীতি
- দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ে প্রশিক্ষণের অভাব প্রভৃতি
-

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র

দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখ্য উপাদান। সুতরাং একে কার্যত মোকাবিলার লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব সময়েই এর ব্যবস্থাপনার বেশি কাজ সম্পন্ন করতে হয়। দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই এর ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাড়াদান, পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন। অতীতে দুর্যোগে সাড়াদানকেই সম্পূর্ণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে ধরে নেওয়া হতো।

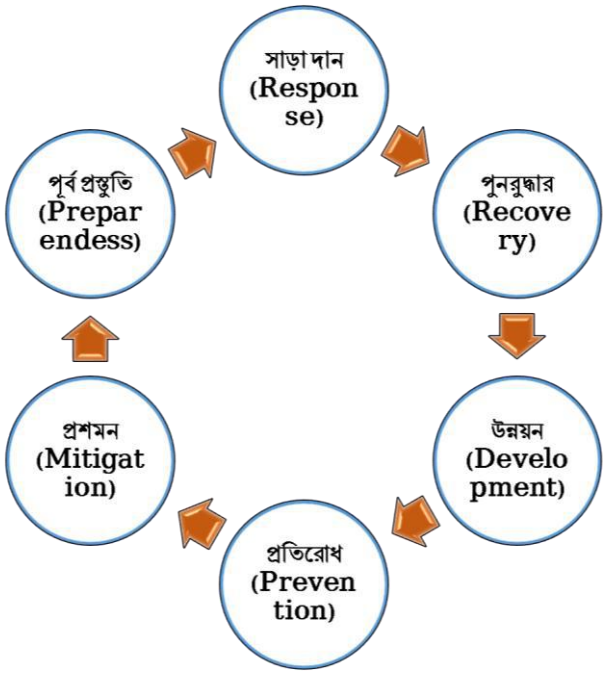

চিত্র : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র

প্রতিরোধ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও এ ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যাপারে প্রতিরোধ কার্যক্রম সফলতা বয়ে আনতে পারে। দুর্যোগ প্রতিরোধে কাঠামোগত এবং অবকাঠামোগত প্রশমনের ব্যবস্থা রয়েছে। কাঠামোগত প্রশমনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রম যেমন– বেড়িবাঁধ তৈরি, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, পাকা ও মজবুত ঘড়বাড়ি তৈরি, নদীখনন ইত্যাদি বাস্তবায়নকে বোঝায়। কাঠামোগত দুর্যোগ প্রশমন খুবই ব্যয়বহুল, যা অনেক দরিদ্র দেশের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অবকাঠামোগত দুর্যোগ প্রতিরোধ যেমন– প্রশিক্ষণ, গণ সচেতনতা বৃদ্ধি পূর্বপ্রস্তুতি ইত্যাদি কার্যক্রম স্বল্প ব্যয়ে করা সম্ভব।

প্রশমন

দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস এবং দর্যোগপূর্ব প্রস্তুতিকেই দুর্যোগ প্রশমন বলা হয়। মজবুত পাকা ভবন নির্মাণ, শস্য বহুমুখীকরণ, ভূমি ব্যবহার বিপর্যয় হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শক্ত অবকাঠামো নির্মাণ; কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর; প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম দুর্যোগ প্রশমনের আওতাভুক্ত। দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগপ্রশমন ব্যয়বহুল হলেও সরকার সীমিত সম্পদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদী খনন, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

পূর্বপ্রস্তুতি

দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি বলতে দুর্যোগপূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে ব্যবস্থাসমুহকে বুঝায়। আগে থেকে ঝুঁকি অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ সময়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ড্রিল বা ভূমিকা অভিনয় এবং রাস্তাঘাট, যানবাহন, বেতারযন্ত্র ইত্যাদি দুর্যোগের সময় প্রস্তুত রাখা দুর্যোগ প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত।

সাড়াদান

সাড়াদান দুর্যোগব্যবস্থাপনার একটি অংশ মাত্র। দুর্যোগের পরপরই উদ্ধার সাড়াদানের প্রয়োজন হয়। সাড়াদান বলতে নিরাপদ স্থানে অপসারণ, তল্লাশি ও উদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে বোঝায়।

পুনরুদ্ধার

দুর্যোগে সম্পদ, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদি যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকেই পুনরুদ্ধার বোঝায়।

উন্নয়ন

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পরপরই এলাকার উন্নয়ন কাজে হাত দিতে হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়ার পূর্বে ভৌগোলিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধাপ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পর্যায়কে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. দুর্যোগপূর্ব পর্যায়
২. দুর্যোগকালীন পর্যায় এবং
৩. দুর্যোগপরবর্তী পর্যায়

নিম্নে এ তিনটি পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

দুর্যোগপূর্ব পর্যায়

দুর্যোগে আক্রান্ত এলাকায় এক ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করাই হলো দুর্যোগপূর্ব পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। যেসব মানুষ ও সংগঠন স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঝুঁকি উপশম ও অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি নিশ্চিত করবে তাদের দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি কর্মসূচিতে গুরুত্বদেয়া হয়। এ পূর্ব প্রস্তুতি হতে পারে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ের সাধারণত স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্মসূচিগুলো জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়।

দুর্যোগকালীন পর্যায়

দুর্যোগকালীন পর্যায় বলতে দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট অবস্থা থেকে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা এবং উদ্ধার ও অন্যান্য কর্মসূচি প্রণয়ন করাকে বুঝায়। দুর্যোগকালীন সময়ে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে জনগণকে খাদ্য, আশ্রয়, আর্থিক সাহায্য পানীয়, ঔষধ ও সেবা প্রদান করা হয়।

দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়

এ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়ন; রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট, ব্রিজ মেরামত, বাঁধ নির্মাণ, বাসস্থান ও শিল্প কারখানা পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের ঋণ মওকুফেরও ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রধান তিনটি কৌশলের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে। যথা :

- কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং
- কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

আবার দুর্যোগ সংঘটনের সময় ও দুর্যোগ পরবর্তীকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে। যথা :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহ নিম্নরূপ :

- Ministry of Disaster Management and Relief (MDMR)
- National Disaster Management Council (NDMC)
- In-Ministerial Disaster Management Co-ordination Committee (IMDMCC)
- Emergency Operation Centre (EOC)
- Disaster Management Bureau (DMB)

এছাড়াও দুর্যোগ সংঘটনের সময় এবং দুর্যোগের পূর্বে ও পরে রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা করা হয়। জনগণের সার্বিক দুঃখকষ্ট লাঘব করা, দুদর্শাপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ প্রণীত হয়েছে। এই আইনের ১৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ প্রণীত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ অনুসারে বাংলাদেশ রাষ্ট্র আইনগতভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে কাঠামোগত রূপ দিয়েছে। এ ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রসহ সকল পর্যায়ের জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত। তারই অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় জাতীয় পর্যায় সংশ্লিষ্ট আটটি কমিটি এবং ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায় একটি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। কমিটিগুলো নিম্নরূপ :

- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল
- আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- জাতীয় দুর্যোগ উপদেষ্টা কমিটি
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড
- দুর্যোগসংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টদের কার্যক্রম সমন্বয়কারী দল
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা টাস্কফোর্স
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয় কমিটি

সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার কমিটি। দুর্যোগ সংঘটনের বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ভূমিকাসমূহ নিম্নরূপ :

তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়।

- জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকার তার কমিটিসমূহের মাধ্যমে নানাভাবে কাজ করে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ :

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

দুর্যোগকালীন নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকার নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন- দেশে প্রায় দুই হাজার আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, সুইসগেট নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট, ও ঘরবাড়ি উঁচু করে নির্মাণ প্রভৃতি। পাশাপাশি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ সমগ্র দেশে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন-উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প, সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি। এছাড়া সরকারিভাবে নদী ভাঙন প্রতিরোধের জন্য নদীর পাড় বাঁধাই, খরা প্রবণ অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা চালু ,নদী ও খাল ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক নাব্যতা বজায় রাখা, পরিকল্পিত পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ভূমিকম্প প্রতিরোধক ঘরবাড়ি, ব্রিজ, স্থাপনা প্রভৃতি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

- আবহাওয়ার আগাম সতর্কতা জানানোর জন্য আবহাওয়া কেন্দ্র স্থাপন
- বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে জানানো
- জনগণকে দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সহযোগিতা করা এবং পরামর্শ দেওয়া
- দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা
- দুর্যোগকালীন জনগণকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা

পূনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা

সরকারের গৃহীত পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ-

- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার করা
- ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য, পানীয়, ওষুধ ও সেবা প্রদান
- ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান
- প্রয়োজনে বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ
- ক্ষতিগ্রস্তদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা
- ক্ষতিগ্রস্তরা ঋণগ্রস্ত থাকলে ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা প্রভৃতি

বাংলাদেশ বর্তমানে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় অনেকটাই সক্ষমতা অর্জন করেছে। জনগোষ্ঠীর প্রতিটি স্তরে যেমন কমিউনিটি ছাড়াও স্কুল, কলেজগুলোতেও দুর্যোগবিষয় সচেতনতা তৈরির কার্যক্রম চলছে। বেসরকারি সংস্থাগুলো সরকারের সাথে সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের দুর্যোগ বিষয়ে জানানো হচ্ছে। যেমন-সেইভ দ্য চিলড্রেন অবকাঠামো তৈরি ও দুর্যোগ সচেতনতা বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারের সাথে সমন্বিত ভাবে কাজ করছে। আশা করা যায় বাংলাদেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

৩.১১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা, করণীয় ও মোকাবিলায় শ্রেণিভিত্তিক ধারণা প্রদান ও অনুশীলন

দুর্যোগ হচ্ছে প্রাকৃতিক অথবা মানব সৃষ্ট ক্ষতিকর দুর্ঘটনা বিশেষ। এর ফলে বাহ্যিকভাবে ক্ষতিসাধন, জীবনহানি কিংবা পরিবেশগতভাবে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। দুর্যোগ বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে অধিকাংশ দুর্যোগই প্রকৃতির তাণ্ডবলীলায় সংঘটিত হয়। ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ঘটতে পারে। মানুষের জীবনহানিসহ সহায়-সম্পত্তি, ঘর-বাড়ি ধ্বংস, জমির ফসল নষ্ট হবার ফলে ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারা, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এর প্রভাব পড়ে মারাত্মকভাবে। দুর্যোগের ফলে অনেক সময় ব্যক্তির মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলোই মূলত দুর্যোগের প্রধান শিকারের পরিণত হচ্ছে। ৯৫ শতাংশেরও অধিক মৃত্যু উন্নয়নশীল দেশে দুর্যোগের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। শিল্পোন্নত দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রায় ২০ গুণ বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি হয়। বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবেই দুর্যোগ প্রবণ এলাকা। এদেশের মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় লড়াকু সৈনিক হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ করা সম্ভব নয়, তবে সময় উপযোগী পদক্ষেপ সঠিক ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্ধার সামগ্রী, প্রচুর পরিমাণ প্রশিক্ষিত জনবল হতে পারে ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর ও জানমাল রক্ষার উপায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় সচেতনতা

দুর্যোগ হচ্ছে এরূপ ঘটনা, যা সমাজের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্ন ঘটায় এবং জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। যেমন–বন্যা, খরা নদীভাঙন, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি।যা প্রকৃতি বা মানবসৃষ্ট অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্টি হয় এবং এর ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার জনগোষ্টির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, জীবিকা, সম্পদ-সম্পদাদি ও পরিবেশের এমন ক্ষতি সাধন করে অথবা এমন এক চরম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যা ঐ ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের পক্ষে এককভাবে মোকাবিলা করা কষ্টসাধ্য বা ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। দুর্যোগের সাথে তিনটি শব্দ জড়িত সেগুলো হলো- আপদ, বিপদাপন্নতা বা নাজুকতা ও ঝুঁকি।

আপদ

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা,যা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে হতে পারে। এর ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। আপদ কোনো দুর্যোগ নয়, বরং দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ। যেমন– বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, নদী ভাঙ্গন, সুনামি ইত্যাদি হলো আপদ কিন্তু এই আপদগুলো যখন প্রাণহানি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংস করে জীবন ও জীবিকার অপূরণীয় ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে তখনই তা দুর্যোগে পরিণত হয়।

বিপদাপন্নতা বা নাজুকতা

বিপদাপন্নতা বা নাজুকতা হলো কোনো জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত এমন অবস্থা যা প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট আপদের প্রভাবে বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে দুর্বল ও সীমাবদ্ধ (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২) করে।

সক্ষমতা

যে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলা করার ক্ষমতাই হলো সক্ষমতা। যা আগাম প্রস্তুতি অথবা পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার মতো জ্ঞান বা দক্ষতা তৈরি করে। এর ফলে সমাজ বা নির্দিষ্ট জনগোষ্টিকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করাতে সক্ষম হয়। যেমন– সমাজের সকলে মিলে বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাধঁ নির্মাণ।

ঝুঁকি কোনো আপদ ঘটার সম্ভাবনা, প্রকৃতি ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্টির ক্ষতির সম্ভাবনা এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কাই হলো ঝুঁকি।

ঝুঁকি

দুর্যোগ ব্যবস্থপনা হচ্ছে দুর্যোগ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহের সমষ্টি এবং এগুলোর প্রায়োগিক কাজ যা, প্রশাসনিক সকল স্তরের দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমকে বুঝায়। দুর্যোগ ব্যবস্থপনার মাধ্যমে দুর্যোগ হ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদানের পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম, যা দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বিপদাপন্নতার পরিবেশ, পরিধি, মাত্রা ও সমন্বয় নির্ণয় ও নিরসনে ব্যবস্থাপনাসহ সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, সমন্বয়, সর্তক ও হুঁশিয়ারি, মহাবিপদ সংকেত প্রদান এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া ও জানমাল নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও চাহিদা নিরূপণ, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের অধীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন, পুনর্গঠন, অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহের পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে (দুর্যোগ ব্যবস্থপনা আইন,২০১২)। দুর্যোগ ব্যবস্থপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব হয়।

প্রায় প্রতিবছরই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ টর্নেডো ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, ভূমি ও পাহাড় ধস, অগ্নিকাণ্ড, নদীভাঙন, ইত্যাদি এদেশের জনগণের জীবন-জীবিকা, সম্পদসহ পরিবেশের বিপুল ক্ষতিসাধন করছে। এতে রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ অর্থ কেবলমাত্র ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে খরচ হিসেবে ব্যয় করা হচ্ছে, যা দেশের অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ ধরনের দুর্যোগ ঘটার আগেই যদি তা প্রতিরোধে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে, তবে অধিক সুফল পাওয়া যাবে। এতে অর্থের অপচয় যেমন রোধ হবে, ঠিক তেমনি স্থায়ি ভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ কাজে জনগণের আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা জোগাতে এলাকার সচেতন যুবসমাজ, বিত্তবানসহ সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলোকে সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের প্রতিটি

নাগরিককে দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় বিষয় সম্পর্কে অধিক সচেতন ও সজাগ হতে প্রয়োজনীয় যা যা করণীয় তা দ্রুত গ্রহণ করতে হবে। দক্ষ, অভিজ্ঞ গবেষকদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি তৈরি করতে হবে, যে কমিটি শুধুমাত্র দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনাবিষয়ক নিত্যনতুন কৌশল তৈরি এবং তা জবাবদিহিতার সঙ্গে দ্রুত বাস্তবায়নে অধিক সচেষ্ট থাকবে।

পরিবেশ বিপর্যয় ও দুর্যোগের সমস্যা সামগ্রিকভাবে একটি দেশের জাতীয় সমস্যা। কাজেই এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ আইনই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো দেশের প্রতিটি মানুষের এ সম্পর্কে সচেতনতা, তাহলে পরিবেশ বিপর্যয় ও যে কোনো রকমের দুর্যোগের কবল থেকে আমরা অতিসহজেই নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারব, যা অধিক জরুরি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো এমন নিঃশব্দ শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যেমন– ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধের জন্য উপকূলীয় বেড়িবাঁধ উঁচুকরণ, আরও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, দুর্যোগকালে সমুদ্রে জেলেদের সাথে যোগাযোগের উন্নত মাধ্যম ব্যবহার, কমিউনিটি রেডিও চালুকরণ, সচেতনতা অনুষ্ঠান জোরদারকরণ, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে উপকূলীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সিপিপির সম্পর্ক নিবিড়করণ ও উপজেলা পর্যায়ে সিপিপির কার্যালয় স্থাপন। এছাড়া বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর মতে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ পাঁচটি। এসব হচ্ছে–নজরদারি ও আইন প্রয়োগ বৃদ্ধি, বড় দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি জোরদার করা, জরুরি অবস্থায় সাড়াদান ব্যবস্থা জোরদার করা এবং দক্ষ জনবল তৈরি।

বর্তমান বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে দুর্যোগ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। একই সাথে বেড়ে গেছে মানব সৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ। এই বিবেচনায় থেকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে দুর্যোগঝুঁকির প্রভাব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের উপর দুর্যোগের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব আসতে পারে। দুর্যোগের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা ভীত, বিষন্ন হয়ে অথবা আচরণগত সমস্যার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করতে পারে। যেমন রাগ, আক্রমণাত্মক আচরণ করতে পারে অথবা স্কুলের সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে। কেউ কেউ টেলিভিশনের পর্দায় দুর্যোগের নানাবিধ দৃশ্য দেখেই মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। এ ছাড়া যেসব শিক্ষার্থীরা দুর্যোগকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করে, তাদের ক্ষেত্রে দুর্যোগকালীন সময়ের তীব্র বাতাস, ধোঁয়া, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, গঠনের অথবা অন্য কোনো স্মৃতি পরবর্তীতে বারবার মনে এসে উদ্রেক করতে পারে ভয়, ভীতি ও আতঙ্কের। তাই শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। অষ্টম শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে এ সম্পর্কিত একটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের দুর্যোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দুর্যোগ জনিত প্রশোমনকে তিনটি পর্যায় ভাগ করা যায়–

প্রাক দুর্যোগ	▪ দুর্যোগ ও ঝুকি সম্পর্কিত সচেতন ▪ প্রস্তুতির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসের ধারণা প্রদান ▪ অনুশীলন বা সিমুলেশন ▪ আপদকালের জন্য প্রস্তুতি
দুর্যোগকালীন	▪ সতর্কতা অনুসরণ ▪ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ▪ দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ ▪ জরুরি খাদ্য, ঔষধ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা ▪ নিরাপত্তা
দুর্যোগপরবর্তী	▪ স্থানান্তর করা ▪ অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা ▪ চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা ▪ জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম : খাদ্য,পানি ও আশ্রয় প্রদান ▪ জরুরি চিকিৎসা সহায়তা ▪ সাময়িক আবাসন সামগ্রী সরবরাহ ▪ জরুরি পুনর্বাসন ▪ স্বল্পকালীন কর্মসংস্থান

ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত বিষয়ে সচেতন ও অনুশীলন

ঘূর্ণিঝড় বা ঘূর্ণিবার্তা হলো ক্রান্তিয় অঞ্চলের সমুদ্রে সৃষ্ট বৃষ্টি, বজ্র ও প্রচন্ড ঘূর্ণি বাতাস সম্বলিত আবহাওয়ার একটি নিম্নচাপ প্রক্রিয়া (low pressure system) যা নিরক্ষীয় অঞ্চলে উৎপন্ন তাপকে মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত করে। এই ধরণের ঝড়ে বাতাস প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলে বলে এর নামকরণ হয়েছে ঘুর্ণিঝড়। ঘুর্ণিঝড়ের ঘুর্ণন উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরুতে থাকে। ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানলে যদিও দুর্যোগের সৃষ্টি হয়, কিন্তু এটি আবহাওয়ার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা পৃথিবীতে তাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। গড়ে পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৮০ টি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। এর অধিকাংশই সমুদ্রে মিলিয়ে যায়, কিন্তু যে অল্প সংখ্যক উপকূলে আঘাত হানে তা অনেক সময় ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করে। বাংলাদেশ তার অবস্থানগত কারণে, সমতল আর নিচু ভূমি তার সাথে সাথে ঘনবসতির কারণে খুব সহজেই নানা সামুদ্রিক ঝড় বাংলাদেশকে দূর্বল করে ফেলতে পারে।

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে বিভিন্ন দুর্যোগসম্পর্কে সচেতন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তীয় করণীয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া সম্ভব। যেমন- ঘূর্ণিঝড় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রঙ এবং সংকেত সম্পর্কে ধারণা দিয়ে শিক্ষক মোহড়ার আয়োজনের মাধ্যমে সচেতন করতে পারেন।

	লাল রং হলে--বিপদসীমা অতিক্রম করেছে অর্থাৎ বিপদ বা দুর্যোগকাল। এ অবস্থায় যদি প্রয়োজন থাকে বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধার, স্থানান্তর, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা ও ত্রাণ বণ্টনের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
	হলুদ রং হলে--বিপদসীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ এলাকাটি বন্যা কবলিত। এ অবস্থাকে আমরা প্রস্তুতিকাল বলতে পারি। এই পরিস্থিতেতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জরুরি সভার আয়োজন করতে পারে। পানি বাড়ার আগাম বার্তা মাঠ পর্যায় প্রচারের ব্যবস্থা করা, বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধার, স্থানান্তর, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা ও ত্রাণ বণ্টনের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
	সবুজ রং হলে-- স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ নিরাপদকাল

ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেতসমূহ

- **দূরবর্তী সতর্ক সংকেত ০১ :** বাতাসের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৫১-৬১ কিঃ মিঃ যা দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ গভীর সমুদ্রে ঝড়ো হাওয়া বইছে যা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে।
- **দূরবর্তী হুশিয়ারি সংকেত ০২ :** বাতাসের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিঃ মিঃ যা আগের মত দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ দূরে গভীর সমুদ্রে একটি ঝড় সৃষ্টি হয়েছে।
- **স্থানীয় সতর্ক সংকেত ০৩ :** এটি সমুদ্র বন্দর, উপকূলীয় অঞ্চল ও নদী বন্দরের জন্য প্রযোজ্য হবে। এর ফলে বন্দর ও বন্দরের আশেপাশের এলাকায় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিঃ মিঃ বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।
- **স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ০৪ :** এটি সমুদ্র বন্দর ও উপকূলীয় অঞ্চল জন্য প্রযোজ্য হবে। এর ফলে বন্দর ও বন্দরের আশেপাশের এলাকা ঘূর্ণিঝড় কবলিত হতে পারে। এর ফলে বাতাসের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় .৫১-৬১কিঃ মিঃ।
- **বিপদ সংকেত ০৫ :** বন্দর ছোট বা মাঝারী তীব্রতার ঝঞ্ঝাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতি। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিমি। ঝড়টি বন্দরকে বাম দিক রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
- **বিপদ সংকেত ০৬ :** এ সময়ে মাঝারি তীব্রতা সম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মাঝারি ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। এ সময় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিঃ মিঃ বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।
- **বিপদ সংকেত ০৭ :** বন্দর ছোট বা মাঝারী তীব্রতার ঝঞ্ঝাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতি। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিমি। ঝড়টি বন্দরকে উপর বা নিকট দিয়ে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
- **মহাবিপদ সংকেত ০৮ :** এ সময়ে প্রচণ্ড তীব্রতা সম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দরে অতি তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে কারণে বাতাসের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় .৮৯-১১৭কিঃ মিঃ হতে পারে।

- **মহাবিপদ সংকেত ০৯ :** এ সময়ে প্রচণ্ড তীব্রতা সম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় যার কারণে বন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অতি তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করে। হ্যারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৮-১৭০কিঃ মিঃ হতে পারে ।
- **মহাবিপদ সংকেত ১০ :** এ সময়ে অতি প্রচণ্ড তীব্রতা সম্পন্ন বা সুপার গঠনক্লোনের তীব্রতা সম্পন্ন প্রচন্ডতম একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর এলাকায় অতি তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করে। সর্বোচ্চ তীব্রতাসম্পন্ন এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১৭১কিঃ মিঃ বা আর ও বেশি হতে পারে ।
- **যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সংকেত ১১ :** আবহাওয়া বিপদ সংকেত প্রদানকারী কেন্দ্রের সঙ্গে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্থানীয় কর্মকর্তা আবহাওয়া অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ বলে মনে করেন।

নদীবন্দরের জন্য ৪টি সংকেত

- **১নং সতর্কতা সংকেত :** বন্দর এলাকা ক্ষণস্থায়ী ঝড়ো আবহাওয়ার কবলে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৬০ কিমি গতিবেগের কালবৈশাখীর ক্ষেত্রেও এই সংকেত দেখানো হয়। এই সংকেত আবহাওয়ার চলতি অবস্থার সতর্ক নজর রাখারও তাগিদ দেয়।
- **২নং নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত :** বন্দর এলাকা নিম্নচাপের সমতুল্য তীব্রতার একটি ঝড়, যার গতিবেগ ঘণ্টায় অনূর্ধ্ব ৬১ কিমি বা একটি কালবৈশাখী ঝড়, যার বাতাসের গতিবেগ ৬১ কিমি বা তদূর্ধ্ব। নৌযান এদের যে কোনোটির কবলে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৬৫ ফুট বা তার কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নৌযানকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।
- **৩নং নৌ বিপদ সংকেত :** বন্দর এলাকা ঝড়ে কবলিত। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ একটানা ৬২-৮৮ কিমি পর্যন্ত গতিবেগের একটি সামুদ্রিক ঝড় সহগঠন বন্দর এলাকায় আঘাত হানতে পারে। সকল নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।
- **৪ নং নৌ বিপদ সংকেত :** সংকেত বন্দর এলাকা একটি প্রচণ্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতার সামুদ্রিক ঝড়ে কবলিত এবং সহগঠন বন্দর এরাকায় আঘাত হানবে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিমি বা তদূর্ধ্ব। সকল প্রকার নৌযানকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

ভূমিকম্প মহড়া পরিচালনা

মহড়ার একসপ্তাহ পূর্বে শিক্ষার্থীদের ভূমিকম্প কী, কীভাবে এবং কেন হয়, ভূমিকম্পের আগে, ভূমিকম্পের পরে কী করা উচিত ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবাইকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে। এর জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান রেড ক্রিসেন্ট-এর সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রত্যেকটি শ্রেণিকক্ষের নির্গমন পথ এবং নিরাপদ এলাকা ঠিক করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের কাঠামোগত বিষয়টি গুরুত্ব দিবেন। গঠনরেন বেল কিরূপ হবে এবং কতক্ষণ বাজবে তা ঠিক করতে হবে।

ভূমিকম্পের সময় করণীয় বিষয়সমূহ

চিত্র : ভূমিকম্পের সময় করণীয়

- শক্ত ও মজবুদ টেবিল অথবা দরজার নীচে আশ্রয় নিতে হবে। কাঁচের জানালা থেকে নিজেকে এবং নিজের মুখমণ্ডল দূরে রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের বলতে হবে যদি 'ঝাঁকুনি' হয় সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হাত দুইটিকে ঘাড়ের পেছনে নিয়ে মাথা নিচু করতে হবে অথবা বই দিয়ে মাথাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে।
- শান্ত থাকতে হবে, ভীত-সন্ত্রস্ত না হওয়া।
- মনে মনে ১ থেকে ৬০ পর্যন্ত গণনা করতে কারণ ৬০ সেকেন্ড এর চেয়ে বেশি সময় ধরে ঘটেছে এমন ভূমিকম্পের সংখ্যা খুবই কম।

ভূমিকম্প থেমে যাওয়ার সাথে সাথে করণীয়

- সতর্ক হতে হবে
- সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হতে হবে
- করিডোর দিয়ে বের হওয়ার পথে যাওয়ার সময় ধ্বংসাবিশেষ পড়ে আছে কিনা সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে
- দৌঁড়ানো এবং ধাক্কাধাক্কি করা যাবে না
- ভবন থেকে বেরিয়ে আসার পর আবার ভবনে যাওয়া যাবে না
- কথা বলতে, পেছনে ফিরা এবং সঙ্গে কোনো বস্তু নেওয়া যাবে না। নির্ধারিত নিরাপদ স্থানে শান্তভাবে দ্রুত যেতে হবে

ভূমিকম্পের অনুশীলন

১ম পর্যায় : পূর্ব নির্ধারিত সংকেত বা গঠনরেন বাজার সাথে সাথে বুঝতে হবে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে সাথে সাথে সতর্ক হবে।

২য় পর্যায় : এ সময় জানালা, কাঁচ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকতে হবে এবং একই সাথে 'বসে পড়ে মাথা আড়াল করে এবং ধরে' রাখা অনুশীলন করবে। এ ক্ষেত্রে সকলে ডেস্কে, টেবিল প্রভৃতি নিচে আশ্রয় নিবে যতক্ষণ না কম্পন বন্ধ হয়।

৩য় পর্যায় : কম্পন বন্ধ হলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবে এবং নির্ধারিত নির্গমণ পথে নিরাপথ স্থানে চলে যাবে। এ সময় নিজেদের মাথা ব্যাগ বা শক্তজাতীয় কিছু দিয়ে ঢেকে রাখবে।

৪র্থ পর্যায় : নির্ধারিত নিরাপদ স্থানে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শ্রেণি অনুযায়ী বিভক্ত হবে।

৫ম পর্যায় : শিক্ষক সকল শিক্ষার্থী উপস্থিত আছে কিনা গুণে দেখবেন।

৬ষ্ঠ পর্যায় : খোঁকারী এবং উদ্ধারকারী দল আহত ও অসুস্থ্যদের বের করে আনবে। এবং সেবা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিবে।

ভূমিকম্পের পরিস্থিতিতে আক্রান্তদের উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জরুরি সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের ঠিকানা এবং জরুরি টেলিফোন সংরক্ষণের বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। যেমন– নিকটবর্তী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, নিকটবর্তী থানা হেল্প লাইন, নিকটবর্তী হাসপাতাল অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যুৎ সরবরাহকেন্দ্র, পানি সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ, গ্যাস সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট সোগঠনটি, সন্ধানী প্রভৃতি। এইভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতন করা যায়।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. মি. জিন্নাহ তার ভাষণে কী বলেছিলেন ?
২. কত তারিখ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ?
৩. ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ হন কে কে ?
৪. একুশের চেতনা থেকে কিসের উদ্ভব ঘটে ?
৫. কত তারিখে ভাষা দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত হয় ?
৬. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক কী ছিল ?
৭. যুক্তফ্রন্ট এর নির্বাচনী কর্মসূচি কয়দফা বিন্যস্ত করা হয় ?
৮. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ১ম দফা কী ছিল ?
৯. কত তারিখে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ?
১০. নির্বাচনে মুসলিম লীগ কতটি আসন পায় ?
১১. কোনো দলের বিরোধী হিসেবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয় ?
১২. ভাষা আন্দোলনের মূল কারণ কী ছিল ?
১৩. তমুদ্দিন মজলিশ কী ?
১৪. যুক্তফ্রন্ট কী ?
১৫. ৬ দফা দাবির ২টি দফা লিখুন।
১৬. কোথায় ৬ দফা দাবি পেশ করা হয় ?
১৭. কত তারিখে ৬ দফা দাবি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ?
১৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতার মৌল ভিত্তি কী ?
১৯. কত সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয় ?
২০. ছাত্ররা মহাঅভ্যুত্থান দিবস পালন করে কত তারিখ ?
২১. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৩০৯ টি আসনের মধ্যে কতটি মুসলিম ও অমুসলিম আসন ছিল ?
২২. ইস্কান্দার মীর্জা কত তারিখ সামরিক শাসন জারি করেন ?
২৩. আইয়ুব খান কত তারিখে সামরিক আইন জারি করেন ?
২৪. আইয়ুব খান কত সালে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন ?
২৫. ১৯৬৯ এর আন্দোলন সফলতা পেয়েছিল কিভাবে ?
২৬. ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের তিনটি গুরুত্ব লিখুন।
২৭. কে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি করেন ?
২৮. কে ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ?
২৯. কত সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের দুটি অংশের শেষ নির্ব্াচন।
৩০. কোনো নির্বাচনকে পাকিস্তানের মৃত্যুর বার্তাবাহক বলে মনে করা হয় ?
৩১. জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের আসন সংখ্যা কত ছিল ?
৩২. কোনো নির্বাচন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করেছিল ?
৩৩. সামাজিকীকরণ কী ?
৩৪. সামাজিক প্রক্রিয়াগুলো কী ?
৩৫. গণমাধ্যম বা গণযোগাযোগ কী ?
৩৬. গণমাধ্যমের ভূমিকা কী কী ?
৩৭. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া কী ?
৩৮. গণমাধ্যম কী ?
৩৯. সমাজকাঠামোর উপদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন ।
৪০. 'সমাজকাঠামো একটি সামগ্রিক ধারণা'—উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন ।
৪১. সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যা করুন ।
৪২. সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহ ব্যাখ্যা করুন ।
৪৩. সামাজিক পরিবর্তনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন ।
৪৪. শিশুর সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন।
৪৫. কয়েকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন।
৪৬. পরিবারে সংজ্ঞা দিন।

৪৭. পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪৮. পরিবারের উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি তত্ত্ব লিখুন।
৪৯. পরিবারের কার্যাবলি কী কী ?
৫০. বিবাহ কী ?
৫১. ক্ষমতা কী ?
৫২. পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার দুটি মুখ্যশ্রেণির নাম কী ?
৫৩. গণভোট কী ?
৫৪. বাংলাদেশের ভূমিরূপ কী ধরনের ?
৫৫. বাংলাদেশের ভূমিরূপকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?
৫৬. বাংলাদেশের ভূমিরূপ গঠন কয় প্রকার ?
৫৭. জলবায়ু কী ?
৫৮. মৌসমী বায়ু কী ?
৫৯. জলবায়ুর বার্ষিক তাপমাত্রা কত ?
৬০. নদীর উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্ষেপে লিখুন।
৬১. নদীর শ্রেণিবিভাগ কর।
৬২. নিষ্কাশন ধরন কী ?
৬৩. নির্বাহী বিভাগ কি ?
৬৪. নির্বাহী বিভাগের প্রধান কে ?
৬৫. প্রধানমন্ত্রীকে কে নিয়োগ দিয়ে থাকেন ?
৬৬. প্রধানমন্ত্রীর প্রধান দুটি ক্ষমতা উল্লেখ করুন ।
৬৭. বাংলাদেশের জাতীয়সংসদ আইন সভা কয় কক্ষবিশিষ্ট ?
৬৮. জাতীয়সংসদের অধিবেশন কে আহবান করেন ?
৬৯. জাতীয়সংসদের মেয়াদ কত বছর ?
৭০. কোরাম পূর্ণ হওয়ার জন্য কতজন সংসদ সদস্য প্রয়োজন ?
৭১. আইনসভার দুটি কাজ উল্লেখ করুন ।
৭২. বিচার বিভাগ কী ?
৭৩. বিচার বিভাগে সর্বোচ্চ স্তর কোনোটি ?
৭৪. রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ কত দিন ?
৭৫. রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা উল্লেখ কর ?
৭৬. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী ?
৭৭. সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিকে কে নিয়োগ দিয়ে থাকেন ?
৭৮. লীগ অব নেশনস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
৭৯. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কত তম সদস্য দেশ ?
৮০. জাতিয়সংঘ দিবস কোনোটি ?
৮১. জাতিসংঘের সদরদপ্তর কোথায় অবস্থিত ?
৮২. জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে কখন ?
৮৩. জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য কয়টি ও অস্থায়ী সদস্য কয়টি ?
৮৪. শহরের সমাজে পরির্তনের ইতিবাচক ফলাফল কী কী ?
৮৫. গ্রামীণ পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো কী কী ?
৮৬. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতিবন্ধকার পাঁচটি কারণ লিখুন।
৮৭. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের অবদান লিখুন।
৮৮. দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগপরবর্তী প্রস্তুতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন ।
৮৯. টীকা লিখুন-বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ;
৯০. দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কী ?
৯১. দুর্যোগ ব্যবস্থপনা সচেতনতা বলতে কী বুঝায় ?
৯২. দুর্যোগ পরবর্তী করণীয়সমূহ উল্লেখ করুন ।
৯৩. ভূমিকম্পের সময় করণীয় বিষয়সমূহ কী কী ?
৯৪. ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেতসমূহ উল্লেখ করুন ।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
২. ভাষা আন্দোলনে পটভূমি বর্ণনা করুন।
৩. যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার উল্লেখযোগ্য দফাগুলো কী ছিল ব্যাখ্যা করুন।
৪. ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন কী? তুমি কি মনে কর এটা ছিল পাকিস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদের নীল নকশা ?
৫. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব লিখুন।
৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৭. ভাষা আন্দোলন কি ? ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৮. ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ কী ?
৯. কীভাবে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয় ?
১০. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী ?
১১. ঐতিহাসিক ৬ দফাকে পূর্ব বাংলার মুক্তির সনদ বলার কারণসমূহ চিহ্নিত করুন।
১২. কার নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়? এদের দাবি কী ছিল ?
১৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব লিখুন।
১৪. ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের রাজনৈতিক পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।
১৫. ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করুন।
১৬. ১৯৫৪ সালেল যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল ও প্রভাব উল্লেখ করুন।
১৭. ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।
১৮. আওয়ামী লীগের ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচিগুলো নির্দেশ করুন।
১৯. ছয় দফা কর্মসূচি কী? বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২০. ছাত্রদের ১১ দফা দাবির পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।
২১. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।
২২. ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের গতি প্রবাহ ব্যাখ্যা করুন।
২৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।
২৪. ১৯৭০ সালে নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচন কি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করেছিল ? ব্যাখ্যা করুন।
২৬. পরিবারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।
২৭. পরিবারের বিভিন্ন ধরন ব্যাখ্যা করুন।
২৮. একটি আধুনিক পরিবারের প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন।
২৯. মর্গান বর্ণিত পরিবার ও বিবাহের বিবর্তনের পর্যায়গুলো ব্যাখ্যা করুন।
৩০. "একক পরিবার সর্বজনীন সামাজিক বৈচিত্র্য" ব্যাখ্যা করুন।
৩১. তুমি কি মনে কর যে, প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে ? সমাজের পটভূমিতে এর ব্যাখ্যা করুন।
৩২. পরিবার কী? পরিবারের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করুন।
৩৩. পরিবারের সাধারণ কাজগুলো আলোচনা করুন।
৩৪. সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝায়? সামাজিকীকরণের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৩৫. বাংলাদেশে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৩৬. সরকার পাকিস্তান বেতার টেলিভিশনে কখন রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।
৩৭. বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের চরম দাবি ছিল কোনোটি ?
৩৮. কোনো দাবিকে বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।
৩৯. আগরতালা মামলার প্রধান আসামী কে ছিলেন।
৪০. শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি প্রথম কোথায় উত্থাপন করেন ?
৪১. বাঙালি জাতীয়তাবাদ উৎপত্তি ও বিকাশ ধারা আলোচনা করুন।
৪২. ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করুন।
৪৩. ১৯৬৬ সালে প্রবর্তিত আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
৪৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরুন।
৪৫. আওয়ামী লীগের ছয় দফার মাঝে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ রোপিত ছিল কি না ব্যাখ্যা করুন।
৪৬. ১৯৬৬ সালে প্রণীত আওয়ামী লীগের ছয় দফা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন ব্যাখ্যা করুন।
৪৭. বাংলাদেশের ভূমিরূপের গঠনে বিস্তারিত বর্ণনা দিন।

৪৮. কোয়াটারনারি পর্যায়ের পাললীক অনুক্রমকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় তার বর্ণনা দিন।
৪৯. বাংলাদেশের জলবায়ুর বর্ণনা দিন।
৫০. বাংলাদেশের জলবায়ু উপাদানগত অবস্থানগুলো আলোচনা করুন।
৫১. বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।
৫২. নদীর সংজ্ঞা দাও। নদীর বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করুন।
৫৩. নদী কি কি কাজ করে? নদীর ক্ষয় কাজের প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করুন।
৫৪. নদীর ভার/বোঝা বহন প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।
৫৫. নদীর ক্ষয়জাত বিভিন্ন ভূমিরূপ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।
৫৬. নদীর সঞ্চয়কার্যের সৃষ্ট ভূমিরূপ বর্ণনা করুন।
৫৭. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতিক উন্নয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৫৮. প্রাকৃতিক সম্পদ কী? বাংলাদেশের ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ দিন।
৫৯. বাংলাদেশের বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৬০. খনিজ সম্পদ কাকে বলে? বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বিবরণ দিন।
৬১. অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৬২. বাংলাদেশের বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬৩. বৈদ্যুতিক শক্তি কাকে বলে? বৈদ্যুতিক শক্তিকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?
৬৪. বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যবলি আলোচনা করুন।
৬৫. সরকারের বিচার বিভাগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৬৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কি কি শর্ত আবশ্যক তা উল্লেখ করুন।
৬৭. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলির বিবরণ দিন।
৬৮. 'আইন বিভাগ কিভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে' বর্ণনা করুন।
৬৯. আইন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
৭০. আধুনিক কালে শাসন বিভাগে ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৭১. অধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৭২. জেলা প্রশাসনের ডেপুটি কমিশনারের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৭৩. বাংলাদেশের গ্রামীন উন্নয়নের ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৭৪. উপজেলা পরিষদের গঠন ও কার্যবলি বর্ণনা দিন।
৭৫. উপজেলা পরিষদের সুবিধা অসুবিধা উল্লেখ করুন।
৭৬. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন, ক্ষমতা কার্যবলি বর্ণনা করুন।
৭৭. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যবলি বর্ণনা করুন।
৭৮. বিশ্ব শান্তিও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
৭৯. জাতিসংঘের প্রধান বিভাগ সমূহের গঠন, ও তাদের কার্যবলি বিশ্লেষণ করুন।
৮০. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।
৮১. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাতগুলো বর্ণনা কবুন।
৮২. সামাজিক পরিবর্তন কী ? বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করুন।
৮৩. বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন এর ধারায় শহর ও গ্রামের পবির্তনকে ব্যাখ্যা করুন।
৮৪. দযোর্গ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা লিখুন। বাংলাদেশ সরকার গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৮৫. দুর্যোগব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও সমস্যাগুলো কী কী? দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার চক্র ব্যাখ্যা করুন।
৮৬. পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা কী? ব্যাখ্যা করুন।
৮৭. বিদ্যালয় কীভাবে দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে পারে? মতামত দিন।
৮৮. যে কোনো একটি দুর্যোগের উপর বিদ্যালয়ে একটি অনুশীলনের আয়োজনের পরিকল্পনা তৈরি করুন।

তথ্যসূত্র

১. আখতার মুকুল বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৬
২. আবুল মনসুর আহমদ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮১
৩. আতিউর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব, ঢাকা ১৯৯৮
৪. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ঢাকা, অনন্যা, ২০০৭
৫. বদরুদ্দীন উমর পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১ম ও ২য় খণ্ড ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স ১৯৭৫, ৩য়, খণ্ড, চট্রগ্রাম, বইঘর, ১৯৮৫
৬. মওদুদ আহমদ বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, (অনুবাদ জগলুল আল) ঢাকা, ইউপিএল, ২০১০

৭. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ১৯৯৩
৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা) বাংলাদেশ ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) (নতুন সংস্করণ) ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি তিনখণ্ড ২০০০
৯. হারুন-আর-রশীদ (সম্পা) বঙ্গবন্ধু রাজনীতি ও প্রকাশন ঢাকা, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ১৯৯৭
১০. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২
১১. ডাঃ এমাজউদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা।
১২. ডঃ সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান হাগঠন বুক হাউস, ঢাকা।
১৩. রাখী বর্মন ও মোঃ গোলাম মোস্তফা সূর্য স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস আজিজিয়া বুক ডিপো।
১৪. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক উন্নয়ন। আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।
১৫. মাহবুব হাগঠন বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ও সম্পদ বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
১৬. আমীর ও শওকত প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, গ্রন্থকুটির।
১৭. ড. হ.জ.ম. হাসিবুশ শাহীদ, মো: মনিরুজ্জামান, সালমা খাতুন আধুনিক জলবায়ুবিজ্ঞান, স্বজন প্রকাশনী।
১৮. ড. কাজী আব্দুর রউফ কাজী আবুল মাহমুদ, ভূমিরূপ বিজ্ঞান, সুজনেষু প্রকাশনী, ৩৪, বাংলাবাজার ঢাকা।
১৯. কে আশরাফুল আলম, আধুনিক ভূরূপবিজ্ঞান, পারফেক্ট পাবলিকেশন্স, ৩৭, নর্থব্রুক হল রোড (বিশাল বুক কমপ্লেক্স দ্বিতীয় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা।
২০. আমীর, শওকত, প্রারম্ভিক সামাজবিজ্ঞান, গ্রন্থ কুটির।
২১. আ স ম হেফজুল কবীর, পানি বিজ্ঞান ও নদীর অঙ্গসংস্থান, স্বজন প্রকাশনী (ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক পুস্তক প্রকাশনালয়) নীলক্ষেত, ঢাকা।
২২. ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান, লোক প্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ প্রশাসন, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ৯ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
২৩. পরিমল ভূষণ কর সমাজতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
২৪. ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র, বিষয় সমাজতত্ত্ব, ইণ্ডিয়ান বুক হাউস, ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯
২৫. জর্জ শাহনেওয়াজ (২০১৭) ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, Easy Publications, ঢাকা।
২৬. দুর্যোগঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা (২০১৩) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
২৭. দুর্যোগব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ (২০১২) দর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২৮. দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা
২৯. মিয়া ও খান (২০১৬) সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, গ্রন্থকুটির, ঢাকা।
৩০. আলী ইদ্রিস (১৯৯২) প্রাক পলাশী যুগে বঙ্গীয় বাণিজ্য ও বণিক শ্রেণি, সমাজ নিরীক্ষণ ৪৩, পৃ: ১০৪
৩১. খান বদরুল (১৯৯২) গ্রামীণ 'সিভিল সমাজ' ও বাংলাদেশে গণতন্ত্র, সমাজ নিরীক্ষণ ৪৩, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, কলাভবন ঢাকা।
৩২. জাহান সেলিম (১৯৯৬) অর্থনীতির কড়চা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
৩৩. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩, ১৬ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩৪. নাথ রনজিত (২০১৬) অর্থনীতি, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা।
৩৫. সেন অনুপম (১৩৯৫ বাংলা) বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজ, সাহিত্য সমবায়, ঢাকা পৃ: ৫৬- ৭০
৩৬. সাহা রঞ্জন (২০০৭), নতুন কৃষি ও বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন, নৃবিজ্ঞানপত্রিকা, সংখ্যা ১২
৩৭. ইসলাম সিরাজুল (১৯৯৯) বাংলার ইতিহাস ঊপনিবেশিক শাসন কাঠামো, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
৩৮. করিম নাজমুল (১৯৯৯) সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষন, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা
৩৯. করিম আবদুল (১৯৯৯) বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা
৪০. বটেমর টম-অনুবাদ চক্রবর্তী হিমাচল (১৯৯২) কেপি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানি, নিউদিল্লি
৪১. মিয়া ও খান (২০০৬) সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি গ্রন্থ কুটির, ঢাকা
৪২. সেন অনুপম (১৩৯৫ বাংলা) বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ, সামাজিক অর্থনীতির ধাপ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৪৩. সেন অনুপম (২০০৭ বাংলা) ব্যক্তি ও রাষ্ট্র সমাজ- বিন্যাস ও সমাজ- দর্শনের আলোকে, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা

ইউনিট ৪ : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে কার্যকর পাঠ পরিকল্পনা

পাঠদান একটি শিল্পকর্ম। আর এই শিল্পকর্মকে সার্থক করার জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। শিক্ষক এই শিল্পকর্মে যত বেশি নৈপুণ্য দেখাতে পারবেন তত দ্রুত ও স্থায়ী হবে শিল্প সাধনা। যার পরিকল্পনা যত সঠিক ও সুন্দর হবে তার শিল্পকর্ম তত সুন্দর ও সার্থক হবে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের জন্য পরিকল্পনা করা খুবই প্রয়োজন। বছরের শুরুতে বিষয়টির পাঠদানের সুবিন্যস্ত অধ্যায় ও পাঠভিত্তিক বিন্যাস করতে হবে। শুধু তাই নয় শ্রেণি শিক্ষককে যথার্থ রূপে প্রস্তুত করতে হলে পাঠ পরিকল্পনা মাফিক ছদ্মশিক্ষণ ও অনুশিক্ষণের মাধ্যমে তার অনুশীলনেরও প্রয়োজন।

এই ইউনিটে নিম্নলিখিত পাঠগুলো আলোচিত হলো-

৪.১ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় পাঠের জন্য পাঠ পরিকল্পনা কাঠামো বা ছক
৪.২ বিষয়বস্তু ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন
৪.৩ পাঠ পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনা
৪.৪ পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োগ-ছদ্ম শিক্ষণ, অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন

৪.১ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় পাঠের জন্য পাঠ পরিকল্পনা কাঠামো বা ছক

শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হলো শ্রেণিকক্ষে ফলপ্রসূ শিখন/শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা। শ্রেণিকক্ষে শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব শিক্ষকের। তার জন্য শিক্ষকের পরিকল্পনা প্রয়োজন। সুতরাং বলা যায় কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কোনো পাঠের শিখনফল অর্জনের জন্য শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা পূর্বে প্রণীত কার্যকর পরিকল্পনাই হল পাঠ পরিকল্পনা। অন্যভাবে বলা যায় শ্রেণি কার্যক্রমে পাঠদানের উদ্দেশ্য, শিখনফল, শ্রেণি শিখন কার্যক্রমে কোথায়, কখন, কীভাবে অংশগ্রহণ করবেন কী উপকরণ ব্যবহার করবে, কী ধরনের প্রশ্ন, উদাহরণ ও উপমা ব্যবহার করবেন, কীভাবে মূল্যায়ন করবেন এসব বিষয়াদি শ্রেণিতে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা পূর্বেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক কর্তৃক এ ধরণের পূর্বপ্রস্তুতি মূলক লিখিত পরিকল্পনাই হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা।

Lesson plan is the titele given to a statement of the achievement to be realized and the specific means by which these are to be attained as a result of the activities engaged in during the period (Teaching of History) (Lesson Plan)

Wikipedia অনুযায়ী "A Lesson Plan is a teacher's detailed description of the Course of instruction or ælearning trajectory for a lesson"

মূলত পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কিছু মনোবৈজ্ঞানিক ও বাস্তব ভিত্তি বা কারণ রয়েছে। শিখন শেখানো কার্যক্রমের মতো জটিল কাজটি স্বার্থকতার সাথে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

- বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য অনুযায়ী শ্রেণি শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা
- শিক্ষার্থীর সামর্থ অনুযায়ী তৈরি করা
- পদ্ধতি কৌশল পূর্ব থেকে ঠিক করা
- শুধু তাই নয় শ্রেণি ও বিষয়বস্তু উপযোগী উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করা

মূলত পাঠটিকে শিক্ষার্থীর কাছে বোধগম্য হৃদয়গ্রাহী ও ভবিষ্যতে আরো কৌতূহল উদ্দীপক করার জন্যই পূর্ব থেকে একটি পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা।

শিক্ষক পূর্ব থেকে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করলে বিয়ষবস্তুটি তিনি রপ্ত করে ফেলেন, মনোসংযোগ করেন বিষয়বস্তুটির প্রতি। ফলে সকল দিক লক্ষ্য করে দক্ষতার সাথে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

মানসম্মত শিক্ষণের ভিত্তিই হলো পূর্ব পরিকল্পনা। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে পরিকল্পনা ছাড়া শ্রেণি শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়, বিশেষত ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে পূর্ব পরিকল্পনা তৈরি করা খুব প্রয়োজনীয়। পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষকের ক্ষেত্র দৈনিক পাঠদানের ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিকতা অনুসৃত হয়। তাছাড়া-

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রেণি শিখন কার্যক্রম শেষ করা যায়।
- সুনিয়ন্ত্রিত সুসংগঠিত ও ধারাবাহিকভাবে বিষয়বস্তু নিয়ে শ্রেণি শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- শিক্ষক পূর্ব পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়ই যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে ।

- পরবর্তীতে শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষককে ধারাবাহিক ও সুনিয়ন্ত্রিত রাখে, এমনকি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিখন পদ্ধতি কৌশল ও উপকরণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- শিক্ষার্থীর বয়স চাহিদা ও সামর্থ অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা যায়।

ফলে শিক্ষককে শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং তাঁর দক্ষতাও বাড়ে এবং সময়ের মধ্যে শ্রেণি কার্যক্রম শেষ করা সম্ভব হয়।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং তার উপর শিক্ষকের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। শিক্ষার্থী সম্পর্কে (বয়স মেধা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ধারণ ক্ষমতা, চাহিদা, আগ্রহ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে) শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা, শিক্ষাদর্শন, এবং সমাজ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। পাঠের উদ্দেশ্য, আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখনফল নির্ধারণ করতে হবে। উপর্যুক্ত শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। সর্বপরি বিষয়বস্তুটি শ্রেণিতে শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা ও প্রয়োগের দক্ষতা থাকতে হবে।

শিখনফল অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ এবং প্রণয়ন করতে হবে। প্রশ্নমালা, যে প্রত্যাশায় শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা তৈরির পূর্বেই স্থির করেছেন তা যেন পাঠ শেষে অর্জিত হয়। শ্রেণি শিখন কার্যক্রম যেন প্রাণবন্ত অংশগ্রহণমূলক হয় সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ

জার্মানির প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট পাঠদানের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ ও পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করেন। হার্বাট শিখন শেখানো কার্যক্রমকে ৫টি ধাপে বা সোপানে ভাগ করেছেন। ধাপগুলো পরস্পরের সাথে যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিন্যস্ত।

অন্যান্য শিক্ষাবিদদের মতো তিনিও মনে করেন আগ্রহ ছাড়া শিক্ষা হয় না। আবার আগ্রহ সৃষ্টি করাও সহজ নয়। যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পাঠের প্রতি যত বেশি আগ্রহ তৈরি করতে সক্ষম হবেন তিনি তত সার্থক শিক্ষক। তার মতে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে, তার পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন বিষয়বস্তুর সঠিক নির্বাচন ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে উপস্থাপন।

জন হার্বাট-এর মতে জন্মাবস্থায় শিশুর মন ফাঁকা থাকে পরিস্কার স্লেটের মতো। ধীরে ধীরে পরিবেশের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে শিশুর অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে থাকে। আর অভিজ্ঞতার ভিত্তি হচ্ছে আগ্রহ বা অনুরাগ। অনুরাগের যেমন ৪টি সোপান রয়েছে তেমনি পাঠ পরিকল্পনারও চারটি সোপান রয়েছে। ১। অভিজ্ঞতার স্পষ্টতা (Clearness) ২। অভিজ্ঞতার সংযোগ (Association) ৩। অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন (System) ও ৪। সূত্র গঠন (Method)

হার্বাটের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে একমত হয়ে হার্বাটের এই নীতির উপর ভিত্তি করে জিলার (Ziller) পরবর্তীকালে ৫ সোপান বিশিষ্ট) পাঠ পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পাঠ পরিকল্পনায় ৫টি সোপান আছে।

১. প্রস্তুতি (Preparation)
২. উপস্থাপন (Presentation)
৩. তুলনাকরণ (Comparision)
৪. সামান্যিকরণ (Generalisation)
৫. অভিযোজন বা প্রয়োগ (Application)

হার্বাটের পঞ্চ সোপান পদ্ধতি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরবর্তীতে তুলনাকরণ ও সামান্যিকরণ সোপান দুটি আলাদাভাবে অনুসরণ অনাবশ্যক বলে বাদ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ১) প্রস্তুতি ২) উপস্থাপন ৩) প্রয়োগ। এই তিনটি অনুসরণ করে হার্বাটের পাঠ পরিকল্পনায় পরিবর্তন এসেছে সময় ও চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে।

পাঠ পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ

পরিচিতি এই অংশটি পাঠ পরিকল্পনার প্রথমেই (Introduction) থাকে। এটি পাঠ পরিকল্পনার ভিত্তি। এ অংশের তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পর্যায়ে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি হয়। পরিচিতি পর্বের উপরে থাকবে বিদ্যালয়ের নাম। পরিচিতি পর্বটি দুটো অংশে বিভক্ত করা হয়। তিনটি বিষয়ের পরিচয় এ অংশে প্রদান করা হয়। বামদিকে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক বা শ্রেণি শিক্ষক (এর নাম ও পরিচিতি) শিক্ষার্থীদের তথ্য (সংখ্যা, গড় বয়স) ডান দিকে শ্রেণি, বিষয়, পাঠের বিষয়বস্তু, সময় ও তারিখ।

ফ্রেডারিক হার্বার্ট শিক্ষানীতি

এই পরিচিতি পর্বের প্রতিটি তথ্যের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। শ্রেণি শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ, বোধগম্যতা, বিদ্যালয়টি কোনো এলাকায় অবস্থিত, বিষয়বস্তু কী ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। পাঠটিতে কী কৌশল, উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন কত সময়ের জন্য পাঠ পরিকল্পনাটি তৈরি করা হবে, এমনকি সময়, তারিখ ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব কিছুর উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা প্রদান প্রশ্নের ধরণ, মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

মূলত পরিচিতি অংশটির সকল তথ্যই পরবর্তী অংশের অর্থাৎ পরিকল্পনা তৈরির জন্য সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিখনফল/উদ্দেশ্য (Learning outcomes/objective)

শ্রেণি শিখন কার্যক্রমে বিষয়বস্তুটি নিয়ে কী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে অথবা পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী অর্জন করবে তা এই অংশের শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পাঠের শিখনফল সুনির্দিষ্ট করে থাকেন। আর এর উপর ভিত্তি করেই পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবেন। কোনো পদ্ধতি, উপকরণ, প্রশ্ন, মূল্যায়নের জন্য পদ্ধতি, প্রশ্নমালা তৈরি করবেন। শুধু তাই নয় শিক্ষক শিক্ষার্থী পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় পাঠটিকে অথবা নিজের শিখন শেখানো উপস্থাপনকে কীভাবে সহজ, আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করবেন তাও সুনির্দিষ্ট করবেন।

আচরণিক পরিভাষা বা শিখনফলের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

- সুনির্দিষ্ট, সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট
- পরিমাপযোগ্য
- অর্জনযোগ্য, পর্যবেক্ষণযোগ্য
- নির্ভরযোগ্য
- নির্দিষ্ট সময়

শিক্ষার্থীর আচরণের প্রত্যাশিত পরিবর্তনকে ভিত্তি করে শিখনফল লেখা হবে। এমন ক্রিয়াবাচক শব্দে লিখতে হবে শিখনফল যেন সাধারণ উদ্দেশ্যেরও প্রাসঙ্গিক হয়। এমন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হবে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা সুনির্দিষ্ট করে। যেমন চিহ্নিত করতে পারবে, লিখতে পারবে, বলতে পারবে, প্রয়োগ করতে পারবে, ব্যাখ্যা করতে, বিশ্লেষণ করতে পারবে, যুক্তি প্রদর্শন করতে পারবে, আঁকতে পারবে, পরিমাপ করতে পারবে ইত্যাদি।

বলা হয় কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের আচরণের মধ্যে কী পরিবর্তন হবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান কোনো দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে সে সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট বিবৃতি বা বাক্য হল আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখনফল।

পাঠ পরিকল্পনার পরিচিতি পর্ব এবং শিখনফল এ দুটি অংশ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বের অংশ। আর এ দুটি অংশের উপর ভিত্তি করে কীভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে তার একটি পরিকল্পনা শিক্ষক তৈরি করেন।

প্রস্তুতি থেকে মূলত শ্রেণি শিখন কার্যক্রম শুরু হয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ অংশে কতকগুলো বিষয়ের প্রতি শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন কুশল বিনিময়, শ্রেণি বিন্যাস, প্রয়োজনে বাড়ির কাজ আদায়, পূর্বজ্ঞান যাচাই ও মানসিক পরিবেশে গঠন। সে সাথে পাঠ ঘোষণাও তা বোর্ডে লিখতে হবে। প্রস্তুতি পর্বের এই অংশ ৪/৫ মিনিটের বেশি না হওয়াই বাঞ্চনীয়।

শিখন শেখানো কার্যক্রম

এ অংশটি শ্রেণি কার্যক্রমের মূল পর্ব। বর্তমানে এই অংশটিকে শিখন শেখানো কার্যক্রম বলা হয়। কেননা উপস্থাপনা কখনও প্রস্তুতি পর্বে, এ অংশে শিখন শেখানো কার্যক্রমে এবং মূল্যায়ন অংশে হয়। কখনো শিক্ষক কখনো শিক্ষার্থী শ্রেণি কার্যক্রমে উপস্থাপনা করেন। পাঠ ঘোষণার পরপরই শিক্ষক বিষয়বস্তুর শিখনফলের ধারাবহিকতা অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ অংশে শিক্ষার্থীদের উপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম, সে অনুযায়ী শিখন কৌশল ও প্রয়োজনে যথার্থ উপকরণ ব্যবহার কৌশল ও প্রয়োজনে বোর্ড ব্যবহার করেন। কোনো কৌশলের জন্য কত সময় বরাদ্দ করবেন এবং কীভাবে কাজটি করবেন সে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পাঠ পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকবে। প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করবেন। দলগত কাজগুলো হবে চিন্তন মূলক, জীবন ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্ন ও আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সাথে বিষয়বস্তু আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। মূলত বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষক শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম যেন শেষ হয়। এই অংশটিই সবচেয়ে বেশি সময় নেয়। সুতরাং সেভাবে প্রতিটি পর্ব, সময় উল্লেখপূর্বক পাঠ পরিকল্পনায় উল্লেখ করতে হবে।

মূল্যায়ন

শিখন শেখানো কার্যক্রমের পর শিখনফল যথাযথভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করাই হল মূল্যায়ন। নতুন ভাবে অর্জিত জ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারে কিনা তা এই পর্বে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত শিখনফল অনুযায়ী শিখনের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ দক্ষতা যাচাই করা হয়। শিক্ষার্থী যদি নতুন পরিস্থিতিতে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে সক্ষম না হয় তা হলে বুঝতে হবে শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্যক্রম সফল হয়নি এবং এক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হবে। পাঠ পরিকল্পনা কী এবং এর প্রতিটি ধাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৪.২ বিষয়ভিত্তিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন

এখন বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় পাঠের জন্য পাঠ পরিকল্পনা নুমনা দেওয়া হলো-

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম		
পরিচিতি	শিক্ষকের/প্রশিক্ষণার্থীর নাম	শ্রেণি: নবম/দশম
	ক্রমিক নং	বিষয় : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
	শিক্ষাবর্ষ	আজকের পাঠ : যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠন প্রক্রিয়া
	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	সময় : ৫০ মিনিট
	শিক্ষার্থীর গড় বয়স	তারিখ :
শিখনফল	এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা– স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ উল্লেখ করতে পারবে। ১৯৭২ সনের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবে। সংবিধানের বৈশিষ্টসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	

ধাপ/সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
প্রস্তুতি	৫মিঃ	কুশল বিনিময় করবো পর্যায়ক্রমে ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করবো, ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো ? তাহলে বোঝা গেল এই পতাকা, স্বাধীন একটি ভূখণ্ড আমরা অনেক ত্যাগ, শহীদদের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটির সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দেশটিকে পুনর্গঠন করতে তখন বঙ্গবন্ধু এগিয়ে আসেন। চল আজ সেই দেশ গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করি। এই বলে পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করবো ও বোর্ডে লিখে দিব।	শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবো।	বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, মানচিত্র, পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও অস্ত্র সমর্পণের চিত্র
শিখন শিখানো কার্যক্রম	৭মিঃ	মাইন্ড ম্যাপিং-এর সাহায্যে বঙ্গবন্ধুর উল্লেখ যোগ্য অর্জনসমূহ শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবো।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো খাতায় নোট করবে।	প্রজেক্টরে মাধ্যমে ছবি প্রদর্শন
	৮মিঃ	শিক্ষার্থীদের খাতায় সদ্য স্বাধীন দেশের কী ধরণের দুর্দশা দুঃখ, ধ্বংসলীলা ছিল সেই সত্য কাহিনী যা তাদের গুরুজনদের কাছে শুনেছে সেগুলোই ছবিতে আঁকতে বলবো	শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকবে ও প্রদর্শন করবে	
	৫মিঃ	এরপর প্রজেক্টারে বা চার্টে সদ্য স্বাধীন দেশের পরিস্থিতি প্রদর্শন করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবো।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবেও গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো খাতায় নোট করবে।	যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ছবি

ধাপ/সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
	৫মিঃ	ড. কুদরত-ই-খুদা ও বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রদর্শন করে প্রশ্ন করবো। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ও তার কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করবো	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো খাতায় নোট করবে।	ড. কুদরত-ই-খুদা ও বঙ্গবন্ধুর ছবি
	৫মিঃ	মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে ও ছবি দেখিয়ে সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত আলোচনা করবো।	শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবে।	সংবিধান সংক্রান্ত চার্ট, জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ও অন্যান্য ছবি
	৫মিঃ	শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে নিচের প্রশ্ন দিয়ে লিখতে ও উপস্থাপন করতে বলবো স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপসমূহের একটি তালিকা তৈরি কর।	দলে কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে	
ধাপ/সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
	৫মিঃ	সবশেষে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ও জাতীয় শোক দিবস সম্পর্কে তারা কী জানে প্রশ্ন করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করবো।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো খাতায় নোট করবে।	১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড ও শহীদদের ছবি
মূল্যায়ন	৫মিঃ	নিচের প্রশ্ন দিয়ে মৌখিক মূল্যায়ন করবো বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে কবে ফিরে আসেন তাঁর সময়কার ২/৪টি উল্লেখযোগ্য অর্জন বল সংবিধানের ২/৪টি বৈশিষ্ট্য বল ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কী ছিল? বাড়ির কাজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অর্জনের উপর ছবি সংগ্রহ করে নিজের অভিব্যাক্তি লিখে একটি ছোট পুস্তিকা তৈরি কর।	শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজটি খাতায় তুলে নিবে।	

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা লেখার সময় প্রতিটি ধাপে কতকগুলো বিবেচ্য বিষয় রয়েছে।

যেমন– পাঠ পরিকল্পনা প্রথমেই রয়েছে **বিদ্যালয়ের নাম** যে পাঠপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হচ্ছে তা স্কুলের পরিবেশ (কোনো এলাকা) তার উপর নির্ভরশীল। যে প্রশ্নটি পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের জন্য করা হলো, তা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে।

প্রশ্ন ১ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছো ?

প্রশ্ন ২ কীসের ছবি (জাতীয় সংসদের ছবি সেটি)।

এবার ধরা যাক এ প্রশ্নটি ঢাকার রাজধানী স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটা কী তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে? নিশ্চয়ই নয়। কারণ প্রতিনিয়ত এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংসদ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু যদি পার্বত্য চট্রগ্রাম বা হাওড় অঞ্চলের এক পাড়াগাঁয়ের কোনো বিদ্যালয়ের জন্য এই ছবি প্রদর্শন করে প্রশ্ন করা হতো তাহলেও কিছুটা প্রযোজ্য হতো। রাজধানী বা শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়বস্তুর পরিবেশনার কৌশল গ্রামাঞ্চলের বা অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠের পরিবেশনা ভিন্ন রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং বোঝাই যায় বিদ্যালয়ের নাম পাঠ পরিকল্পনায় কত গুরুত্বপূর্ণ ও যৌক্তিক।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় প্রতিটি ধাপে ভিতরের বক্তব্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করতে হবে।

পাঠ-পরিকল্পনা-১

বিদ্যালয়ের নাম	
শিক্ষকের নাম : ক্রমিক নং : শিক্ষাবর্ষ : শিক্ষার্থীর সংখ্যা : গড় বয়স :	শ্রেণি : বিষয় : পাঠের বিষয় : সময় : তারিখ :
শিখনফল	বিষয়বস্তু ও পাঠের জন্য বরাদ্দকৃত সময় অনুসারে শিখনফল নির্ধারিত হবে। শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো দিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে পাঠের বিষয় অনুযায়ী জ্ঞানমূলক, মনোপেশীজমূলক ও অনুভূতিমূলক শিখনফল উল্লেখ করতে হবে। প্রশ্নের আকারে শিখনফল লেখা যাবে না। নির্দিষ্ট সম্পূর্ণ পাঠের প্রতিফলন শিখনফলে অবশ্যই থাকতে হবে।

ধাপ	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
প্রস্তুতি	৪/৫ মিনিট	(নতুন পাঠ উপস্থাপনে) প্রস্তুতিপর্বে/পাঠসূচনায় এমন প্রশ্ন করা উচিত যাতে বিষযবস্তু আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত হয় এবং পাঠ্যবিষয়ের সথে সম্পর্কযুক্ত হয়। (পুরাতন পাঠ উপস্থাপন ক্ষেত্রে) প্রস্তুতিপর্বে/ পাঠসূচনায় পূর্ব পাঠের অংশ বিশেষ নিয়ে প্রস্তুতিপর্ব চালানো যাবে। সুনির্দিষ্ট উপকরণটি অবশ্যই পাঠ-টীকার সুনির্দিষ্ট পাঠ উপস্থাপন অংশে উল্লেখ করতে হবে। প্রস্তুতিপর্ব, শিক্ষণ শিখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন অংশে] সময় ভাগ করে দিতে হবে। এই অংশে প্রশ্নের উত্তর লেখা যাবে। হ্যাঁ/না লেখা যাবে না। প্রস্তুতিপর্বে ৩/৪টি বেশি প্রশ্নের দরকার নেই অবশ্যই এর মধ্যেই বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন আনতে হবে।		
শিখন শিখানো কার্যক্রম		এই অংশে প্রশ্নের উত্তর লেখার দরকার নাই। তবে পাঠটীকা স্বাক্ষর করা কালে বা শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিপর্যবেক্ষক বই চাইলে দিবেন। সাধারণ উপকরণ পাঠটীকায় (চক, ডাস্টার, বই) উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। তবে পাঠ্য বইটি যদি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন, তবে উপযুক্ত স্থানে উল্লেখ করবেন। শিখন শিখানো অংশের প্রতিটি পর্বের সময় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। এই অংশে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন রকম অংশগ্রহণমূলক কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।		
মূল্যায়ন		মূল্যায়নের প্রশ্ন শিখনফলের আলোকে হতে হবে, যাতে মূল্যায়নের মাধ্যমে সবগুলো শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা সম্ভব। এই অংশের উত্তর লেখার প্রয়োজন নাই। মূল্যায়নের ভিত্তিতেই বাড়ির কাজ থাকবে। সময়ের উল্লেখ থাকতে হবে। বাড়ি কাজ – এটি মূল্যায়নের একটি অংশ		

পাঠ পরিকল্পনার ছক বা নমুনা কাঠামো অনেকভাবেই করা যায়। সাধারণত যখন বি.এড শ্রেণির প্রশিক্ষণার্থীদের শেখানো হয় তখন তাদের বিস্তারিতভাবে প্রতিটি ধাপের বিপরীতে যৌক্তিকতা বুঝিয়ে এ উপরোক্ত ছক অনুযায়ী করা হয়।

কিন্তু যখন আপনি বিদ্যালয়ের শ্রেণি শিক্ষক হিসাবে প্রতিদিনের জন্য পাঠপরিকল্পনা তৈরি করবেন তখন সংক্ষিপ্ত আকারে তৈরি করাই শ্রেয়। কারণ প্রতিদিন ৬/৭টি বিষয়ের পাঠপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে তৈরি করা সহজ নয়।

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা ছক

বিদ্যালয়ের নাম

পরিচিতি	**শিক্ষক**	**শ্রেণি : ৯ম/১০ম**
	আইডি	বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাঠের বিষয়বস্তু :
		সময় : ৫০ মিনিট
		তারিখ :

শিখনফল-

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা - - -

১

২

৩

৪

সোপান	**সময়**	**শিক্ষকের কাজ**	**শিক্ষার্থীর কাজ**	**উপকরণ**
প্রস্তুতি	৫ মিনিট			
উপস্থাপন/শিখন শেখানো কার্যক্রম	১০মিনিট			
মূল্যায়ন	৫ মিনিট			

শিখনফল লেখার জন্য ক্রিয়াপদের তালিকা

শুদ্ধ আচরণিক ক্রিয়াপদ (যা ব্যবহার করা যাবে)	
▪ বলতে পারবে ▪ লিখতে পারবে ▪ উল্লেখ করতে পারবে ▪ পৃথক করতে পারবে ▪ তৈরি করতে পারবে ▪ ব্যবহার করতে পারবে ▪ বিন্যাস করতে পারবে ▪ সাজাতে পারবে ▪ নির্ণয় করতে পারবে ▪ সংশোধন করতে পারবে ▪ দেখাতে পারবে ▪ উদাহরণ দিতে পারবে ▪ সংজ্ঞা দিতে পারবে ▪ সনাক্ত করতে পারবে ▪ নির্দেশ দিতে পারবে ▪ আলাদা করতে পারবে ▪ যুক্তি দিতে পারবে ▪ গঠন করতে পারবে ▪ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ▪ শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে ▪ বর্ণনা করতে পারবে	▪ ব্যাখ্যা করতে পারবে ▪ তুলনা করতে পারবে ▪ আলোচনা করতে পারবে ▪ চিহ্নিত করতে পারবে ▪ অঙ্কন করতে পারবে ▪ পার্থক্য করতে পারবে ▪ চিত্রায়িত করতে পারবে ▪ পাঠ করতে পারবে ▪ মেলাতে পারবে ▪ প্রকাশ করতে পারবে ▪ প্রদর্শন করতে পারবে ▪ হিসাব করতে পারবে ▪ গণনা করতে পারবে ▪ বিশ্লেষণ করতে পারবে ▪ নির্বাচন করতে পারবে ▪ মূল্যায়ন করতে পারবে ▪ যোগ করতে পারবে ▪ বিয়োগ করতে পারবে ▪ গুণ করতে পারবে ▪ ভাগ করতে পারবে

শুদ্ধ আচরণিক ক্রিয়াপদ (যা ব্যবহার করা যাবে)	
অশুদ্ধ আচরণিক ক্রিয়াপদ (যা ব্যবহার করা যাবে না)	
▪ জানতে পারবে ▪ জ্ঞান লাভ করবে ▪ অনুভব করবে ▪ ধারণা পাবে ▪ অনুমান করবে ▪ অনুধাবন করবে ▪ ধারণ করবে ▪ চিন্তা করতে পারবে	▪ বুঝতে পারবে ▪ উপভোগ করবে ▪ মনোযোগ দিতে পারবে ▪ অর্জন করবে ▪ উপলব্ধি করবে ▪ বোধ করবে ▪ শিখতে পারবে

৪.৩ পাঠ পরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনা

পাঠপরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। পাঠপরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনা করতে গেলে কতকগুলো সমশব্দ চলে আসে। যেমন পাঠপরিকল্পনা, একক পরিকল্পনা, বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা ইত্যাদি। এর প্রতিটিই বিষয় শিক্ষক তৈরি করেন। বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষক যেন সময়মতো পাঠ্যপুস্তকটির পাঠ্যসূচি শেষ করতে পারেন। বছরের শুরুতে তিনি যখন বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরি করবেন তখন তিনি সারা বছরের ছুটি, পরীক্ষা এবং সকল প্রকারের বন্ধ বাদ দিয়ে এ বিষয়ের জন্য সারা বছর কতটি ক্লাস পাবেন সেটা হিসাব করে পাঠ্যসূচিগুলোকে ভাগ করবেন। অন্যদিকে একক পরিকল্পনা ও পাঠপরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনা এ ইউনিটে প্রথমে হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষককে প্রতি দিন গড়ে চার-পাঁচটি ক্লাস নিতে হয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে এ চার-পাঁচটি বিষয়ের উপর পূর্ণাঙ্গ পাঠপরিকল্পনা তৈরি করে পাঠদান দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে পাঠদানের সোপানসমূহ অপরিবর্তিত রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন বা পাঠ পরিকল্পনা লেখার জন্য শিক্ষকগণ গুরুত্ব দেন। পাঠভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আকারে প্রণয়নকৃত এ পাঠ পরিকল্পনাকে বলা হয় একক পরিকল্পনা। অন্যভাবে বলা যায় পাঠ্য পুস্তকের সমগ্র পাঠ্য বিষয়কে কতকগুলো একক (Unit) বা অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। এই বিভাজিত অংশগুলো এক একটি একক বা Unit. সুতরাং একক পরিকল্পনা হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে একটি সেশনে বা অধিবেশনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন বা সম্পাদন যোগ্য এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো পাঠের সমন্বয়ে গঠিত একগুচ্ছ শিখন পাঠাংশ।

একক বা ইউনিট পরিকল্পনার ছক

বিদ্যালয়ের নাম :

শ্রেণি : শিক্ষার্থীর সংখ্যা : শিক্ষকের নাম :

বিষয় : অধ্যায়ের নাম : সময় : ৫০ মিনিট (প্রতিটি সেশন বা ক্লাস)

তারিখ	বিষয়বস্তু	শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	শিখন অর্জন যাচাই	শিক্ষা উপকরণ
১					
২					
৩					
৪					

একক পরিকল্পনা তৈরির ধাপসমূহ

বিষয়বস্তু নির্বাচন :

প্রথমে ইউনিটের সকল বিষয়বস্তুকে সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠে বিভক্ত করতে হবে। শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিভাজন করবেন।

শিখনফল নির্ধারণ :

পাঠ্য বইয়ের প্রতিটি ইউনিটের শুরুতে শিখনফল দেওয়া রয়েছে। শিক্ষক এ মূল শিখনফল ভেঙে প্রয়োজনে কয়েকটি শিখনফল তৈরি করবেন। এ শিখনফল হবে মূল শিখনফলের বিভাজিত শিখনফল।

শিখন- শেখানো কার্যাবলি নির্ধারণ :

শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করবেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময় করবে।

শিখন অর্জন যাচাই :

শিখন- শেখানো কার্যাবলি শেষে একজন শিক্ষার্থী আজকের পাঠ কতটা অর্জন করতে পেরেছে তা শিক্ষক বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন বা কাজের মাধ্যমে যাচাই করবেন। অন্যদিকে পাঠগুলো শেষ করার পর এক একটি পাঠের উপর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক এই ধাপে একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তৈরি ও প্রয়োগ করবেন।

একক পরিকল্পনার কতকগুলো সুবিধা রয়েছে। বিষয়ের লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানা এবং সে অনুযায়ী পাঠে এগুনো যায় এবং অর্জিত জ্ঞানকে সমন্বিত আকারে ধরে রাখার উপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর অনুষঙ্গ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। বিষয়বস্তুর ধারণা ও উপলব্ধি দীর্ঘস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে। প্রতিটি ইউনিটের মাধ্যমে বিষয়টি শিক্ষার্থীরা অবগত হয় বিধায় পাঠে আগ্রহী হয়।

অন্যদিকে একক পরিকল্পনার কতকগুলো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। শিক্ষককে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। যদি ঐ শিক্ষকের পেশাগতজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, অন্তদৃষ্টি না থাকে তবে শিখন শেখানো কার্যক্রম ব্যহত হয়।

একক পরিকল্পনার উদাহরণ

একক নং- ১ এককের নাম : স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব শ্রেণি : নবম/দশম			বিষয় : স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতি পাঠের সময় : ৫০মিনিট মোট পাঠ সংখ্যা :		
তারিখ	শিখনফল	পাঠ্য বিষয়	উপকরণ	পদ্ধতি	বিশেষ নির্দেশনা
	বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।	স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব	জাতীয় পতাকা, বাংলাদেশের মানচিত্র, বঙ্গবন্ধুর ছবি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	ছবি ও প্রর্দশন ও চার্ট দলগত কাজ ৭ মার্চ ভাষণের অডিও	

৪.৪ পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োগ-ছদ্মশিক্ষণ, অণুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন

ছদ্মশিক্ষণ বা সিমুলেশন

ছদ্মশিক্ষণ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কৌশল। পাঠদান অনুশীলনীর জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের অনেক সময় প্রকৃত পরিবেশে, প্রতিষ্ঠানে ও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের নির্ধারিত শ্রেণির প্রকৃত পরিবেশের পরিবর্তে কৃত্রিম শিক্ষার্থী সম্বলিত কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষে পরিবেশে যে শ্রেণি শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেই পদ্ধতি হল ছদ্মশিখন। এটি বাস্তব পরিস্থিতির অবিকল চিত্র যা শিখনে মূল্যবান। শিক্ষামূলক ছদ্মশিখন একজন ব্যক্তিকে এ ব্যবস্থায় একজন কর্মক্ষম সদস্য হিসেবে সৃষ্টি করে এবং লক্ষ্য স্থিরকরণে, কর্মসূচি প্রণয়নে, তথ্য বিশ্লেষণে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলে।

তবে ছদ্মশিখনে বয়স্ক অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন বলা যায় কৃত্রিম পরিবেশে অংশগ্রহকারীদের সম্বোধনে, প্রশ্নকরণে, পরবর্তী ক্লাসে নির্দেশিত পাঠ প্রদানে কিছু জড়তা থাকে। স্বাভাবিক প্রশ্নকরণে ও উত্তর প্রদানে এক ধরনের জড়তা ও অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়।

অন্য দিকে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক বা বয়স্ক অংশগ্রহণকারী ছদ্মশিখন পদ্ধতির মাধ্যমে অনুশীলন করে। বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রবেশের পূর্বেই নিজেকে তৈরি করে নেন।

ছদ্মশিখনের প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ কৃত্রিম পরিবেশেই শিখন বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। যেখানে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকায় ও অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীগণ বিদ্যালয়ের মত নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থী হয়ে থাকবে। শুধু তাই নয় পর্যবেক্ষকের ভূমিকায়ও থাকবেন ও নিজেরাই নিজেদের সবল ও দুর্বল দিক নির্দেশ করবেন। মূল্যায়ন ছক পূরণ করবেন। মূল্যায়ন ছক সাধারণত ৫/৭ পয়েন্টের রেটিং স্কেল তৈরি করা হয়।

ছদ্মশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ন নমুনা ছক

প্রশিক্ষণার্থীর নাম :

শ্রেণি :

বিষয় :

পাঠের শিরোনাম :

প্রয়োজনীয় ঘরে টিক চিহ্ন দিন [১ = দুর্বল, ২ মোটামুটি, ৩ = ভাল, ৪ = খুব ভালো, ৫ = চমৎকার]

পর্ব/পর্যায়	বৈশিষ্ট্য	সময়	১	২	৩	৪	৫
প্রস্তুতি	পূর্বজ্ঞান যাচাই						
	মনোযোগ আকর্ষণ						
	শ্রেণি সংগঠন						
	পাঠ ঘোষণা						
	বোর্ডের পাঠ শিরোনাম লিখন						
	প্রস্তুতি পর্বের মন্তব্য						
শিখন শেখানো কার্যক্রম	বিষয় জ্ঞান						
	তথ্য প্রদান						
	পূর্বের পাঠের সাথে অনুষঙ্গ স্থাপন						
	বাচনভঙ্গি						
	প্রশ্ন করার কৌশল						
	উপকরণের যথাযথ ব্যবহার						
	বোর্ডের ব্যবহার						
	সুস্পষ্ট নির্দেশনা						
	দৈহিক ভাষা ও চোখের ব্যবহার						
	শ্রেণি তদারকি						
	সকল শিক্ষার্থীকে পাঠে সম্পৃক্তকরণ						
	উৎসাহ প্রদান						
	মন্তব্য						
শিক্ষার্থীর কর্মের তৎপরতা	শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা						
	শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া/জিজ্ঞাসা						
	বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কৌশলের ব্যবহার						
	শিক্ষার্থীর বোর্ডের কাজ						

পর্ব/পর্যায়	বৈশিষ্ট্য	সময়	১	২	৩	৪	৫
	বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কাজের মৌখিক উপস্থাপনা						
	শিক্ষার্থীর কর্মের তৎপরতা পর্বের মন্তব্য						
মূল্যায়ন	উপযুক্ত প্রশ্নের সুষম বণ্টন						
	উঁচুমানের প্রশ্নকরণ						
	ভিন্নমানের প্রশ্নকরণ						
	প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন						
	অংশগ্রহণমূলক কাজ						
	উৎসাহ প্রদান						
	মূল্যায়ন						
	মূল্যায়ন পর্বের মন্তব্য						
বিশেষ মন্তব্য							

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন

শিক্ষাদান মূলত কতকগুলো দক্ষতার অনুশীলন। একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষাদানের সকল দক্ষতা একই সময়ে নির্ভুলভাবে অনুশীলন করে পাঠদান করা সম্ভব হয় না। এ কারণে একটি সামগ্রিক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সকল দক্ষতার তালিকা তৈরি করে তা থেকে একটি বা দুটি দক্ষতা নির্বাচন করে স্বল্প সময়ের মধ্যে পুন:পুন: অনুশীলনের মাধ্যমে একটি বা দুটি দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় অনুশিক্ষণ। অনুশিক্ষণে বারবার প্রচেষ্টার ফলে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভুলের পরিমাণ কমে আসে এবং শিক্ষক নির্বাচিত দক্ষতা আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অনুশিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এর প্রয়োগ শুরু করে। অনুশিক্ষণ শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের শ্রেণি শিক্ষাদানে দক্ষ করে তোলার জন্য এটা একটি সাফল্যজনক উপায়।

অনুশিক্ষণের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Micro-teaching micro শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ Mikros থেকে। এর অর্থ হলো ক্ষুদ্র এবং teaching অর্থ শিক্ষাদান। পাঠের ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে অনুশীলনের নামই Micro-teaching.

Mc. Knight-এর মতে æMicro-teaching is a scaled down teaching encounter designed to develop new skills and refine old ones". অর্থ্যাৎ অনুশিক্ষণ হলো এমন এক শিক্ষণ কৌশল যার মাধ্যমে বার বার অনুশীলনের দ্বারা নতুন শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত করা এবং পুরাতন দক্ষতার উন্নয়ন সাধন।

Allen and Eve-এর মতে, æMicro- teaching is a system of controlled practice that makes to concentrate on specific behavior to practice teaching under controlled condition." অর্থ্যাৎ নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষামূলক আচরণের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পাঠদানের কৌশলকে অনুশিক্ষণ বলে।
Oxford dictionary এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অনুশীলন বলতে বুঝায়-"A method of teacher training, designed to develop specific skills, which involves the teaching of a small class for a short time followed by analysis of (usually a film recording of) the session. "

অনুশিক্ষণ চক্র

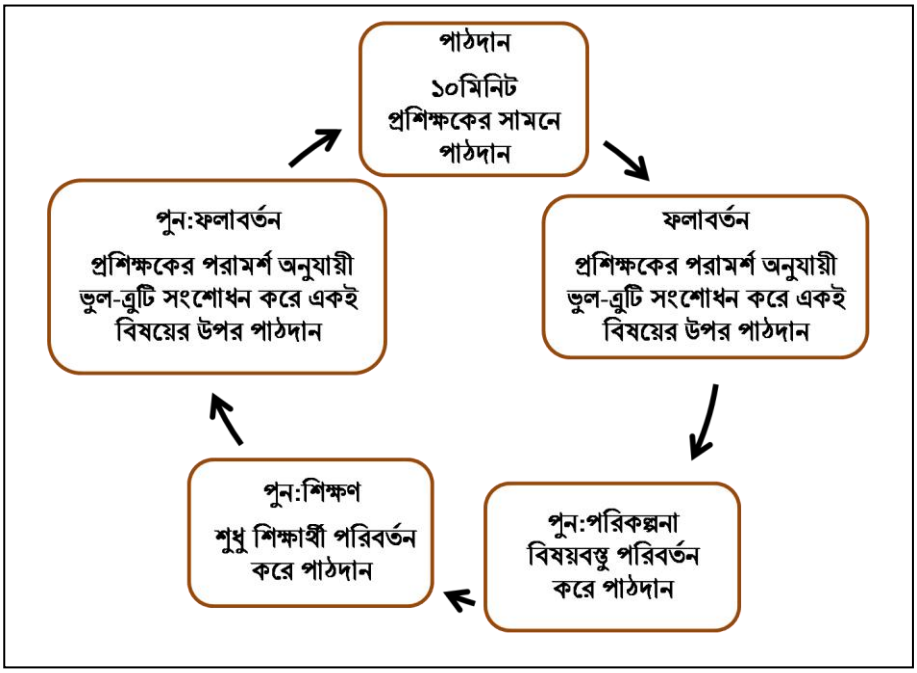

চিত্র : অনুশিক্ষণ চক্র

অনুশিক্ষণে শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ত না করে অনুশীলনের মাধ্যমে একবারে একটি বা দুটি কৌশল বা দক্ষতাকে আয়ত্ত করা হয়। তাই সমগ্র শিক্ষাদানকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে অনুশীলন করাই অনুশিক্ষণ।

অনুশিক্ষণ কৌশল

স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাভুক্ত ১৪টি কৌশল–

১. পাঠ উপস্থাপন
২. উদ্দীপনার তারতম্য
৩. সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রশ্ন
৪. বলবৃদ্ধিকরণ
৫. প্রশ্নকরণের দ্রুততা
৬. উচ্চমানের প্রশ্নের ব্যবহার
৭. বিভিন্নমূখী প্রশ্ন
৮. সমাপ্তিকরণ পদ্ধতি
৯. শিক্ষকের নিরবতা ও ভাষাহীন ইঙ্গিত
১০. মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি
১১. বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার
১২. বক্তৃতাকরণ বা বাচনভঙ্গি
১৩. পরিকল্পিত পুনরুক্তি
১৪. সংযোগের পূর্ণতা সাধন

ক্যালিফোর্নিয়ার ফার ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীতে আরও ৪টি দক্ষতা যুক্ত করে। এগুলো হলো–

১. শ্রবণ-দর্শন উপকরণের ব্যবহার
২. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রাণবন্ততা
৩. দলগত আলোচনায় উৎসাহব্যঞ্জক ইঙ্গিত
৪. শিক্ষকের ব্যাখ্যা

অনুশিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত করার কৌশল

- সাধারণত ৫-৭ মিনিটের উপযোগী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।
- সমগ্র পাঠটি ভিডিও করা হয়।
- সতীর্থদের দিয়ে পাঠ পর্যবেক্ষণ করানো এবং পর্যালোচনা করা হয়।
- বিশেষজ্ঞগণ পাঁচ থেকে সাত পয়েন্ট স্কেলের একটি মূল্যায়ন শীটের মাধ্যমে মূল্যায়ন করেন।
- শিক্ষণ শেষে বিশেষজ্ঞগণ তাদের পূরণকৃত মূল্যায়ন শীট নিয়ে আলোচনা করে প্রশিক্ষণার্থীকে অবহিত করেন এবং উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দেন।
- প্রথম পাঠদানের স্বল্পবিরতি পরে প্রশিক্ষণার্থী পুন:পরিকল্পনা করে পুনরায় অন্য একদল শিক্ষার্থীর সামনে আবার পাঠদান করেন।
- দ্বিতীয় বারে আবার পাঠের পুর্বের নিয়মে প্রশিক্ষণার্থীর ভুলত্রুটি নিয়ে পর্যালোচনা করে উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান কর হয়।
- যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশিক্ষণার্থীর ভুলত্রুটি পুরোপুরি সংশোধিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চক্রাকারে চলতে থাকে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিষয়বস্তু ব্যবহার করে অনুশিক্ষণ দক্ষতা অনুশীলন

স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাভুক্ত ২টি কৌশল-

১. পাঠ প্রস্তুতি
২. বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার

এ দুটি কৌশল ব্যবহার করে অনুশিক্ষণ দক্ষতার অনুশীলণের উদাহরণ দেওয়া হলো-

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক :	শ্রেণি : নবম / দশম
কৌশল : ভিডিও প্রদশন ও প্রশ্নোত্তর	তারিখ :
	সময় :

১। উদ্দেশ্য : ৭ মার্চ ভাষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ	
২। শিখন কৌশল ভিডিও প্রদর্শন ও প্রশ্ন উত্তর ক) সূচনা খ) বিকাশ সাধন (শিখন শেখানো কার্যক্রম) গ) সমাপ্তি ঘ) উপকরণ	
৩। শিক্ষকের আত্মসমালোচনা	
৪। পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষণ আলোচনা	

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাঠ পরিকল্পনার ধাপগুলোর নাম লিখুন।
২. হার্বার্টের পঞ্চ সোপান কী ?
৩. শিখনফলের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪. পাঠপরিকল্পনায় মূল্যায়ন কোনো অংশে থাকে ?
৫. ইউনিট পরিকল্পনা কী ?
৬. ছদ্মশিক্ষণের ২টি সীমাবদ্ধতা লিখুন।
৭. অনুশিক্ষণের কৌশলগুলো লিখুন।
৮. অনুশিক্ষণ দক্ষতা অনুশীলনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের যে কোনো বিষয়বস্তুর উপর ৫০মি: উপযোগী একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।
২. শিখনফলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক শিখনফল লেখার জন্য ক্রিয়াপদের তালিকা তৈরি করুন।
৩. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের জন্য ছদ্ম শিক্ষণ ও অনুশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করুন।

তথ্যসূত্র

১. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ, TQI প্রজেক্ট
২. আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, TQI প্রজেক্ট
৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ৯ম/১০ম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৪. শিক্ষা ব্যবস্থাপনা HSTTI মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৫. ৯ম/১০ম শ্রেণি শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক সিপিডিপ্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, TQI প্রজেক্ট
৬. আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, ড. শেখ আমজাদ হোসেন, প্রভাতী লাইব্রেরি ঢাকা।
৭. শিক্ষানীতি, প্রফেসর গিয়াস উদ্দিন আহমদ, ড. আজহার আলী, প্রফেসর শামসুল কবীর, মুহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, ঢাকা আহসানিয়া মিশন।
৮. পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণি সংগঠন, মো: আজহার আলী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৯. শিক্ষণে সামাজিক বিজ্ঞান, সালমা ইয়াসমিন, ফাতেমা বিলকিস, প্রভাতী লাইব্রেরি ঢাকা।

ইউনিট ৫ : শিক্ষা উপকরণ

সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি, প্রভৃতি থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে নিয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের পাঠ্যসূচি রূপায়িত। এখানে বিষয়বস্তুতে অতীত বর্তমান যেমন আছে তেমনি নিজ দেশের সীমারেখা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত। যেমন খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান সম্পর্কীয় দেশীয় বৈচিত্র্যের যেমন উল্লেখ আছে তেমনি পৃথিবীর বিশেষ দেশের জলবায়ু, খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভ করতে হয়। এসব বস্তুগত বিষয়কে শিক্ষার্থীদের সামনে শুধু বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপন করলে তা কখনো হৃদয়গ্রাহী হয়ে শিক্ষার বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে পারবে না। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ। এর মাধ্যমে দেখা এবং শুনার সমন্বয়ে শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এস. কে. কোচ-এর ভাষায়, An instruction aid is any device that assists an instruction to transmit to a learner facts, skills, attitudes, knowledge, understanding and appreciation. শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজন মতো শিক্ষক যেমন উপকরণ ব্যবহার করবেন, তেমনি শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থী বহু সামগ্রীর সাহায্য গ্রহণ করবে। এমনকি শিক্ষার্থীকে প্রকল্প রূপায়ণ বা সমস্যা সমাধানের জন্য হাতে কলমে কাজ করতে হবে। অন্যথায় বস্তুগত বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ সম্ভব না ও হতে পারে । তাই বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় শিক্ষাদান ও জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষা উপকরণ এর গুরুত্ব অপরিহার্য।

এই ইউনিটে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হলো-

৫.১ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণ
৫.২ উপকরণ হিসাবে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও ব্যবহার
৫.৩ সামাজিক মেলার পরিকল্পনা, আয়োজন ও পরিচালনা

৫.১ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ব্যবহার ও সংরক্ষণ

শিক্ষা উপকরণের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Teaching Aids বাংলায় এর অর্থ হলো "শিক্ষার জন্য সহায়কবস্তু বা সাহায্যকারী জিনিসগুলো"। সহজ কথায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য বিষয় বস্তুগত জ্ঞান ছাড়া শিক্ষক অন্যান্য যে সব দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করেন যা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল, স্পষ্ট ও শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তাকে পাঠ উপকরণ বলে। সুতরাং শিখনকে স্থায়ী, সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য পাঠ সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যে সকল শিক্ষা সহায়ক বস্তু বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এর শিক্ষণ-শিখনের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের শিক্ষোপকরণ বলা হয়। যেমন–পাঠ্যপুস্তক, জার্নাল, বেতার, মানচিত্র, ছবি, টেলিভিশন প্রভৃতি। চীন দেশে বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে, 'One picture is worth than 10,000 words' অর্থাৎ দশ হাজার শব্দ ব্যবহার করে যে বিষয় বুঝানো যায় না, সেক্ষেত্রে মাত্র একটি ছবি দ্বারা তা সহজে বোধগম্য করা সম্ভব।

শিক্ষা উপকরণের শ্রেণীবিভাগ

সাধারণত শিক্ষোপকরণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. শ্রবণভিত্তিক উপকরণ (Audio Aids)
২. দর্শনভিত্তিক উপকরণ (Visual Aids)
৩. শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণ (Audio- Visual Aids)

শ্রবণভিত্তিক উপকরণ(Audio Aids) : যে সকল উপকরণের সাহায্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের বিষয়বস্তু শ্রবণ ইন্দ্রিয় মাধ্যমে সহজে বুঝতে সহয়তা করে সেগুলোকে শ্রবণভিত্তিক উপকরণ বলে। যেমন– বেতার, মোবাইল, অডিও ক্যাসেট, টেপ রেকর্ডার, বক্তৃতা, আলোচনা, এপিডায়াস্কোপ ইত্যাদি।

মোবাইল

রেডিও

চিত্র : শ্রবণভিত্তিক উপকরণ

দর্শনভিত্তিক উপকরণ(Visual Aids) : যে সকল উপকরণের সাহায্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের বিষয়বস্তু দেখার উপযোগী এবং দর্শন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে সহজে বুঝতে সহয়তা করে সেগুলোকে দর্শনভিত্তিক উপকরণ বলে। যেমন– হোয়াট বোর্ড, মডেল, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের পাঠ্যবই, গ্লোব, ছবি, বুলেটিন বোর্ড, ফ্লানেল বোর্ড প্রভৃতি।

গ্লোব

বুলেটিন বোর্ড

চিত্র : দর্শনভিত্তিক উপকরণ

শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণ(Audio- Visual Aids) : শ্রবণ ও দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে সহয়তা করে সেগুলোকে শ্রবণ ও দর্শনভিত্তিক উপকরণ বলে। যেমন– টেলিভিশন, ল্যাপটপ, সিনেমা ইত্যাদি।

টেলিভিশন

ল্যাপটপ

চিত্র : শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণ

এছাড়াও অন্যান্য শিক্ষাপোকরণ রয়েছে যেমন :

কর্মসম্পাদনমূলক শিক্ষা উপকরণ (Work Oriented Teaching Aids) : যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বাহিরে বাস্তব পরিবেশে হাতে কলমে কাজ করা সুযোগ পায় এবং এর মাধ্যমে শিখন বিষয়ে তারা বাস্তব ধারণা লাভ করতে সমর্থ হয় সেগুলোকে কর্ম সম্পাদনমূলক উপকরণ বলে। দর্শনীয় বস্তু, দর্শনীয় স্থান, নকশা, গ্রাফ, ছবি, খামার, মিউজিয়াম, প্রকৃতি ইত্যাদি।

দর্শনীয় স্থান (পাহাড়পুর)

ছবি (গ্রামবাংলা)

চিত্র : কর্মসম্পাদনমূলক শিক্ষা উপকরণ

অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা উপকরণ (Investigatory Teaching Aids) : এমন কিছু উপকরণ আছে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন তথ্য খুঁজে পায়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে পারে তাকে অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা উপকরণ বলে।

শিক্ষা প্রযুক্তির মূলক উপকারণ (New Contriution of Educational Aids) : বর্তমান সময়ে যে সব উপদান শিখন-শেখানো কার্যক্রমে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে তারমধ্যে অন্যতম উপাদান হচ্ছে আইসিটির ব্যবহার। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারকে নতুন অবদান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

শিক্ষা উপকরণের প্রধান প্রকারভেদ বা ধরণ

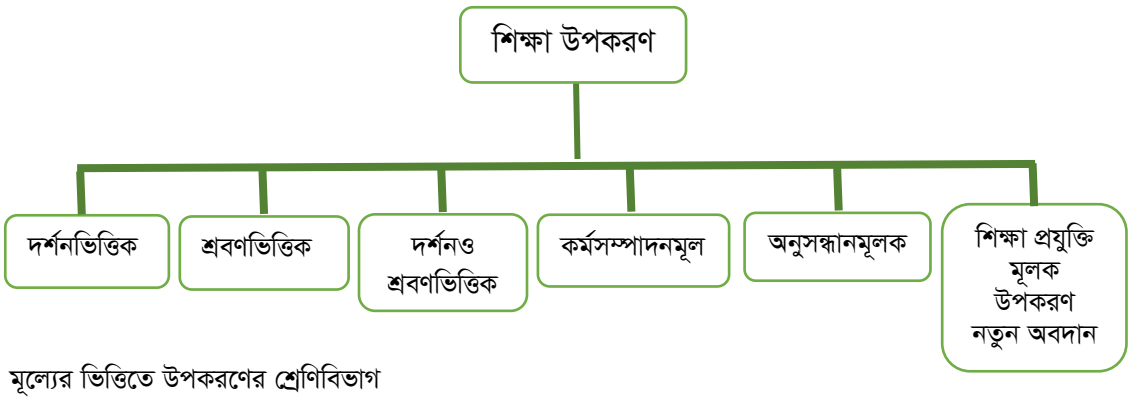

মূল্যের ভিত্তিতে উপকরণের শ্রেণিবিভাগ

- স্বল্প মূল্যের উপকরণ-বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের জন্য এমন অনেক উপকরণ আছে যা কেনার জন্য নাম মাত্র মূল্যের প্রয়োজন হয় যেমন–মানচিত্র, নকশা, চার্ট, সূর্যের অবস্থানের চিত্র, বিভিন্ন মডেল প্রভৃতি।

- নিঃখরচার উপকরণ-যে সমস্ত উপকরণ বিনা খরচে পাওয়া যায়, এর জন্য কোনো অর্থ খরচের প্রয়োজন হয় না। যেমন– কাদা মাটি দিয়ে তৈরি পাহাড়-পর্বত, ভূ-প্রকৃতি ও আগ্নেয়গিরির মডেল, শোলা, পাট দিয়ে তৈরি বিভিন্ন উপকরণ, মাটি দিয়ে তৈরি নদী ও নদীর উৎসের মডেল, পুরানো ক্যালেন্ডার দিয়ে তৈরি ছবি, চার্ট ও নকশা ইত্যাদি।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। H.N.Saunders-এর মতে, æNo wise man refuses help and no wise teacher ignores aid”

- উপকরণ বিমূর্ত জ্ঞানকে সহজবোধ্য করে তোলে
- বিষয়বস্তু সহজ ও স্বাভাবিক হয়
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়
- শিক্ষার্থী মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে পাঠ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।
- অর্জিত জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা সম্ভব হয়।
- কর্মমুখী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়
- পাঠ আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হয়
- পাঠে একঘেয়েমী দূর হয়
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও কর্মঠ করে তোলা যায়
- শিখন ফলপ্রসূ ও স্থায়ী হয়
- পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- সময়ের সঠিক ব্যবহার করা যায়
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী সু-সম্পর্ক তৈরি হয়
- অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়
- সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়

শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠন আকর্ষণীয়, গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ করতে হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষার্থীদের সামনে কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয়গুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণের সহায়তায় উপস্থাপন করতে পারলে তারা অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং দীর্ঘকাল তা শিক্ষার্থীর মনে টিকে থাকে।

শিক্ষা উপকরণ তৈরি

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের বিষয়বস্তু বিষয়ের জন্য পাঠ সহায়ক উপকরণ তৈরি করা একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ নয়, কিছু সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন মাত্র। এছাড়া যে কোনো বিষয়ের জন্য একবার উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরি করতে পারলে তা বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন পাঠে ব্যবহার করা সম্ভব। এজন্য পরিবেশ থেকে পাঠ সহায়ক শিক্ষোপকরণের প্রয়োজনে কিছু বাস্তব জিনিসপত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের বিষয়বস্তুর জন্য সহজলভ্য জিনিসপত্র দিয়ে স্থানীয়ভাবে কিছু শিক্ষা উপকরণ তৈরি করাও কঠিন কাজ নয়। পাঠদানের জন্য সহজভাবে তৈরি বা সংগ্রহীত শিক্ষা উপকরণ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যথা :

বাস্তব জিনিস

আমরা সহজেই স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের বিষয়বস্তুর জন্য বাস্তব উপকরণ সংগ্রহ করতে পারি। আমাদের হাতের কাছে এমন কিছু জিনিসপত্র অহরহই পাওয়া যায়, যা শিক্ষক নিজে কিংবা শিক্ষার্থীদের দিয়ে সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করে পাঠদানকে বাস্তবভিত্তিক, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করে তুলতে পারেন। যেমন– গাছ, পাতা, পোশাক, তালপাতার পাখা, মাটির হাড়ি, বিভিন্ন প্রকার শিলা ইত্যাদি।

মডেল

শ্রেণিকক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জিনিসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেওয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে বাস্তব জিনিসের মডেল তৈরি করে তা শ্রেণিতে প্রদর্শন করা যেতে পারে। শহীদ মিনার, তাজমহল, পিরামিড, সৌরজগৎ ইত্যাদি মডেল তৈরি করে দেখালে শিক্ষার্থীরা বাস্তবের কাছাকাছি অভিজ্ঞতা অর্জন করে সহজেই পাঠ্যবিষয় অনুধাবন করতে পারবে এবং প্রচুর আনন্দ পায়।

চার্ট

এমন অনেক বিষয় আছে যা বক্তৃতার সাহায্যে বোঝানো অপেক্ষা চার্টের মাধ্যমে বোঝানো সহজ হয় এবং যা শিক্ষার্থীদের মনে রাখাও সুবিধা হয়। চার্ট বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন–

- বৃক্ষ চার্ট–কোনো বিষয়বস্তুকে বৃক্ষ চার্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। এতে মূলবিষয় থেকে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বোঝানো সম্ভব।
- প্রবাহ চার্ট-এর মাধ্যমে মূল বিষয় থেকে অন্যান্য মূল বিষয় কিভাবে বের হয় তা তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো সম্ভব।
- বৃত্তাকার চার্ট এতে একটি বৃত্তের মধ্যে সমগ্র বিষয়ের গুরুত্ব দেখানো সম্ভব।
- পরিসংখ্যান চার্ট এর মাধ্যমে কোনো বিষয়ের পরিসংখ্যানগুলো তুলে ধরে বিষয়টি কে অর্থবহ করা সম্ভব।

ছবি

ছবির সাহায্যে অনেক বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করা সম্ভব। শিক্ষাদান ক্ষেত্রে ছবি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ছবি বলতে ক্যামেরায় তোলা ফটোগ্রাফও হতে পারে, আবার শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবিও হতে পারে। ছবি আঁকতে না পারলে বিভিন্ন ক্যালেন্ডার, পুরানো পত্র পত্রিকা, পোস্টার ইত্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় ছবি কেটে ফ্রেমে বা পোস্টার পেপারে পেস্ট করে শ্রেণীতে প্রদর্শন করা যেতে পারে। কোনো কোনো ছবির টেমপ্লেট কেটেও শিক্ষক সময়মতো বোর্ডে এঁকে দিতে পারেন।

নকশা

নকশার ছবির মতো জিনিসটির পূর্ণ হুবহু রূপ না দেখিয়ে কেবলমাত্র আকার-আকৃতিতেই দেখানো হয়। জ্যামিতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সঠিকভাবে অঙ্কন করে দেখানো দরকার। কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন হলে নকশায় রঙিন চক বা পেন্সিল ব্যবহার করা যেতে পারে।

মানচিত্র

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের ভূগোল, ইতিহাস, সমাজপাঠ অংশের পাঠদানে মানচিত্রের ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষক খালি হাতে মানচিত্র আঁকতে পারেন না। এজন্য তিনি পূর্বাহ্নের বিভিন্ন জায়গায় মানচিত্র যোগাড় করে শক্ত কাগজের উপর কেটে নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তা বোর্ডে এঁটে বোঝাতে পারেন।

গ্লোব

পৃথিবীর নক্সা হিসেবে মানচিত্রের প্রয়োগ থাকলেও পৃথিবীর আকৃতি, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে দূরত্ব ইত্যাদি মানচিত্রে ধারণ করা সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে কঠিন হয় বলে পৃথিবীর প্রতিকৃতি হিসেবে গ্লোব প্রস্তুত করা হয়। শিক্ষক ইচ্ছা করলে পুরানো কাগজপত্র দিয়ে মানচিত্র তৈরি করে পৃথিবীর গোলাকৃতি রূপ দিতে পারেন এবং পরে ট্রেসিং পেপার বাজারে কেনা গ্লোবের উপরে নকশা এঁকে গোলাকৃতির উপর স্থাপন করে অতি সহজেই নিজে গ্লোব তৈরি করতে পারেন। স্থানীয় বাবে যা কিছু কাঁচামাল পাওয়া যায়, তা দিয়ে যথাসম্ভব ভালোভাবে পরিকল্পনা করেই শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা উচিত। খেয়াল রাখতে হবে যে, এটি যেন বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় এবং তৈরি জিনিস শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যবহারের উপযোগী হয়।

উপকরণ তৈরিতে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া উচিত-

- শিক্ষার্থীদের বয়স, পূর্বজ্ঞান পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা, ক্ষমতা ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষা উপকরণ তৈরির পরিকল্পনা করা আবশ্যক
- বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিবেচনা করে নির্দিষ্ট পাঠের জন্য তৈরি উপকরণ আদৌ পাঠসহায়ক উপকরণ হবে কি না
- সময় ও খরচে মিতব্যয়ী
- ব্যবহারে বহুমাত্রিকতা থাকতে হবে
- শৈল্পিকতা থাকতে হবে
- বহনের সুবিধা
- যে উপকরণটি তৈরি করা হবে তা দিয়ে শিক্ষার্থীদের কতটুকু উপকার হবে
- কোনো পন্থা অবলম্বন করলে উপকরণটির দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে পাঠের প্রতি আগ্রহ বাড়ানো সম্ভব হবে
- প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদানে এটি ব্যবহার করা যাবে কি না
- উপকরণের কাঁচামাল, স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য কিনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে পাওয়া সম্ভব কি না
- শিক্ষক নিজেই একটি উপকরণটি তৈরি করতে পারবেন, নাকি ছাত্র, অভিভাবক কিংবা অন্য কোনো বিশেষজ্ঞ কারিগরের সাহায্য প্রয়োজন হবে
- সাধারণ হাতযন্ত্র কিংবা স্বল্পমূল্যের যন্ত্রপাতির সাহায্যে কম সময়ে তৈরি করা সম্ভব কিনা
- উপকরণটি কতদিন পর্যন্ত ব্যবহারের যোগ্য থাকবে, কিভাবে প্রস্তুত করলে তার স্থায়িত্ব আরো বাড়ানো সম্ভব
- শিক্ষাপোকরণটির কাঠামো শ্রেণিতে ব্যবহার-উপযোগী কিনা

শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার

শিক্ষা উপকরণ তৈরি করার পর তার ব্যবহার-উপযোগিতা যাচাই করা আবশ্যক। শিক্ষক পাঠদানে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষা উপকরণ কি পরিমাণ সাহায্য করতে সক্ষম তা পরখ করে দেখার পরই মন্তব্য করা যাবে যে, শিক্ষা উপকরণ শিক্ষোপযোগী হয়েছে কিনা। শিক্ষোপকরণের সুবিবেচনাপ্রসুত ব্যবহারই শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও উপাদেয় করতে পারে। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য এর পরিকল্পনা প্রয়োগ ও পরখ করে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে তৎপর না হয়ে পারে না ।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের নীতিমালা

- উপকরণ পাঠ্য বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা
- উপকরণকে শিক্ষাক্রমের সাথে সমন্বয় করা
- পরিকল্পিতভাবে উপকরণ ব্যবহার করা
- চাকচিক্য পরিহার করা
- উপকরণ ব্যবহারের পূর্বে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা
- শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণি ও মেধার সাথে উপকরণ সঙ্গতিপূর্ণ রাখা
- অর্থপূর্ণ ও সহজভাবে উপস্থাপন করা

- যথাযথ ও সার্থক উপকরণ ব্যবহার করা
- শ্রেণি উপযোগী করে ব্যবহার করা
- দৃষ্টিনন্দন উপকরণ ব্যবহার করা

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহারের জন্য নিম্নিলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি আরো সতর্ক থাকতে হবে-

শিক্ষা উপকরণ বাছাই : শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ ক্ষমতা, আগ্রহ ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে কি ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার যথোপযুক্ত হবে তা নির্বাচন করা বা বাছাই করা আবশ্যক।

শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি : শিক্ষক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করার পূর্বেই তার পূর্ণ ব্যবহারের কলা কৌশল আয়ত্ত করবেন, যাতে ক্লাসে গিয়ে কোনো সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন না হন।

উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা : শিক্ষক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের কারণ বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজে অবহিত থাকবেন এবং শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে সেই উদ্দেশ্য কতটকু সফল হয়েছে তাও সচেতনতার সাথে লক্ষ্য করবেন।

শিক্ষাপোকরণ সংরক্ষণ : শিক্ষা উপকরণ যদিও আলমারিতে সাজিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় না, তবুও যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে এগুলো নষ্ট হতে পারে, হারিয়ে যেতে পারে। এজন্য শিক্ষককে সাধারণ মেরামতের কাজটুকু নিজেকেই জানতে হবে, করতে হবে। শিক্ষা উপকরণ যথার্থভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে বছরের পর বছর তা ব্যবহার করা সম্ভব।

- পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, জীবাণুমুক্ত, আলো-বাতাসযুক্ত ভিন্ন কক্ষে উপকরণ রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- মূল্যবান উপকরণ লকারে রাখা
- ব্যবহারের গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়ে রাখা
- বিষয় অনুসারে সংরক্ষণ করা
- ভঙ্গুর ও পচনশীল উপকরণ আলাদা রাখা
- সময় আবহাওয়া ও ঋতুভেদের উপর গুরুত্ব দিয়ে উপকরণ সংরক্ষণ করা
- কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করা
- সমগ্র উপকরণ যথাযথ নাম ও তথ্যযুক্ত লেবেলিং করা
- পোস্টার, ছবি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা
- স্টক রেজিস্টারের মাধ্যমে উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা

৫.২ উপকরণ হিসাবে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি পরিচালনায় যে সকল উপকরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে পাঠ্য বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট সহজ, আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলা হয় এবং শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে। ১৮০১ সালে ব্রিটিশ শিক্ষা বিজ্ঞানী জন অ্যাডাম প্রথম শিক্ষাক্ষেত্রে উপকরণের ব্যবহার শুরু করেন। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উপকরণের ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু আাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষোপকরণ এর ব্যবহার শুরু হয় বিংশ শতকের আশির দশক থেকে। একবিংশ শতাব্দি শুরু হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে। পাওয়ার পয়েন্ট এ বিভিন্ন প্রোগ্রামের ডিজাইন ও এ্যানিমেশনের মাধ্যমে তৈরি করা হয় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ যা ডিজিটাল কনটেন্ট নামে পরিচিত।

উপকরণ হিসাবে ডিজিটাল কনটেন্ট

পাঠ্যবইয়ের যে কোনো কঠিন বিষয়বস্তুকে শিক্ষা সহায়ক ও পাঠ সংশ্লিষ্ট ভিডিও, ছবি, এ্যানিমেশন ইত্যাদি ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম হৃদয়গ্রাহি করে তোলে এবং দুর্বোধ্য বিষয়গুলোকে শিক্ষার্থীদের নিকট সহজভাবে উপস্থাপন করার একটি শক্তিশালী আধুনিক বৈজ্ঞানিক পাঠদান পদ্ধতি। ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন করেন। ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষক নিজে বা বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করেন। ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নব দিগন্তর সূচনা করেছে। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে একাধিক স্লাইডের সাহায্যে যে কোনো মূর্ত-বিমূর্ত বিষয়বস্তুকে অতি সহজেই পাঠদান করা সম্ভব। এতে পাঠদান যেমন আনন্দদায়ক হবে তেমনি হবে সহজবোধ্য। পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তা দক্ষতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। একটি স্লাইড প্রদর্শন করে জোড়ায় বা দলগত কজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে সহযোগিতামূলক মনোভাব বাড়ানো যায়। একটি-দুটি স্লাইড, ছোন একটি ভিডিও ক্লিপ, অডিও ক্লিপ, একটি ছবি ২D বা ৩D এ্যানিমেশন, একটি পিডিএফ ফাইল, টেক্স ফাইল, কোনো ওয়েবসাইট ইত্যাদি সব

কিছুই এক একটি ডিজিটাল কনটেন্ট। শিক্ষা বিজ্ঞানের ভাষায় একটি ছবি হাজারো শব্দের চেয়ে উত্তম। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির জন্য একজন শিক্ষকের কম্পিউটার সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অল্প কিছু দক্ষতা যেমন কম্পিউটার অফ ও অন করা, বিভিন্ন আইকন সম্পর্কে পরিচিতি, ফাইল ও ফোল্ডার খোলা, এম, এস ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইত্যাদি প্রাথমিক ধারণার প্রয়োজন হয়।

সহজ কথায় বলা যায়, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিখন সহায়ক যে সকল উপকরণ প্রস্তুত করা হয় তাকে ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ বলে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত যে কোনো প্রকার তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন ও বিস্তরণের উপযোগী সকল ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তিই ডিজিটাল প্রযুক্তি। যেমন– কম্পিউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। এইসব ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন রকমের আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা যায় যা গতানুগতিকভাবে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত উপকরণের চেয়ে অধিক কার্যকর। যেমন– সৌরজগত বিষয়টি পাঠদানের জন্য শিক্ষক ইন্টারনেট থেকে সৌরজগতের প্রত্যেক গ্রহের একটি বাস্তব চিত্র ডাউনলোড করলেন এবং Youtube থেকে গ্রহগুলো পরিভ্রমণের একটি সুন্দর ভিডিও চিত্র ডাউনলোড করলেন এরপর ছবি ও ভিডিও চিত্রকে পাওয়ার পয়েন্ট এ যথাযথভাবে সাজিয়ে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে শ্রেণিতে উপস্থাপন করলেন। এতে শিক্ষার্থীরা সহজে বিষয়টি বুঝতে পারবে ও শিখন স্থায়ী হবে।

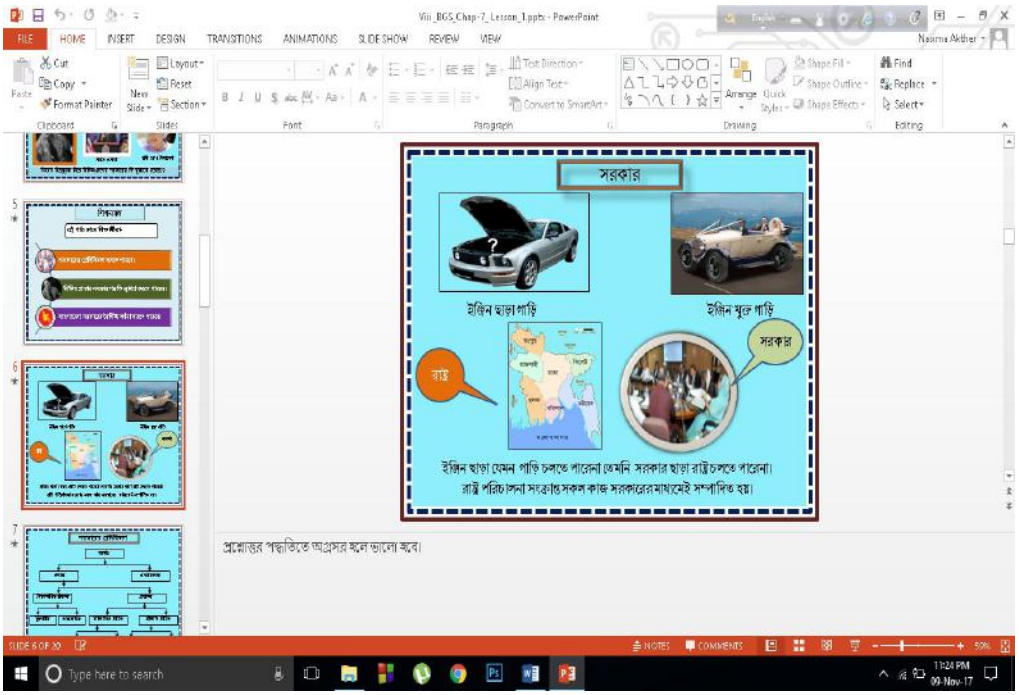

চিত্র : ডিজিটাল কনটেন্ট

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বৈশিষ্ট্য

- ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- পাঠের শিখনফল অর্জনে সহায়ক হতে হবে।
- শিক্ষার্থীর বয়স উপযোগী হতে হবে।
- আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- ডিজিটাল কনটেন্ট এ ব্যবহৃত ছবি ও ভিডিও সঠিক হতে হবে। কোনো ভুল তথ্য বা ধারণা দেওয়া যাবেনা।
- ডিজিটাল কনটেন্ট ছবি, ভিডিও, এ্যানিমেশন প্রসঙ্গিক ও দেশীয় হতে হবে।
- ডিজিটাল কনটেন্ট দৃষ্টিনন্দন হবে যেন শিক্ষার্থীরা শিখতে উৎসাহিত এবং আগ্রহ নিয়ে শিখে।
- ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরিতে মূল্যায়ন, অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ডিজিটাল কনটেন্ট এ ব্যবহৃত ছবি, ভিডিও, শব্দ, বাক্য/লেখা ইত্যাদি হতে হবে পরিস্কার, স্পষ্ট ও আকারে বড় যেন পেছনের বেঞ্চে বসা শিক্ষার্থীরাও ভালোভাবে দেখতে ও বুঝতে পারে।

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির দক্ষতাসমূহ

মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমে একজন শিক্ষক যে কোনো শিক্ষার্থীর সব ধরনের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এতে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী পরিতৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে পারে। আর এই পরিতৃপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠের বিষয়কে আকর্ষণীয় করে তুলতে একটি ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির যে দক্ষতাসমূহ প্রয়োজন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

- ভিডিও উপকরণ
- অডিও উপকরণ
- পিকচার/ইমেজ
- ওয়েবভিত্তিক উপকরণ
- এনিমেশন

ভিডিও উপকরণ

ডিজিটাল কনটেন্ট একটি শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট, টিভি, সিডি-ও ডিভিডি, মোবাইল, ট্যাব ইত্যাদি ব্যবহার করে আমরা আমাদের পাঠ সংশ্লিষ্টভিডিও ক্লিপ পেতে পারি বা সংগ্রহ করতে পারি। ইন্টারনেটে youtube, teachertube, e-how.com, discovery education ইত্যাদিতে আমাদের কন্টেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় ভিডিও পাওয়া যায়। পাঠের জটিল বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য খুবই কার্যকরী। এছাড়া বিভিন্ন লেকচার ভিত্তিক ও টিউটোরিয়াল ভিত্তিক ওয়েবসাইট থেকে ভিডিও সংগ্রহ করা যায়। অনেক সময় একটি সাধারণ ক্যামেরা বা মোবাইল ফোনের ক্যামেরা ব্যবহার করে কোনো বিষয়, ঘটনা, রোল প্লে, ইত্যাদি ভিডিও করে ডিজিটাল কনটেন্টই তৈরি করা যায়।

অডিও উপকরণ

ডিজিটাল কনটেন্ট অডিও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ। প্রকৃতি, প্রাণী, বিশেষ ঘটনা, ভাষণ, সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয় ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট অডিও ক্লিপ ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করা যায়। এছাড়া রেকর্ডার দিয়ে গল্প, কবিতা, ছড়া ও সুমিষ্ট কণ্ঠ ও সুন্দর বাচনভঙ্গি রেকর্ড করে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্লাসে ব্যবহার করা যায়। উচ্চারণ ও উপস্থাপন ক্লাসে অডিও এর কোনো বিকল্প নেই। কোনো কিছুর ধারা বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের মুঠো ফোনের অডিও রেকর্ডার করা যায়।

পিকচার বা ইমেজ

পিকচার বা ইমেজ ডিজিটাল কনটেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। ছবি সংগ্রহের সবচেয়ে বড় সার্চ ইঞ্জিন হলো www.google.com এছাড়া গুগল ইমেজ সার্চের মাধ্যমে GIF, PNG, JPEএ ইত্যাদি ফরমেটের যে কোনো ইমেজ পাওয়া যায়। ছবি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভালো রেজুলেশনের দেশীয় প্রেক্ষাপট ও বয়স উপযোগী ছবি নির্বাচন করতে হবে। প্রয়োজনে ছবির অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটা যায় crop, Paint-এর মাধ্যমে।

ওয়েবভিত্তিক উপকরণ

ওয়েবভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে সরাসরি শ্রেণিকক্ষ থেকে কোনো নির্দিষ্ট ওয়েবে লিঙ্ক করে শিক্ষা দান করা যায়। কয়েকটি ওয়েবের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো-

- www.teacher.gov.bd,
- www.mukktopath.com,
- www.ictinedubd.ning.com,
- www.teachersdomin,org,
- www.banglapedia.com,
- www.englishteststore.com,
- www. slideshare.net
- www. slideworld.com,
- www. khanacademy.com,
- www. e-how.com,
- www. discovery education,
- www.10minutes school
- , www.nctb.gov.bd,
- www.ebook.gov.bd,srijonshil.com

MOOC-Massive Open Online Course থেকে শিক্ষার্থীরা অনেক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

এ্যানিমেশন

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে এ্যানিমেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে কোনো স্লাইড এ একাধিক ছবি, লেখা ও ভিডিও উপস্থাপনের সময় একসাথে না দেখিয়ে একটি একটি করে দেখানোর জন্য এ্যানিমেশনের প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই এ্যানিমেশন নির্বাচনে সর্তক থাকতে হবে অর্থাৎ এ্যানিমেশনটি সফট হতে হবে। এমন কোনো এ্যানিমেশন ব্যবহার করা যাবে না যা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে বিষয়ভিত্তিক এ্যানিমেশন ডাউনলোড করে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে GIF Image, Animation Factory, PowerPoint Animation, Phet Simulation ইত্যাদি মাল্টিমিডিয়া এ্যানিমেশন ব্যবহার করে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা যায়।

এ্যানিমেশন ব্যবহারের অন্যান্য দক্ষতাসমূহ হলো :

- বিনামূল্যে প্রাপ্ত সফটওয়্যার বা অনলাইনে বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে ডিজিটাল ভিডিও, অডিও, ছবি তৈরি ও এডিট করার দক্ষতা
- প্রেজেন্টেশন প্রদর্শন ও শেয়ার করা
- বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করার দক্ষতা
- স্বল্প সময়ে কার্যকরী Search query ব্যবহার করার দক্ষতা
- সামাজিক ওয়েবগঠন ব্যবহারের দক্ষতা
- ফাইল শেয়ারিং টুলস ব্যবহার করে প্রেজেন্টেশন আদান-প্রদান করার দক্ষতা
- অনলাইনে কাজ করার সময় বিশেষ নিরাপত্তা গ্রহণ করার দক্ষতা

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনাটি কোনো প্রতিষ্ঠিত পরিকল্পনা নয় তবে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক এ ধরণের পরিকল্পনা অনুসরণ করতে পারেন। ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষককে বিষয়বস্তু সহজভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। এটি কখনও শিক্ষকের বিকল্প নয়। শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক নির্ধারণ করবেন কত স্লাইড লাগবে। এমন হতে পারে একটি স্লাইড দিয়েই পুরো ক্লাস পরিচালনা করবেন।

চিত্র : ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা

- স্লাইড-১ স্বাগতম (শিক্ষার্থীদের বয়স, শ্রেণি, বিষয় উপযোগী কোনো ছবি দিয়ে) এ ক্ষেত্রে এ্যানিমেশন ব্যবহার না করা ভালো।
- স্লাইড-২-পরিচিতি (শিক্ষকের পরিচিতি ও শ্রেণির পরিচিতি) এ্যানিমেশন ব্যবহার না করা ভালো।
- স্লাইড-৩ পাঠশিরোনাম (পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি অথবা ভিডিও দেখিয়ে পাঠশিরোনাম ঘোষণা উল্লেখ্য এখানে একাধিক স্লাইড লাগতে পারে)।
- স্লাইড-৪ শিখনফল (বিষয়বস্তুর শিখনফল লিখতে হবে)।
- স্লাইড-৫-১০ শিখন-শেখানো কার্যক্রম (শিখনফল অর্জন করার জন্য ছবি, ভিডিও প্রদর্শন করতে হবে। শিখনফল অর্জনের জন্য স্লাইড সংখ্যা কম বেশি হতে পারে)।
- স্লাইড-১১ দলগত কাজ (প্রশ্ন, ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করতে হবে)।
- স্লাইড-১২ মূল্যায়ন (প্রশ্ন, ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করতে হবে)।
- স্লাইড-১৩ বাড়ির কাজ (সৃজনশীল হতে হবে)।
- স্লাইড-১৪ ধন্যবাদ (সুন্দর ফুল বা বিষয় সংশ্লিষ্ট ছবি হতে হবে)।

ডিজিটাল কনটেন্ট এর প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়কে যত বেশি সম্পৃক্ত করা যায় শিক্ষাদান তত বেশি চিত্তাকর্ষক ও স্থায়ী হয়। ইন্টারনেট এমন এক মহাসমুদ্র যেখান থেকে যে কোনো বিষয়ের তথ্য, ছবি, ভিডিও, এ্যানিমেশনের অতি সহজে পাওয়া যায়। যা দিয়ে অতি সহজে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা যায়। কারণ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে এমন জটিল বিষয়বস্তু আছে যা শিক্ষার্থীদের বুঝানো কঠিন যেমন– জোয়ার ভাটার কারণ এটি কোনোভাবে বাস্তবে দেখানো যায় না সেক্ষেত্রে শিক্ষক তার বিষয়বস্তুর জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও আইসিটির জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। তাছাড়া বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুসমূহ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আছে। আর এ রকম কোনো ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হলে তা অতি সহজেই যে কোনো সহায়ক মেমোরিতে সংরক্ষণ করে প্রয়োজনে বার বার ব্যবহার করা সম্ভব।

এছাড়া -

- ডিজিটাল কনটেন্ট এ ব্যবহৃত ছবি, ভিডিও, অডিও, এ্যানিমেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কঠিন ও বিমূর্ত বিষয়গুলো মুখস্ত না করে সহজে শিখতে পারে
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি হয়
- শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করে ফলে শিখন স্থায়ী হয়
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধির ফলে শ্রেণিতে যে কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারে
- শিক্ষার্থীদের শিখনের ক্ষেত্রে চিন্তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ফলে মুক্ত চিন্তা করতে সক্ষম হয়
- শ্রেণিতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকলে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব
- বার বার ব্যবহার করা যায় এমনকি প্রয়োজনে এডিট করা যায়
- অন্য শিক্ষকদের সাথে শেয়ার বা বিনিময় করা যায়
- বর্তমানে সৃজনশীল উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে একটি অত্যান্ত কার্যকরী পদ্ধতি

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কনটেন্ট

- শিখনফল অর্জিত হতে হবে
- ছবি ও ভিডিও অবশই প্রাসঙ্গিক হতে হবে
- ছবি দেশীয় ও শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশের হতে হবে
- এ্যানিমেশন সফট হতে হবে কারণ এখানে মুখ্য হলো বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মনোযোগ কোনো ক্রমেই যেন বিষয়বস্তু থেকে সরে না যায়
- স্লাইডে লেখা হবে বুলেট আকারে প্রয়োজনে Smart Art ব্যবহার করা যেতে পারে

ডিজিটাল কনটেন্ট-এর ব্যবহার

সনাতন চক, ডাস্টার, ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের অনেক তত্ত্বগত ধারণা দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ডিজিটাল কনটেন্ট-এর মাধ্যমে একাধিক স্থির বা চলমান চিত্রের সাহায্যে যে কোনো বিষয়ের পূর্ণ ধারণা দেয়া সম্ভব। তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা নয়, বরং শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির এই মূল মন্ত্র ধারণ করে শিক্ষার আধুনিকায়নে বাংলাদেশের শিক্ষকরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তৎপর। তাছাড়া বর্তমান সরকারের একটি চ্যালেঞ্জ হলো 'মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম'। বাংলাদেশের শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল কনটেন্ট বিনামূল্যে সংগ্রহের একটি বড় উৎস হলো শিক্ষক বাতায়ন (www.teachers.gov.bd)। শিক্ষক বাতায়নে শ্রেণিভিত্তিক, বিষয়ভিত্তিক এমনকি অধ্যায় ভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্ট পাওয়া যায়। নিজে না তৈরি করে ও শিক্ষক বাতায়ন থেকে কনটেন্ট ডাউনলোড করে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারেন আবার নিজের তৈরি কনটেন্ট শিক্ষক বাতায়নে আপলোড করতে পারেন। তবে শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারে শিক্ষককে সথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে যেন শিক্ষার্থীদের ও বিষয়বস্তু চাহিদার অতিরিক্ত সময় যেন মাল্টিমিডিয়া চালু না থাকে।

৫.৩ সামাজিক মেলার পরিকল্পনা, আয়োজন ও পরিচালনা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর বিজ্ঞানসম্মত ও পরিকল্পিত সামাজিক সত্ত্বা গঠন ও বিকাশ সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা জরুরি। কারণ এ স্তরের শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে যথাযথ সামাজিক সত্ত্বা গঠন উপযোগী জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব না হলে ভারসাম্যমূলক ব্যক্তি সত্ত্বা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। একটি সমাজের কাঠামো ও চাহিদার পরিবর্তন, অন্যান্য সমাজের সাথে যোগাযোগ এবং তথ্যাদি ও ভাবের আদান-প্রদান এবং প্রযুক্তির উত্তরোত্তর ব্যবহার প্রতি নিয়ত সমাজ জীবন করছে পরিবর্তিত। তাই এই পরিবর্তিত সমাজ উপযোগী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের অর্জিত জ্ঞান একজন শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। ফলশ্রুতিতে একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনে অনুশীলন, অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

সামাজিক মেলা

চিত্র : সামাজিক মেলা

কোনো একটি সামাজিক বিষয়কে উদ্দেশ্য করে বিদ্যালরের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কোনো স্থানে বিভিন্ন বস্তু সামগ্রীর প্রদর্শন বা বিক্রির ব্যবস্থা করলে তাকে সামাজিক মেলা বলে। এর লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সমাজ জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে আচরণের পরিবর্তন ঘটানো। সামাজিক মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার আচরণের পরিবর্তনের সুযোগ পায় সাথে সাথে সামাজিকীকরণের পথ ও তৈরি হয়। মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শিখতে পারে। সমাজের সাথে তাদের একটি যোগসূত্র তৈরি হয়। কোনো কোনো মেলা সমাজ সতেচনতা মূলক হতে পারে। যেমন- একীভূত শিখন এর প্রয়োজনীয়তা ও আমাদের করণীয়। এ বিষয়ের উপর মেলার মাধ্যমে সমাজের মানুষকে সচেতন করার সুযোগ ও তৈরি হবে। এ ছাড়া ও এ মেলার মাধ্যমে নিজ বিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক ও এলাকার জনসাধারণের সাথে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি একটি চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

সামাজিক মেলার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশের সার্বিক জ্ঞান দিয়ে থাকে। এর ব্যবহারিক প্রকাশের জন্য একটি সামাজিক মেলার আয়োজন করা হলে এর মাধ্যমে শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হয় না বরং সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়। যেমন–

- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরিপূর্ণ ও বিকশিত করা
- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রেষণা সৃষ্টি করা
- সামাজিক মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করা
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো
- শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- সমাজের অন্যদের সাথে সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি পাবে
- শিক্ষার্থীরা বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করবে ফলে আগ্রহ তৈরি হবে
- হাতে কলমে কাজ করার আগ্রহ বৃদ্ধি করা
- শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো
- আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়
- উপস্থাপন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
- শিক্ষক- শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নত হয়
- শিক্ষক- শিক্ষার্থী-অভিভাবক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি করা
- মেধাবী, দক্ষ ও কর্মঠ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করা
- শিক্ষার্থীরা বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে
- শিক্ষার্থীদের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়
- একটি সামাজিক মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মমত্ববোধ, গোষ্ঠীচেতনা, সহযোগিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, অনুসন্ধানী দৃষ্টি, সংগঠন তৈরির প্রচেষ্টা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে

সামাজিক মেলার বিষয়বস্তু

- জন্ম নিবন্ধনকরণ
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
- স্থানীয় পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
- আগুন ও ভূমিকম্প থেকে বাঁচার উপায়
- প্রত্নতত্ত্ব মেলা
- বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ
- একীভূত শিক্ষণ
- নিরক্ষরতা দূরীকরণ
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- বৃক্ষরোপণ
- পরিবেশ সচেতনতা
- বয়স্ক শিক্ষা
- আত্মকর্মসংস্থান
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ
- দেশীয় উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি

সামাজিক মেলার সামগ্রী

মেলার প্রদর্শনী সামগ্রী যথোপযুক্ত, সুন্দর এবং শিক্ষণীয় হতে হবে যা শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করবে। স্থান অনুযায়ী প্রদর্শনী সামগ্রীর আকার-আকৃতি নির্বাচন করতে হবে। মেলার সম্ভাব্য সামগ্রী তালিকা–

- একটি ভূ-প্রাকৃতিক মডেল
- স্থানীয় বিভিন্ন ধরনের ও সময়ের মানচিত্র
- বিভিন্ন প্রকার চার্ট
- বিভিন্ন ধরণের নমুনা
- কিছু বাস্তব ও আকর্ষণীয় জিনিসপত্র
- হাতের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র
- প্রাচীন কালের কিছু নমুনা
- সংবাদ পত্রে প্রকাশিত আকর্ষণীয় কিছু সামাজিক খবর ও ছবি
- স্থানীয়/জাতীয় সমস্যা সমাধান ও নিরাময়ের পথ ও পদ্ধতি উপস্থাপন
- কোনো দুর্যোগসম্পর্কে ও তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে বক্তব্য
- কিছু খাবার সামগ্রী ও দোকান

এটি সামাজিক মেলার সম্পূর্ণ তালিকা নয়। মেলার বিষয়বস্তু, ভৌগোলিক ও সামাজিক বিষয়াদি বিবেচনায় উপকরণাদি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সামাজিক মেলার কর্মকাণ্ড

- সমস্যা সমাধানের উপায় হাতে কলমে প্রদর্শন
- লিফলেট বিতরণ
- স্যুবেনির বিক্রয়
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন
- আলোচনা সভা/বির্তক
- রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন

সামাজিক মেলার আয়োজন

মেলার জন্য যে যে পদক্ষেপ নিতে হবে তা হলো-পরিকল্পনা, বিষয় নির্ধারণ, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়ন, দল গঠন, দায়িত্ব বন্টন, বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ, কার্য সম্পাদন, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, মন্তব্য বই সংরক্ষণ।

পরিকল্পনা

মেলা পরিচালনার জন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনা প্রয়োজন। অনেক আগে থেকে আয়োজন শুরু করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি, ম্যানেজিং কমিটিকে নিয়ে সভার অয়োজন করে ৪-৫ মাস আগে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এতে সদস্যসহ একজন সমন্বয়কারী/আহবায়ক থাকবেন। মূল কমিটি কয়েকটি উপকমিটি তৈরি করবে যেমন– শৃঙ্খলা উপকমিটি, প্রচার উপকমিটি, বাজেট উপকমিটি, ক্রয় উপকমিটি, বিচারক প্যানেল নির্ধারণ। কমিটি মেলার বিষয়, তারিখ, স্থান, অংশগ্রহণকারীর তালিকা, এবং উপকমিটি সমূহের দায়িত্ব নির্ধারণ করবে।

বিষয় নির্ধারণ

সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়/সমস্যা নির্ধারণ করতে হবে। বিষয়টি যেন সময়োপযোগী হয় তা খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করতে পারে এমন বিষয় নির্ধারণ করতে হবে।

তারিখ ও স্থান নির্ধারণ

মেলার তারিখ নির্ধারণ করে তা স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজনে মোবাইলে মেসেজ, ডিসের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, মাইকিং করা, লিফলেট বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচারণা করা যেতে পারে।

বাজেট প্রণয়ন

মেলার সম্ভাব্য ব্যয়ের খাতসমূহ চিহ্নিত করা, মোট ব্যয়, আয়ের উৎস চিহ্নিত করে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

দল গঠন

মেলায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করে দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে। কাজের ধরন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে একক বা দলগতভাবে কাজ বণ্টন করে দিতে হবে। এর জন্য একজন শিক্ষককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। শিক্ষক কাজের অগ্রগতি জানার জন্য মাঝে মাঝে তাদের মনিটরিং করবেন। প্রয়োজন মোতাবেক পরামর্শ প্রদান করবেন।

দায়িত্ব বণ্টন

মেলায় স্টলের সংখ্যা নির্ধারণ, স্টল সাজানো, সামগ্রী সংগ্রহ, অন্য বিদ্যালয়কে আমন্ত্রণ জানানো, অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানানো, আসন ব্যবস্থাপনা করা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে।

অর্থ সংগ্রহ

মেলার খরচের জন্য অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ নির্ধারণ, মোট ব্যয়, আয়ের উৎস প্রভৃতি বিষয়সমূহ আগেই ঠিক করতে হবে।

বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ

যেহেতু এটি একটি সামাজিক মেলা তাই বিষয়টি সম্পর্কিত সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষামূলক অন্যান্য সামাগ্রী ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শিক্ষার্থীরা মেলার নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর উদ্ভাবনীমূলক কোনো কিছু করতে চাইলে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

কার্য সম্পাদন

পূর্ববর্তীদিন সমস্ত কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চেকলিস্ট করে দেখতে হবে যা যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তার সব কিছু ঠিক আছে কিনা। মেলার কমিটিগুলোর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক দলকে কর্মতৎপর হতে হবে। মেলার প্রবেশ ও প্রস্থান দ্বার এ্যারো চিহ্ন দিয়ে মার্ক করতে হবে।কিছু কিছু মডেল আছে যেগুলো তৈরি করতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে মডেলগুলো আগে থেকেই তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে হবে। মেলাকে সুন্দর ও সার্থক করতে অবশ্যই দর্শনীয় জিনিসপত্রসমূহ সুন্দর করে সাজতে হবে এবং এদের গায়ে নাম লিখতে হবে। প্রতিটি স্টলে পরিচয় ও কার্যাবলি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য একজন সদস্য রাখতে হবে। মেলার দিন দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা থাকবে প্রত্যেকে যার যার অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করবে এবং কমিটি মনিটরিং করবে মেলা নির্ধারিত সময়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু করতে হবে। বিচারক প্যানেল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারী স্টল নির্ধারণ করবে।

স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন

মেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দল থাকবে যারা স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করবে। এ দল মেলার বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তুগুলো দর্শকদের সুন্দরভাবে দেখতে সহযোগিতা করবে। মেলার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় ক্ষেত্রে এ দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মেলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কার্যাবলি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকের একান্ত সহযোগিতার প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অংশগ্রহণকারীরা কেউ অসুস্থ্য হলে তাদের প্রয়োজনীয় সেবা দিবে। এর মাধ্যমে মেলার উদ্দেশ্য সফল হবে। কারণ এ ধরণের সামাজিক মেলার আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল মনোভাব তৈরি হবে যা শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন আবিষ্কারে উৎসাহিত করবে। ফলে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, আন্তরিকতা, শ্রদ্ধাবোধ ও নেতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটে যা একজন শিক্ষার্থীকে সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

মন্তব্য বই সংরক্ষণ

মন্তব্য বইটি এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন মেলা থেকে বের হয়ে যাবার সময় লিখতে পারে। মেলায় আগত আমন্ত্রিত অতিথি ও দর্শনার্থীরা মেলা সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করবেন এই বইতে। এখানে যেসব শিক্ষার্থীরা দায়িত্বে থাকবে তাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। লেখার জন্য কলম ও সরবরাহ করতে হবে। দর্শনার্থীরা মেলা সম্পর্কে ভালো-মন্দ, পরামর্শ, উপদেশ, সীমাবদ্ধতা, ভুল-ত্রুটি লিখতে পারেন। এর উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে আরো সুন্দর সামাজিক মেলার আয়োজন করা।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ কী ?
২. নিঃখরচার উপকরণ কী ?
৩. চার্ট ব্যব্যহারের নিয়ম কী ?
৪. শিক্ষা উপকরণ কীভাবে বাছাই করতে হয় ?
৫. শিক্ষাপোকরণ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন ?
৬. ডিজিটাল কনটেন্ট কী ?
৭. একটি ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী ?
৮. ওয়েবভিত্তিক উপকরণ কী ?
৯. ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে কি কি সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন লিখুন।
১০. শ্রেণিকক্ষে কীভাবে ডিজিটাল কনটেন্ট এর ব্যবহার করা যায় লিখুন।
১১. ডিজিটাল কনটেন্ট এ্যানিমেশন ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় কেন ?
১২. সামাজিক মেলা কী ?
১৩. সামাজিক মেলার উদ্দেশ্য কী ?
১৪. মন্তব্য বই কী ?
১৫. একটি সামাজিক মেলায় কী কী সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তার তালিকা তৈরি করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. শিক্ষা উপকরণের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করুন।
২. পাঠদান সহজ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ কীভাবে ভূমিকা রাখে ব্যাখ্যা করুন।
৩. বাংলাদশ ও বিশ্বপরিচয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি কী কী শিক্ষা উপকরণ তৈরি করতে পারেন তালিকা প্রণয়ন করুন।
৪. শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারের নিয়মসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৫. উপকরণ হিসাবে ডিজিটাল কনটেন্ট এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৬. ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করুন।
৭. ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী সর্তকতা অবলম্বন প্রয়োজন ব্যাখ্যা করুন।
৮. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের যে কোনো বিষয়বস্তু উপর একটি ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা তৈরি করুন।
৯. সামাজিক মেলা আয়োজনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
১০. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের উপর সামাজিক মেলা আয়োজনের একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।

তথ্যসূত্র :

১. মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ,সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট।
২. মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট।
৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
৪. ইন্টারনেট
৫. শিক্ষক বাতায়ন

ইউনিট-৬ : শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন

শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। তবে শিক্ষকতা কোনো সহজ পেশা নয়। বিশেষায়িত জ্ঞানের পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষতা, যোগ্যতা ও গুণাবলি এই পেশার সাথে জড়িত। প্রচলিত আছে একজন শিক্ষক সারাজীবন একজন ছাত্র। অর্থাৎ এই পেশায় জড়িত ব্যক্তিকে সারাজীবন কোনো না কোনো অধ্যয়নের মধ্যে থাকতে হয় নিজের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে। আর শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে পাঠের বিষয়বস্তু প্রয়োগের কার্যকর পরিকল্পনা। আর এ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অনেকগুলো উপাদানের সমন্বয়ে আবর্তিত হচ্ছে বিদ্যালয়ের এ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম। শিক্ষণ-শেখানো প্রক্রিয়ায় যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলোর কিছু শিক্ষক সম্পৃক্ত কিছু শিক্ষার্থী সম্পৃক্ত।
এই ইউনিটে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হলো–

৬.১ শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন
৬.২ একটি পাঠপরিকল্পনা কাঠামো পুনঃচিন্তন, দলীয় আলোচনা ও ফলাবর্তন প্রয়োগে ব্যবহারিক ও ফলপ্রসূ কাঠামোর উন্নয়ন
৬.৩ বিষয় শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান
৬.৪ বিষয় শিক্ষক হিসেবে শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় কনটেন্ট শিখনের প্রয়োগ

৬.১ শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন

কোনো কাজের অর্পিত দায়িত্ব পালনের সময় মেধা, শ্রম ও সময়কে সদ্ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের মৌলিক ক্ষমতাকে দক্ষতা বলে। যে কোনো মানুষের জীবনে সাফল্য আনতে হলে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নের প্রয়োজন পড়ে। পেশাগত দক্ষতা অর্জন ব্যতীত প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা যায় না। এ কথাটি অন্যান্য পেশার ন্যায় শিক্ষা পেশায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা শিক্ষাদান করাও একটি মহান পেশা। যে পেশার উন্নয়নে জ্ঞান দক্ষতার প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

একজন শিক্ষককে তাঁর পেশার উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিনিয়ত নব নব জ্ঞান ও কৌশলের সন্ধান করতে হয়। পাঠদানকে শতভাগ সফল করতে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক জ্ঞান-গবেষণার সন্ধানে নিরলস প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়ত রাখতে হয়। শিক্ষকের পেশাগত মূল্যবোধ, আত্মপ্রত্যয় ও বোধগম্যতার সমন্বয় ঘটিয়ে শ্রেণি পাঠদান সার্থক করতে হয়। আর এসব পদ্ধতি ও কৌশলকে আয়ত্ত করতে হলে শিক্ষকের জ্ঞানদক্ষতার উন্নয়ন করতে হয় এবং যথাসময়ে যথোপযুক্ত পাত্রে প্রায়োগিক দিকের প্রতি নজর দিতে হয়। তাই একজন শিক্ষকের জ্ঞান-দক্ষতার উন্নয়ন সাধনের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হয়।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন

শিক্ষকতা আমাদের সমাজে একটি মহৎ পেশা হিসেবে বিবেচিত। সমাজ ও জাতির উন্নয়নের অন্যতম কারিগর হলো শিক্ষক। শিক্ষকের ধারাবহিক পেশাগত উন্নয়ন বলতে কর্মরত ব্যক্তি শিক্ষকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে তার বর্তমান অবস্থার কাঙ্ক্ষিত ও ইতিবাচক পরিবর্তনকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি শিক্ষকের কর্মদক্ষতার উন্নয়নের জন্য গৃহীত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকেই শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন বলে।

ধারাবাহিক পেশাগত মান উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো পেশাজীবী তাঁর কর্মজীবন ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন শিখনের মাধ্যমে পেশাগত মানের উন্নয়ন ঘটায় এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর কর্মক্ষেত্রে সময় উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে সফল ও স্বার্থকভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়। পেশাগত উন্নয়ন বলতে পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি ও ব্যক্তির উন্নয়নকে বুঝায়। শিক্ষকতা একটি পেশা, অতএব এ পেশার উন্নয়ন বলতে বুঝায়–

- শিক্ষকের জ্ঞানের উন্নয়ন
- শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন
- শিক্ষকতা কাজের উন্নয়ন
- শিক্ষকতা মনোবৃত্তির উন্নয়ন
- শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক উন্নয়ন।

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন বলতে তাঁর পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি ও কার্যাবলির উন্নয়নকে বুঝায়। এ উন্নয়ন ধারাবাহিক ও প্রবাহমান। ধারাবাহিক ও প্রবাহমান জ্ঞান চর্চা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এ উন্নয়ন সম্ভব। পেশাগত উন্নয়নের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ উন্নয়নের জন্য নীতি নির্ধারক, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপনার যেমন দায়িত্ব রয়েছে শিক্ষকের নিজেরও দায়িত্ব কম নয়। শিক্ষককে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র একক কোনো প্রক্রিয়া বা পন্থা অবলম্বন করেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এই প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে চলতেই থাকে। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন বলতে কোনো পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের পেশাগত ও পরিমাণগত উন্নয়ন প্রক্রিয়াকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব পেশায় গুণগত ও পরিমাণগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগতভাবে যে কৌশলগত প্রক্রিয়ার অনুশীলন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয় তাকেই ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন বলা হয়। উন্নয়ন কখনই স্থবির নয়। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এখানে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন বলতে শিক্ষকদের শিক্ষকতা পেশার ধারাবাহিক উন্নয়নকেই বোঝানো হয়েছে। শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমাগত বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হচ্ছে। কাজেই আমাদের দেশের শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নের মাধ্যমেই শিক্ষকতা পেশায় নতুনত্বের সংযোজন করা হচ্ছে। এতে করে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের যথার্থ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথাযথ নিত্য-নতুন পদ্ধতির প্রয়োগে সক্ষম হবেন।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের উদ্দেশ্য

শিক্ষকের শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শ্রেণি শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার বিনিময় করা যায়। যা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পেশার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে নিজেদের আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক। নিচে শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের উদ্দেশ্য আলোচনা করা হলো-

- পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ
- পরিকল্পিত কর্মসূচির বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ
- শিক্ষা প্রশাসনিক দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্তকরণ
- শিক্ষকতার পেশাকে প্রগতিশীল করা
- প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখার যোগ্যতা অর্জন
- শিক্ষণ-শিখন দক্ষতার অধিকতর উন্নয়ন ও মান বৃদ্ধি
- আধুনিক তত্ত্ব ও তথ্যের সম্প্রসারণ
- শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে প্রগতিশীল করা
- নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করা
- আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা
- শিক্ষা সংস্কারে নিজেকে সম্পৃক্তকরণ
- আত্ম-মূল্যায়নে পারদর্শিতা বৃদ্ধি
- একীভূত শিক্ষা চেতনাকে সমৃদ্ধকরণ
- দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধি ও আত্মোপলব্ধি
- সর্বোপরি শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিজেদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভব তৈরি।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের গুরুত্ব

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী শিক্ষা দিতে হয়। গতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিনিয়তই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। এর সাথে খাপ-খাওয়াতে ও সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্তে শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক উপস্থাপন করা হলো-

- শিক্ষকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করা যায়
- শিখন শেখানো কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় করা যায়
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায়। একজন শিক্ষক অন্য শিক্ষকের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন
- শিক্ষকদের মধ্যে আগ্রহ, আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে
- শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়
- শিক্ষকগণ পাঠকে ভালোভাবে বুঝতে পারেন, নতুন নতুন পাঠদান কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেন, ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে পাঠদানে পারদর্শী হন

- শিখনফল অর্জনে শিক্ষকগণ নতুন নতুন উদ্ভাবনীমূলক উপকরণ তৈরি করতে পারেন
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানের ব্যবস্থা করা যায়। শিশুদের দলে জোড়ায় পরিকল্পিত কাজের মাধ্যমে মূল্যয়ন করা যায়
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুন্দর ও সু-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়
- দায়িত্বশীল হওয়া যায়।
- নিয়মিত পাঠ পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কৌশল আয়ত্ত করা যায়
- আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধি পায়
- সুন্দর উপস্থাপন কৌশল আয়ত্ত হয়
- শিক্ষার নতুন নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়
- বিষয় দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
- পঠন-পাঠন অভ্যাস বৃদ্ধি পায়
- আত্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
- সময়ের সাথে সাথে নিজেকে প্রগতিশীল রাখা যায়
- নিজেকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা যায়
- একীভূত শিক্ষা সচেতনতার ধারণা উন্নয়ন হয়
- জেন্ডার সচেতনতা সৃষ্টি হয়
- সকলের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়
- সর্বোপরি শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অন্যান্য বই, তথ্য পুস্তিকা পড়ে নতুন নতুন পাঠদান কৌশল বের করেন। এ সব কলা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন শিখানোর গুণগত মান উন্নয়ন হবে এবং আমাদের শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের উপায়

সময়ের সাথে নিজেকে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষক তাঁর দক্ষতার উন্নয়নে সচেষ্ট হন। নিচে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায়সমূহ তুলে ধরা হলো-

- কর্মকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ
- পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ
- পেশাগত মনোভাব বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়
- দক্ষতা অর্জনের জন্য বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী হওয়া
- পেশাগত দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠায় অগ্রবর্তী হওয়া
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশলের ব্যবহার
- স্ব-শিক্ষণ প্রক্রিয়া জোরদারকরণ
- পর্যবেক্ষণ দক্ষতা সম্প্রসারণ
- নিয়মিত শিখন অভ্যাস গড়ে তোলা
- আত্ম-মূল্যায়ন বা আত্ম-সমালোচনাকরণ
- দলগত পর্যালোচনা
- সতীর্থ মূল্যায়ন
- নিয়মিত প্রতিফলিত ডায়েরির ব্যবহার
- কর্মসহায়ক গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করা
- অনুকরণ ও অনুসরণ অভ্যাস গঠন
- পরীক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
- নিয়মিত শিখন-শেখানো সামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- কর্ম শিবিরের আয়োজন
- প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি
- বিনা মূল্যের ও স্বল্প মূল্যের উপকরণ ব্যবহার অনুশীলন
- হাতে তৈরি উপকরণ ব্যবহার দক্ষতার অনুশীলন
- নিয়মিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং ওয়ার্কশপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
- SBA কার্যক্রমে নিয়মিত ও সঠিকভাবে অংশগ্রহণ
- নিয়মিত মত-বিনিময় সভার আয়োজন
- দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাধারী ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়
- উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

৬.২ একটি পাঠ পরিকল্পনা কাঠামো পুনঃচিন্তন, দলীয় আলোচনা ও ফলাবর্তন প্রয়োগে ব্যবহারিক ও ফলপ্রসূ কাঠামো উন্নয়ন

একটি পাঠ পরিকল্পনা কাঠামো পুনঃচিন্তন

যে-কোনো কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে কার্য সম্পাদনের জন্য যথাযথ পূর্বপরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক। কারণ পূর্বপরিকল্পনা ব্যতীত কোনো কাজ পরিচালনা সম্ভব হয় না। প্রণীত পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে কাজ পরিচালনা করলে কাজে গতি সঞ্চার হয়। শ্রেণি পাঠদান একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সফলতা অর্জন করতে হলে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। আর এই পরিকল্পনাকে বলা হয় পাঠ পরিকল্পনা। পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে কোনো পাঠ্যবিষয়, নির্ধারিত সময়ে সম্পাদনের জন্য অর্জিতব্য শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিখন শেখানো কার্যক্রম ও অর্জন পরিমাপের উপকরণাদি ব্যবহার সম্পর্কিত পূর্বে গৃহীত প্রস্তুতির লিখিত বিবরণ। শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপনের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান/অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন নতুন ধারণা সংযোজন ও নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জন। এই পাঠ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো বিষয়বস্তু উপস্থাপনে পূর্ববর্তী পাঠ ও পরবর্তী পাঠের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পাঠ উপস্থাপন। নিম্নে পাঠ পরিকল্পনার ধারাবাহিক কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যায় বা ধাপ বিন্যস্ত করা হলো-

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

- শিক্ষার্থীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা, বয়স, সামর্থ্য ও চাহিদা
- সময় বিবেচনা
- পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ
- বিষয়বস্তু নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ
- পাঠের পরিবেশ সৃষ্টির উপায় উল্লেখ ও পাঠ ঘোষণা
- শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ
- উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন
- পাঠ মূল্যায়নের জন্য যথাযথ প্রশ্ন প্রণয়ন যার মাধ্যমে শিখন ফল যাচাই করা যায়
- শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করণ ও পুনরালোচনা
- বাড়ির কাজ প্রদান

আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

- বিষয় বস্তু নির্বাচন করা
- উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- পাঠের বিষয় বস্তুকে বিভিন্ন পর্বে বিন্যাস
- কোনো অংশের জন্য কতটুকু সময় প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে নিতে হবে
- শিক্ষার্থীদের জানা বিষয় থেকে পাঠ শুরু করে পরে অজানা বিষয় অবতারণা করতে হবে
- যেসব বিষয় শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারে সেগুলো প্রথমে উপস্থাপন করে পরে কঠিন বিষয়ের দিকে যেতে হবে
- একটি বিষয় সম্পূর্ণ না বুঝিয়ে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বুঝালে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সহজে বুঝতে সক্ষম হয়

পাঠ পরিকল্পনার পর্যায়ক্রমিক ধাপ বা সোপানসমূহ

শ্রেণি পাঠদানের ক্ষেত্রে জার্মান শিক্ষাবিদ জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট পাঠ পরিকল্পনার পাঁচটি ধাপ সনাক্ত করেছেন। এ জন্য তাঁর এই পদ্ধতিকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিখ্যাত 'পঞ্চসোপান পদ্ধতি' বলা হয়। হার্বার্ট উদ্ভাবিত পঞ্চসোপান পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতির ধাপগুলো হলো-

১. প্রস্তুতি বা সূচনা (Preparation/Introduction)
২. উপস্থাপন (Presentation)
৩. সংযোগ স্থাপন ও তুলনাকরণ (Association and Comparison)
৪. সিদ্ধান্ত বা সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ (Generalization)
৫. প্রয়োগ/অভিযোজন (Application/Adaptation)

প্রস্তুতি বা সূচনা (Preparation/Introduction)

পাঠের বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করা যেতে পারে।

উপস্থাপন (Presentation)

এ স্তরে শিক্ষক নতুন বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

সংযোগ স্থাপন ও তুলনাকরণ (Association and Comparison)

এই সোপানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য উপস্থাপন করেন। এ ধরনের তুলনা স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহী হয়ে ওঠে ও শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান সুদৃঢ় হয়।

সিদ্ধান্ত বা সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ (Generalization)

এই ধাপে শিক্ষার্থীরা সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত উপনীত হতে সমর্থ হয়।

প্রয়োগ/অভিযোজন (Application/Adaptation)

এই সোপানে শিক্ষার্থীদের নতুন সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। শিক্ষার্থীরা সমস্যার যথাযথ সমাধান করতে পারলে বোঝা যাবে তাদের অর্জিত জ্ঞান সুদৃঢ় হয়েছে। এ সোপানটিতে মূলত শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করা হয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, আধুনিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে পাঠ পরিকল্পনা যে ভাবেই প্রণয়ন করা হোক না কেনো আধুনিক পাঠ পরিকল্পনায় মূলত নিম্নবর্ণিত তিনটি স্তর/সোপান ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন–

১. প্রস্তুতি বা সূচনা (Preparation/Introduction)
২. উপস্থাপন (Presentation)
৩. প্রয়োগ/অভিযোজন (Application/Adaptation)

বাকী দু'টি স্তর লুকায়িত (Hidden) অবস্থায় থাকে। তবে শিক্ষকদের কথায় ও বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সেগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাঠ পরিকল্পনার অংশসমূহ এবং কাঠামো

বিভিন্নভাবে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। তবে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি কাঠামো প্রয়োজন। পাঠ পরিকল্পনার কাঠামোর আবশ্যকীয় অংশসমূহ হলো: পরিচিতি, উদ্দেশ্য, ধারণা, উপকরণ ও প্রস্তুতি, উপস্থাপন এবং প্রয়োগ।

১) **পরিচিতি :** এ অংশে সমগ্র পাঠের পরিচয় দেওয়া হয়। প্রথমেই বিদ্যালয়ের নাম, শিক্ষকের নাম ও পরিচয়। অতঃপর শিক্ষার্থীদের শ্রেণি, বয়স, সংখ্যা, পাঠ্য বিষয়, পাঠ অনুচ্ছেদের নাম, পাঠদানের জন্য নির্ধারিত সময় ও তারিখ উল্লেখ থাকবে।

২) **শিখনফল :** পাঠদান প্রক্রিয়ার মূল চাবিকাঠি এই অংশ। এতে পাঠের শিখনফল উল্লেখ থাকবে। পাঠের শেষে শিক্ষার্থী কি অর্জন করবে তা এই উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট করা হয়।

৩) **ধারণা :** এ অংশে পাঠের অর্জিতব্য মূল ধারণাটি লেখা হয়। ধারণা পাঠের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য। ধারণা হবে সংক্ষিপ্ত এবং পাঠের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি ধারণা অথবা একাধিক ধারণাও থাকতে পারে।

৪) **উপকরণ :** এ অংশে মূলত পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় শিখন উপকরণের তালিকা উল্লেখ করা হয়। শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ পরিকল্পনায় উপকরণের তালিকায় অনেকে 'ইত্যাদি' শব্দটি ব্যবহার করেন কিন্তু এটি সঠিক নয়, কারণ একটি নির্দিষ্ট পাঠের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করেন।

৫) **প্রস্তুতি :** এ সোপানের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে নতুন পাঠের উপযোগী করে তোলা। নতুন পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং এ পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যাচাই করা। বিষয় ভেদে প্রস্তুতি অংশে কিছুটা তারতম্য ঘটে, তবে প্রস্তুতি পর্বটিকে সাধারণত ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে পাঠটিকা লেখা হয়। এগুলো হলো- শুভেচ্ছা বিনিময়, শ্রেণিবিন্যাস, বাড়ির কাজ সংগ্রহ, পূর্ব জ্ঞানের পরীক্ষা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং পাঠ ঘোষণা।

ক) শুভেচ্ছা বিনিময় : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রতি মনোযোগী হবে। 'আস্সালামু আলাইকুম, সু-প্রভাত, Good Morning, কেমন আছ তোমরা' ইত্যাদি শব্দ বা বাক্য বিনিময় করে সাধারণত শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

খ) শ্রেণিবিন্যাস : পাঠদানের সাফল্য অনেকাংশে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। শ্রেণিবিন্যাস বলতে শ্রেণিকক্ষের ব্লাক বোর্ডের অবস্থান ও লেখা পড়তে অসুবিধা হলে তা ঠিক জায়গায় বসানো; সকলে যাকে বোর্ডটি দেখতে পায় সে জন্য লম্বা শিক্ষার্থীদের পেছনে এবং খাটো শিক্ষার্থীদের সামনে বসানোর ব্যবস্থা করা; মোট কথা শ্রেণি সজ্জা সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা বুঝায়।

গ) বাড়ির কাজ সংগ্রহ : আগের দিন কোনো বাড়ির কাজ দেয়া থাকলে শ্রেণি নেতা বা শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় তা সংগ্রহ করা বুঝায়।

ঘ) পূর্ব জ্ঞানের পরীক্ষা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি : এ ধাপের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে নতুন পাঠের উপযোগী করে তোলা, নতুন পাঠের প্রতি তার মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং এ পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যাচাই করা। শিক্ষক শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞান যাচাই করবেন প্রশ্ন বা আলোচনার চিত্র, মডেল, বাস্তব নমুনা, ঘটনার বর্ণনা বা গল্পের মাধ্যমে। প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়টিকে একটি সমস্যা আকারে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরবেন এবং তার সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করবেন।

ঙ) পাঠ ঘোষণা : শিক্ষক যখন বুঝতে পারবেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন পাঠ গ্রহণের প্রেষণা সৃষ্টি হয়েছে, তখন তিনি পাঠটি ঘোষণা করবেন এবং পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

৬) পাঠ উপস্থাপন : পাঠ ঘোষণার মাধ্যমেই পাঠ উপস্থাপন শুরু হয়। এ স্তরে শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয় বা সমস্যাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অংশে ভাগ করে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করবেন। পাঠ উপস্থাপন পর্বকে ধারাবাহিক কয়েকটি শিখন বিষয়ে বিভাজন করে তার সংক্ষিপ্ত নোট লেখা হয়। এখানে কোনো বিষয়টি কোনো পদ্ধতিতে উপস্থাপন হবে? শিক্ষক কি করবেন? শিক্ষার্থীরা কি করবে ? ব্লাক বোর্ডে কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা র্বণনা লেখা হবে তার সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ লেখা হয়। পাঠের প্রকৃতি ও পাঠদান পদ্ধতিভেদে পাঠ উপস্থাপন বর্ণনা ভিন্ন হবে।

৭) প্রয়োগ : এ স্তরে শিক্ষার্থীকে যাচাই করে দেখা হয় যে সে নব লব্ধ জ্ঞানকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারে কি না? সাধারণত চিন্তামূলক বা সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুরূপ কোনো পরীক্ষা বা ব্যবহারিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে কিনা তা যাচাই করতে হয়। এ অংশে শিক্ষকের সক্রিয় ভূমিকা থাকবে না। যদি শিক্ষার্থী নতুন জ্ঞান প্রয়োগে ব্যর্থ হয় তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষকের শিখন বা শিক্ষাদান সফল হয়নি। সে ক্ষেত্রে শিখন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনা পর্বের মধ্য দিয়ে পাঠ অগ্রসর হয়। ফলে প্রতি মুহূর্তে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেন। এটা তাৎক্ষণিক বা অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়নও বটে। পাঠদানের শেষে বা পাঠ উপস্থাপন শেষ হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে মূল্যায়ন করেন। সাধারণত মৌখিক বা লিখিত বা কোনো কার্যসম্পাদনীমূলক অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। নিম্নে একটি পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো দেওয়া হলো-

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

<table>
<tr><td colspan="3">বিদ্যালয়ের নাম :</td></tr>
<tr><td>পরিচিতি</td><td>শিক্ষকের নাম: খ
শ্রেণি: বি.এড
রোল নম্বর: ৫০
শিক্ষার্থীর সংখ্যা : ৪০
শিক্ষার্থীর বয়স : ১৪+
শিক্ষাবর্ষ:</td><td>বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
শ্রেণি : নবম
আজকের পাঠ : বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা
(কিশোর অপরাধ)
সময় : ৫০ মিনিট
তারিখ:</td></tr>
<tr><td>শিখনফল</td><td colspan="2">এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-
১. কিশোর অপরাধ কী বলতে পারবে
২. কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. কিশোর অপরাধ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবে।</td></tr>
<tr><td>উপকরণ</td><td colspan="2">কিশোর অপরাধ সম্পর্কিত কিছু ছবি, চার্ট, প্রজেক্টর,ল্যাপটপ, পোস্টার পেপার, ভিপ কার্ড</td></tr>
<tr><td>পদ্ধতি</td><td colspan="2">একক কাজ, ব্রেইন স্ট্রমিং, দলগত কাজ, এক্সপার্ট জিগস,মাইন্ড ম্যাপিং</td></tr>
</table>

ধাপ	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
প্রস্তুতি		শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও প্রয়োজনে শ্রেণিবিন্যাস করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই, মানসিক প্রস্তুতি ও পরিবেশ গঠনের জন্য ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। ১. ছবিটিতে কী দেখতে পাচ্ছো? ২. এদের বয়স আনুমানিক কত হতে পারে? ৩. এ বয়সী ছেলেমেয়েদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধকে কী ধরনের অপরাধ বলে? তাহলে এসো আজ আমরা 'কিশোর অপরাধ' সম্পর্কে আলোচনা করি এই বলে পাঠ শিরোনাম হোয়াইট বোর্ডে লিখে দিবেন, মুখে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় লিখে নিতে বলবেন।	শিক্ষার্থীরা কুশল বিনিময় করবে এবং প্রয়োজনীয় উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ শিরোনাম নিজ নিজ খাতায় লিখে নিবে। ১. একদল ছেলে- মেয়ে মারামারি করছে, কেউ পকেট মারছে, কেউ জুয়া খেলছে, কেউবা সিগারেট খাচ্ছে। ২. ০৭–১৬ বছরের মধ্যে। ৩. কিশোর অপরাধ বলে। শিক্ষার্থীরা পাঠ শিরোনাম নিজ নিজ খাতায় লিখে নিবে।	মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ছেলে-মেয়ে মারামারি করছে, কেউ পকেট মারছে, কেউ জুয়া খেলছে, কেউবা সিগারেট খাচ্ছে ছবি প্রদর্শন করবেন।
শিখনশেখানো কার্যাবলি		আজকের পাঠের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে স্লাইডে ছেলে-মেয়ে মারামারি করছে, কেউ পকেট মারছে ছবি দেখিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কিশোর অপরাধ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন। প্রশ্ন ১. কিশোর অপরাধ কী? ২. কিশোরদের দ্বারা সংগঠিত কয়েকটি অপরাধের নাম বল। মাইন্ড ম্যাপিং- শিক্ষক মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তথ্য সমূহ বোর্ডে লিখবেন এবং প্রয়োজনে নিজে সহযোগিতা করবেন।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে, উপকরণ প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করবে এবং সম্ভাব্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের নাম বলবে।	মাইন্ড ম্যাপিং কিশোর অপরাধসমূহ মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে উপস্থাপন
		প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কিশোর অপরাধের কারণসমূহ উপস্থাপন করবেন। চার্টের মাধ্যমে কারণসমূহ ব্যাখ্যা করবেন। একক কাজ শিক্ষার্থীদেরকে ভিপ কার্ডে কিশোর অপরাধের একটি করে কারণ লিখতে বলবেন। কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ আমাদের করণীয়সমূহ একটি ভিডিও দেখিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। শিক্ষার্থীরা ভিপ কার্ডে একটি করে কারণ লিখবে।	চার্টের কিশোর অপরাধসমূহ
		দলগত কাজ শিক্ষার্থীদের ৬ জন করে ৬টি দলে ভাগ করে নীচের প্রশ্নটি আলোচনা করে এক্সপার্ট জিগস সাহায্যে উপস্থাপন করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন। সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। প্রশ্ন কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে আমরা সমাজে কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারি-মতামত দাও।	উপকরণ প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করবে এবং সম্ভাব্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। শিক্ষার্থীরা এক্সপার্ট জিগস পদ্ধতিতে বিষয়টি আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।	কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায়সমূহ- পরিবারে সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়া, টিভি দেখা, খাওয়া,গল্প করা ইত্যাদি।

ধাপ	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
মূল্যায়ন		শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। ১. কিশোর অপরাধ কী? ২. কিশোরদের বয়স সীমা কত? ৩. কিশোর অপরাধের ৫টি কারণ বল।	শিক্ষার্থীরা উত্তর প্রদানের চেষ্টা করবে।	
বাড়ির কাজ ও পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা		নিচের বাড়ির কাজটি মুখে বলবো এবং বোর্ডে লিখে দিব। ১. তোমার কিশোর বন্ধুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে তুমি কী কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারো? বোর্ড মুছে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ সমাপ্ত করবেন।	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় বাড়ির কাজ লিখে নিবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিদায় জানাবে।	

দলীয় আলোচনা ও ফলাবর্তন প্রয়োগে ব্যবহারিক ও ফলপ্রসূ কাঠামো উন্নয়ন ও দলীয় আলোচনা

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দলীয় আলোচনা ও ফলাবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দলীয় আলোচনা মূলত একটি ফোরামে আলোচিত হয়। যেখানে শিক্ষকরা নিজেরাই নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস পান। নিজেদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে তবেই দলীয় অলোচনা পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্যদিকে ফলাবর্তন যা কোনো বিষয়ের উপর আলোচনা কিংবা সমালোচনা কিংবা কোনো অবস্থা সম্পর্কে সার্বিক মন্তব্য। যাকে প্রদান করা হয় তিনি তাঁর কাজের মান সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারেন ফলাবর্তন বা Feedback এর মাধ্যমে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় যেহেতু সমন্বিত বিষয় এখানে সামাজিক, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস বিষয় সংযোজিত আছে। তাই উল্লিখিত বিষয়ের শিক্ষকদের তাদের নিজস্ব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পাঠ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। বিষয়ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময় করে পাঠ পরিকল্পনার একটি চূড়ান্তরুপ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। পাঠ পরিকল্পনা যদিও একটি ধারাবাহিক কর্মসূচি তবে ছক তৈরি করে এতে নিজস্ব মতামত প্রদান করে বৈচিত্র্য আনতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার মূল সোপান যেমন- প্রস্তুতি, উপস্থাপন বর্তমানে শিখন- শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে বৈচিত্র্য আসতে পারেন ।

যেমন-

শ্রেণি : অষ্টম
অধ্যায় ৫: সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন
পাঠ: সামাজিকীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রভাব
সময়: ৫০ মিনিট

শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	শিখন অর্জন যাচাই	শিক্ষাপোকরণ
সামাজিকীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে	পাঠ প্রস্তুতি সময়: ০৬ মিনিট ক. মানুষ কি সামাজিক জীব? খ. সমাজে বসবাস করতে গেলে মানুষ কী ধরনের সামাজিক আচরণ করে? গ. এই আচরণগুলো মানুষ কোথা থেকে শেখে? ● উত্তরের সূত্র ধরে সামাজিকীকরণের ধারণা প্রদান ৫ মিনিট ● ভিডিও ক্লিপ/ছবি প্রদর্শন (ফেরেল মানব) একক কাজ কোনো একটি শিশু যদি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বন জঙ্গলে বন্যপ্রাণিদের সাথে বসবাস করতে থাকে তাহলে তার আচরণ কেমন হবে? ভিডিও ক্লিপে/ছবির ভিত্তিতে খাতায় লিখা প্রশ্নোত্তর ০৭মিনিট ক. আমরা প্রথম কোথা থেকে শিক্ষা পাই? খ. আমরা একটু বড় হওয়ার পরে আর কোথা থেকে শিক্ষা পাই? ● সামাজিকীকরণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, পরিবার, স্থানীয় সমাজ, সমবয়সী সঙ্গী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ভূমিকার ধারণা ব্যাখ্যা প্রদান (ছবি প্রদর্শনসহ) ১০ মিনিট ● দলগত কাজ: পরিবার কীভাবে শিশুর মধ্যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা তৈরি করে? পোস্টারে লিখে উপস্থাপন ০৭ মিনিট	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন (পূর্বে প্রস্তুতকৃত) ● একক কাজ যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদান ৫ মিনিট ● (দলগত কাজ) যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদান ৫ মিনিট চিন্তার উদ্রেককারী ৫ মিনিট প্রশ্ন/কাজ: শিশুর সামাজিকীকরণে সমবয়সী সঙ্গী গুরুত্বপূর্ণ কেন? (বাড়ির কাজ)	ভিডিও ক্লিপ/ছবি : ১. ফেরেল মানব /শিশুর ভিডিও ক্লিপ/ছবি ছবি : যৌথ পরিবারে শিশু, সঙ্গীদের সাথে শিশুদের একত্রে খেলাধুলা, বিদ্যালয়ে এসেম্বলিতে শিশুদের ছবি
পাঠের অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়:	শিক্ষকের আত্মপ্রতিফলন: তারিখ:		

৬.৩ বিষয় শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান

শিখণ একটি দক্ষতামূলক কাজ। শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের বিভিন্ন দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় শ্রেণিতে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। এসব সমস্যা কখনও কখনও শিক্ষককে তার শিখন দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এ সমস্যাগুলো ও তার প্রতিকার শিক্ষকের জানা থাকলে তিনি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ও শিখন দক্ষতার উন্নতি ঘটিয়ে শ্রেণি শিক্ষণ সমস্যা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারেন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও শিশুদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন। আর এভাবেই তিনি শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন।

শ্রেণিতে শিক্ষক নানা রকমের সমস্যার সম্মুখীন হন। একটি শ্রেণিতে নানা ধরনের শিক্ষার্থী থাকে। অর্থাৎ কেউ প্রতিভাবান বা উচ্চ মেধাসম্পন্ন, কেউবা মাঝারি মেধাসম্পন্ন আবার কেউবা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। শ্রেণিতে একই মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে শিক্ষক একই মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দিকে লক্ষ্য রেখে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ধরণ একই রকম না হলে সেক্ষেত্রে শিখনে সমস্যা দেখা দেয়।

শিখনের আর একটি প্রধান কাজ হলো শিক্ষার্থীর সাথে সংযোগ স্থাপন। শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক হলেন যোগাযোগকারী। একজন সফল যোগাযোগকারী হিসেবে শিক্ষকের গুরুত্ব কম নয়। তাই শিক্ষনে সফল যোগাযোগকারী হিসেবে শিক্ষকের সংযোগ স্থাপনের উপযুক্ত দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় এটিও শিক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

শ্রেণি শিখনে অগ্রসর শিশুদের সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

বিদ্যালয়ে সাধারণত মাঝারি বুদ্ধির শিশুদের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এতে উন্নত মেধা বা প্রতিভাবান শিশুরা আনন্দ পায় না। শ্রেণি শিক্ষনে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এদের পরিচালনা করা প্রয়োজন। প্রতিভাবান বা অগ্রসর শিশুরা যেমন তাড়াতাড়ি কাজ করে তেমনি সেক্ষেত্রে তাদের চাহিদার তুলনায় কাজের স্বীকৃতিও কম। নিজেদের বুদ্ধি সম্পর্কে এরা সজাগ, খুঁটিনাটি সব কিছু জানতে চায়। এরা যুক্তিবাদী হয়, অন্যের প্রশংসা চায়। এদের জন্য সাধারণ মেধার শিক্ষার্থীদের সাথে অন্যান্য ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে এ সমস্যার প্রতিকার করা যায়। যেমন–

- কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি যথা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রজেক্ট, শিক্ষাভ্রমণ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদান ও অন্যান্য সৃজনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের ব্যস্ত রাখতে হবে
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দায়িত্ব দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করতে হবে
- বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও পাঠাগারের অন্যান্য পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে
- শ্রেণিতে পুনরালোচনার সময় বা কোনো কিছু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদের কঠিন প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করা যেতে পারে
- শ্রেণিতে বিভিন্ন কাজকর্মে তাদেরকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে
- সমস্যামূলক প্রশ্নের অবতারণা করে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়ে ও যুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে
- অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষাকার্যে মাঝে মাঝে তাদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে
- শিক্ষককে মনে রাখতে হবে তিনি সকলকে সক্রিয়তার মধ্যে রেখে শিক্ষা দেবেন। অগ্রসর শিশুরা অল্প সময়ে কাজ শেষ করে ফেলে এরপর তারা শান্তহয়ে বসে থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে তাদের শান্ত রাখার একমাত্র উপায় এসব শিক্ষার্থীর মেধা, আগ্রহ ও চাহিদা অনুসারে সৃষ্টিশীল শিখন কাজের ব্যবস্থা করা। এতে তারা তৎপর হয়ে আনন্দের সাথে শিখন কাজ সম্পন্ন করবে।

পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্যা ও তার প্রতিকার

শ্রেণি শিখনে শিক্ষকের পক্ষে সব সময় সকলকে সমভাবে ব্যক্তিগত শিখনে সহায়তা করা সম্ভব হয় না। এ কারণেও অনেক শিক্ষার্থী পাঠে পিছিয়ে পড়ে। লেখাপড়া ও কাজকর্মে এরা সাধারণ শিশুদের চেয়ে অনেক পিছনে থাকে। এদের বুদ্ধিশক্তি ও মনোযোগের শক্তিও কম। প্রতিটি বিদ্যালয়েই পশ্চাদগামী শিশুরা রয়েছে। আজকাল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তবে সাধারণ বিদ্যালয়েও এদের দেখা যায়। এদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা না থাকলে বিশেষ ব্যবস্থায় এদের স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। সমাজে যেন এরা সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারে সেভাবে তাদের গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিতে হবে। এদের সমস্যা দূরীকরণে শিক্ষণের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা নিম্নরুপ–

- শিক্ষক এদের সাথে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল আচরণ করবেন। যেহেতু এদের মনোযোগের শক্তি কম সেহেতু মূর্ত বস্তুর সাহায্যে সহজভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন
- এরা যেন দৈনন্দিন কাজ শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে
- এদের সামাজিক আচার আচরণ শিক্ষা ও চারিত্রিক গুণাবলি বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে
- এরা লেখাপড়ায় বেশি অগ্রসর হতে পারে না। এদের ভাষার বিকাশ ও উচ্চারণে ত্রুটি দেখা দিলে কোনো হাতের কাজ বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করতে হবে
- দৈহিক ত্রুটির জন্য যদি তারা অনগ্রসর থাকে সেক্ষেত্রে ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। মানসিক প্রতিবন্ধীর জন্য মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ ও সহায়তা নেওয়া যেতে পারে
- কোনো কোনো দিকে তারা দুর্বল তা সনাক্ত করে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতে হবে

- নানা রকমের কাজের মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। মাটির কাজ, কাঠের কাজ, বেতের কাজ, নানা রকমের হস্তশিল্প ও চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে
- উদাহরণ ছাড়া তারা কোনো কিছু উপলব্ধি করতে পারে না। তাই যত বেশি সম্ভব বাস্তব উদাহরণ দিতে হবে এবং শিখনে উৎসাহিত করতে হবে
- পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার সময় যত বেশি সম্ভব পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা করতে হবে
- তাদের জন্য অল্প বিষয়বস্তু নিয়ে ধীরে ধীরে শিক্ষা দেওয়া দরকার। একটি বিষয় পুরোপুরি আয়ত্তে আসার পূর্বে অন্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়

আপনার বিদ্যালয়ে যদি পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকে তাহলে অভিভাবকের সহযোগিতায় এসব শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত নিশ্চিত করবেন। সৃজনশীল বা উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে সকল প্রকার শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতি ও বিশেষভাবে শ্রেণি পঠন পাঠনের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ সঞ্চারের চেষ্টা করবেন। তাদের জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলন ও বাড়ির কাজের ব্যবস্থা করবেন।

শ্রেণি শিখনে শ্রেণি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাজনিত সমস্যা

শ্রেণিতে একজন শিক্ষক অনেক শিক্ষার্থীকে একত্রে শিক্ষা দেন। এতে সব শিক্ষার্থীকে সমভাবে ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদান করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক শিক্ষার্থী পাঠে পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা, সামার্থ্য ও অভিরুচি অনুযায়ী পাঠের অবতারণা না করা হলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের একই সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা করায় পাঠে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষীণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ফলে পাঠের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে ক্ষীণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে সমতালে চলতে না পেরে পাঠে পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষণকে শিক্ষার্থীর আগ্রহভিত্তিক করতে না পারলে এবং কর্মতৎপরতার মধ্যে শিক্ষণ পরিচালনা করতে না পারলে শিক্ষার্থীদের অস্থিরতা বাড়ে ও অমনোযোগী হয়। অনেক সময় শিক্ষকের আচরণ ও ব্যক্তিসত্ত্বার বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করে। শিক্ষক যদি নিজের মতামত জোর করে শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেন কিংবা শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ব্যাঘাত ঘটে। দিনের অধিকাংশ সময় শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা যদি ভালো না হয় তার খারাপ প্রভাব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের মনের ওপর প্রতিক্রিয়া করে। শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আলো বাতাস না আসলে শিক্ষার্থীরা মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পাঠে অমনোযোগী হয়ে পরে। শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত স্থান না থাকলে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে যাতায়াত করার মত জায়গা পায় না। ফলে তারা অন্যের কাজের ব্যাঘাত ঘটায়। শ্রেণিকক্ষের স্থান অনুপাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে শিক্ষকের পক্ষেও শ্রেণিতে চলাফেরা করা ও সকলের প্রতি নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। এতে শিক্ষণের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। শ্রেণিতে ব্যবহার্য আসবাবপত্র যদি শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুযায়ী না থাকে কিংবা আরামদায়ক না হয় সেক্ষেত্রেও নানা রকমের সমস্যা হয়। উপযুক্ত শ্রেণিবিন্যাসের অভাবে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। উচ্চতা নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী বসার ব্যবস্থা না করে যদি ইচ্ছানুযায়ী বসতে দেওয়া হয় তাহলে অনেক সময় পেছনের শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে ঠিকমত দেখতে পায় না। বোর্ডও দেখতে পায় না। ফলে শিখন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিছু শিক্ষার্থী থাকে যারা স্বভাবতই অমনোযোগী। এইসব শিক্ষার্থীদের একত্রে বসার সুযোগ দিলে শ্রেণিতে শ্রেণি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়।

প্রতিকার

শ্রেণি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় নিচের উপায়গুলো অবলম্বন করলে শিখন সমস্যার প্রতিকার করা যেতে পারে–

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী সমন্বয়ে শ্রেণি গঠন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন
- যতদূর সম্ভব শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যের কথা চিন্তা করে সমমানের ও একই রুচিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করতে হবে
- কর্মতৎপরতার মধ্যে রেখে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে তারা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়ার সুযোগ পাবে না
- শিক্ষার্থীদের শাস্তির ভয় না দেখিয়ে তাদের সমস্যাগুলো সমবেদনার সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং সহানুভূতিশীল হয়ে এ সমস্যাগুলোকে তাদের সামনে তুলে ধরে সমস্যা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে

- যে পরিবেশে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখাপড়া করবে সে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও যথোপযুক্ত হতে হবে
- শ্রেণিকক্ষের আকার শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে হওয়া উচিত
- শ্রেণিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। চকবোর্ড এমনস্থানে টানাতে হবে যেন শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থী তা দেখতে পায় এবং তা থেকে যেন আলো প্রতিফলিত না হয়
- শ্রেণিতে বসার জন্য যে আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয় তা যথেষ্ট আরামদায়ক হওয়া দরকার
- শিক্ষার্থীদের উচ্চতা অনুযায়ী সামনে/পিছনে বসার ব্যবস্থা করতে হবে
- অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের পৃথক পৃথকভাবে বসার ব্যবস্থা করা উচিত
- বিদ্যালয়ের অবস্থান যেন সমাজের কোলাহলপূর্ণ স্থানে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- পরিবেশ যেন স্বাস্থ্যকর থাকে, বিদ্যালয়ের আশেপাশে যেন নোংরা আবর্জনা জমা না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।
- ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা শিশুদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এতে শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রেখে শিক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা সহজ হবে।

৬.৪ বিষয় শিক্ষক হিসাবে শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় একীভূত শিখনের প্রয়োগ

একীভূত শিক্ষা হলো এমন একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া যা শিক্ষার প্রতিটি স্তরের সকল শিক্ষার্থীর মান সম্মত শিক্ষা অর্জনের সহায়ক। একীভূত শিক্ষার মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা-নিশ্চিত করা সম্ভব। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন রকম ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সকলকে একই মালার বন্ধনে আবদ্ধ করাই একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য।

একীভূত শিক্ষা

একীভূত কথাটার অর্থ হলো সমাজের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ। একীভূত শিক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা শিক্ষার প্রতিটি স্তরের (প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা) সকল শিক্ষার্থীকে সফলতার সাথে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করা। একীভূত শিক্ষা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া, যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার চাহিদা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী শিখন ও জ্ঞান অর্জনের প্রতিবন্ধকতা সীমিতকরণ ও দূরীকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায়। এ শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব, ছেলে-মেয়ে, প্রতিবন্ধী-অপ্রতিবন্ধী সকল শিক্ষার্থীকে একই পরিবেশে এক সাথে মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করা সম্ভব । একীভূত শিক্ষা হলো একটি দৃষ্টিভঙ্গি, মুল্যবোধ এবং বিশ্বাস।

চিত্র: একীভূত শিক্ষা

একীভূতকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের চাহিদাগুলোকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া রোধ করে। একীভূত শিক্ষা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্যতা ও অধিকার নিশ্চিত করে। একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই যেন সহজভাবে ভিন্নতাকে নিয়ে কাজ করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থী ভিন্নতা বিষয়টিকে সমস্যা মনে না করে যেন একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন এই লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষা কাজ করে। সমাজের দীর্ঘদিনের বৈষম্যপূর্ণ কাঠামো ভেঙ্গে ফেলে এই শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীসহ প্রান্তিক শিক্ষার্থীকেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যয়ন করার সুযোগ করে দেয়। ফলে পরস্পর পরস্পরের সম্পর্কে জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবোধ অর্জন করতে পারে, যা একটি বৈষম্যহীন ও একীভূত সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণের ভিত্তি।

আমাদের দেশে এখনও যে ধরনের শিশুরা শিক্ষায় বিযুক্ত রয়েছে তারা হলো- প্রতিবন্ধী শিশু, পাহাড় ও সমতলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী শিশু, বিভিন্ন ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু পরিবারের শিশু,বিভিন্ন পেশাগত সম্প্রদায়ের শিশু(মুচি, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, জেলে, তাঁতি, কামার-কুমার), যাযাবর সম্প্রদায়ের শিশু (বেদে), চা বাগানে কর্মরত পরিবারের শিশু, এতিম শিশু, শরণার্থী শিশু, যৌনকর্মী শিশু, পথ শিশু, কর্মজীবী শিশু, সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী শিশু, হতদরিদ্র পরিবারের শিশু এবং প্রতন্ত/দূর্গম অঞ্চলের শিশু (চর, হাওর, উপকূলীয় অঞ্চল, নদীর তীরবর্তী, দুর্যোগ কবলিত এলাকা, পাহাড়ী এলাকা, বস্তি এলাকা)। এসব শিশুরা বৈষম্যের শিকার হয় ফলে মৌলিক অধিকার অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

একীভূত শিক্ষাসম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৭ এ বলা হয়েছে:

"(ক) রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সে প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে বর্ণিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৬টি অধিকার-

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলে বিধিবিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত অধিকার থাকবে, যথা-

(ক) পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা ও বিকশিত হওয়া
(খ) সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা
(গ) উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি
(ঘ) স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তি
(ঙ) মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন
(চ) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ
(ছ) শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণ

একীভূত বিদ্যালয়

সকল শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগ-অনুভূতি, বিশ্বাস, ধর্ম, ভাষা বা অন্য কোনো বিভিন্নতা থাকা সত্তেও একই বিদ্যালয়ে আসতে বাধা দেওয়া যাবে না। একই বিদ্যালয়ে যাতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, শ্রমজীবী শিশু, পথ শিশু, যাযাবর সম্প্রদায়ের শিশু, পতিতার সন্তান, উপজাতীয় বা ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার শিশু এবং সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন পরিবারের শিশুরা যাতে শিক্ষা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

একীভূত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

চিত্র : একীভূত শিক্ষা

প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার মূলধারায় সমানভাবে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। সেক্ষেত্রে অনেক রকম বাধা আসতে পারে, যেমন- বিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে চায়না, অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণিশিক্ষকের প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হয়ে যায় আবার শিক্ষার্থীরা নিজেরাও অনেক সময় সহযোগিতা করতে চায় না। তাই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ থেকে বাদ পড়তে পারে এমন বাধাসমূহ চিহ্নিত ও অপসারণ করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রণের সুযোগ করে দিতে হবে। শ্রেণির সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিসহ সকল কার্যকমে পরিপূর্ণ অংশগ্রণের ও শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। শিশুদের বিভিন্নতা, বৈচিত্রতা ও পার্থক্যগুলোর প্রতি ইতিবাচক সাড়াপ্রদানের সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের ভিন্নতাগুলোকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে কারণ এর মাধ্যমেই সম্ভব সকল শিশুর শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা।

একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করা
- প্রত্যেক শিশুর চাহিদা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী শিখন ও জ্ঞান অর্জনের প্রতিবন্ধকতা সীমিতও দূরীকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করা
- প্রতিটি শিশুই আলাদা এবং অনন্য- এই চিরায়ত সত্যকে মেনে নিয়ে প্রত্যেকের জন্য স্কুলে অবাধ শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ শিক্ষাকে শিশুর উপযোগী করে গড়ে তোলা
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই যেন সহজভাবে বিভিন্নতা নিয়ে কাজ করতে পারে
- ভিন্ন সামর্থ্য সম্পন্ন ছেলে/মেয়ে শিক্ষার্থী, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থী, আকার, বয়স ইত্যাদি এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিক্ষার্থী সকলে একত্রে একই ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করতে পারবে
- সকল শিশুর বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে বিদ্যালয়কে উপযোগী করা

কনটেন্ট শিক্ষার মূল কথা, শিক্ষা ব্যবস্থা/শিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে তা বিভিন্ন সামর্থ বিশিষ্ট শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত করা। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ব্যবস্থা/ শিক্ষণ পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত করা নয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভিন্নতার স্বীকৃতি

একটি বিদ্যালয় বা শ্রেণিতে যেসব শিক্ষার্থীরা পড়ে তাদের সবার বৈশিষ্ট্য এক নয়, তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা। তাদের ভিন্নতা বা পার্থক্যের দিকগুলো হলো-

- মেধার ভিন্নতা অর্থাৎ কেউ কম বুঝে কেউ বেশি বুঝে
- অর্থনৈতিক ভিন্নতা-কেউ ধনী কেউ দরিদ্র
- লিঙ্গগত ভিন্নতা-কেউ ছেলে কেউ মেয়ে
- প্রকাশগত ভিন্নতা- কেউ লাজুক বা অন্তর্মুখী আবার কেউ আত্মবিশ্বাসী বা বহির্মুখী
- কোনো শিক্ষার্থী অগ্রগামী আবার কোনো শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়া
- ভাষাগত ভিন্নতা যারা আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের ভাষা বাংলা নয়
- শারীরিক ভিন্নতা- কোনো শিক্ষার্থী বিকলাঙ্গ আবার সামান্যতম শারীরিক সমস্যা আছে যেমন- চোখে কম দেখে, শুনতে অসুবিধা হয়, ঠোঁট কাটা, বাম হাতে লেখে তোতলিয়ে কথা বলে ইত্যাদি

একীভূত শিক্ষার সুফল

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে এর সুফল সমাজের সকল স্তরে পৌঁছাবে। যেমন-

শিক্ষার্থীর সুফল

- সকল শিশু মুক্তভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে
- সকল শিশু আত্মবিশ্বাস ও নিজস্বতাবোধ অর্জন করে
- সকল শিশু বৈচিত্র্যতা বুঝতে ও সম্মান করতে শেখে
- প্রত্যেকেরই ভিন্নতা ও ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা রয়েছে- সব শিশু তা বুঝতে পারে
- সকল শিশুই মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করে
- প্রত্যেক শিশু একে অপরের সহায়তাকারী হিসেবে বেড়ে ওঠে

শিক্ষকের সুফল

- শিখন-শেখানো কার্যক্রম শিশু-কেন্দ্রিক, কার্যকর ও সৃজনশীল হয়
- সমাজ ও অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে শিক্ষক বেশি সহযোগিতা পেয়ে থাকেন
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়

অভিভাবকের সুফল

- শিশুর শিখনের সঙ্গে অভিভাবক আরো বেশি সম্পৃক্ত হন
- বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে অভিভাবকবৃন্দ অবগত হয়ে নিজেদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটান
- বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে অভিভাবকদের বেশি সম্পৃক্ততার কারণে শিশুর শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে বেশি সচেতন হন

সমাজের সুফল

- অধিক হারে শিশু বিদ্যালয়ে গমন ও শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পায়
- সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি কমে আসে
- বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে অধিকহারে সম্পৃক্ততা বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি ঘটায়

জাতি তথা রাষ্ট্রের সুফল

- একীভূত সমাজ গঠিত হয়
- সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হয়

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

- একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বল্পতা
- নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
- প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব
- এক শিক্ষার্থী থেকে অন্য শিক্ষার্থী আলাদাভাবে দেখে পার্থক্য তৈরি করে
- অত্যধিক প্রত্যাশা
- ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি
- সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাব
- একীভূত শিক্ষা বিষয়ে উপযোগী কারিকুলাম ও শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা
- অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বিদ্যালয়
- সকল শিশুর (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ) শিক্ষার অধিকার রয়েছে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
- সমাজের সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর শিশুর বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে সচেতনতার অভাব

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

- একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন
- সকল পর্যায়ে বিশেষ করে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বোধগম্যতা তৈরি
- শিক্ষক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান
- বর্তমান কাঠামোর মাঝে থেকে সঠিক এবং উপযোগী শিখন- শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা
- উপযোগী শিখন-শেখানো উপকরণ ও শিখনসামগ্রী সরবরাহ এবং ব্যবহার
- সকল শিশুর শিখনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নমনীয় কারিকুলাম, সময়সূচি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন
- প্রত্যেক শিশুর শিখন চাহিদার উপর ভিত্তি করে তার উপযোগী প্রতিবন্ধকতাবিহীন এবং শিশু- কেন্দ্রিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা

শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় একীভূত শিক্ষা প্রয়োগের কৌশলসমূহ

সহযোগিতামূলক শিক্ষণ : সহকর্মীদের সহয়তা নিয়ে একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের একীভূত করে পাঠদানে সক্ষম হতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের ভিতরে এবং বাহিরেও সহকর্মীদের সহায়তা নিতে পারেন।

সহযোগিতামূলক শিখন : সতীর্থ শিখন শিক্ষার্থীদের ফলপ্রসূ শিখনে ভূমিকা পালন করে। নমনীয় ও সুবিবেচনা প্রসূত দল গঠনের ফলে শিক্ষার্থীরা শিখনে একে অপরের কাছ থেকে লাভবান হতে পারে।

সম্মিলিতভাবে সমস্যা সমাধান : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ (সামাজিক, আচরণিক ও শারীরিক সমস্যা) নিয়ন্ত্রণে এই কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দলগঠন: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে ভিন্নতা বিশিষ্ট দল তৈরি করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্নমুখী পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য,শিখনের বিকল্প পন্থা, নমনীয় নির্দেশনা এবং একই বিষয় পারদর্শি শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন পরিহার করতে হবে।

কার্যকরি শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ : শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ ও ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। কনটেন্ট শিক্ষার সার্থক অনুশীলনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর আরো জোর দিতে হবে।

যেমন-

- শিক্ষকদের কনটেন্ট শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- স্কুল ম্যানেজিং কমিটির জন্য কনটেন্ট কনটেন্ট শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- অবিভাবককে সচেতন করা
- সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে পারে তা নিশ্চিত করা যেমন–একজন শারীরিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী যেন হুইল চেয়ার নিয়ে শ্রেণি কক্ষে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা
- সহায়ক উপকরণ যেমন–হুইল চেয়ার, চশমা, ব্রেইল শ্লেট ও স্টাইলোস, সাদা ছড়ি, হেয়ারিং এইড ইত্যাদি। এইস সব জিনিসগুলো এন.জি.ও সরকারি দপ্তর থেকে বিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহের মানসিকতা তৈরি
- আলাদা তহবিল তৈরি করা
- শ্রুতি লেখক নিয়োগের ব্যবস্থা
- বিশেষ পারদর্শিতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা
- কনটেন্ট শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন বলতে কী বোঝেন ?
২. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী ?
৩. পাঠ পরিকল্পনার ধাপ বা সোপান বলতে কী বোঝায় ?
৪. একটি পাঠ পরিকল্পনায় কয়টি ধাপ বা সোপান থাকতে হয় এবং সেগুলো কী কী ?
৫. একীভূত শিক্ষা কী ?
৬. একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী ?
৭. একীভূত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী ?
৮. একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানের আইনটি কী ?
৯. কনটেন্ট শিক্ষার স্বার্থক অনুশীলনের দিকগুলো কী কী ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষক হিসেবে আপনি কিভাবে আপনার পেশাগত উন্নয়ন সাধন করবেন তার কৌশলগুলো আলোচনা করুন।
২. একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো ও অংশসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করুন ।
৩. শিক্ষক হিসেবে আপনি শ্রেণিকক্ষে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন এবং কিভাবে তা সমাধান করে থাকেন? উদ্ভূত সমস্যায় একজন শিক্ষকের করণীয় দিকগুলো আলোচনা করুন ।
৪. একীভূত শিক্ষার বাস্তবায়নের অসুবিধা ব্যাখ্যা করুন ।
৫. একীভূত শিক্ষাসম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ব্যাখ্যা করুন ।
৬. একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করুন ।
৭. শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় একীভূত শিক্ষা প্রয়োগের কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন ।

তথ্যসূত্র

১. শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক রিসোর্স বুক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
২. একীভূত শিক্ষার ধারণা ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম
৩. বাংলাদেশ সংবিধান
৪. ইন্টারনেট
৫. আক্তার, মাহবুবা (২০১৫), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা: সংরক্ষণ প্রকাশন
৬. আলী, আজহার ও বেগম, হোসনে আরা (১৯৯৩), প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
৭. আলী, শাহানুর, ও রিয়াদ, আলমগীর হোসেন (২০০৩), মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ, ঢাকা: ন্যাশনাল আইডিয়াল প্রকাশনী।
৮. এহসান, মোঃ আবুল (১৯৯৭), শিক্ষাক্রম উন্নয়ন: নীতি ও পদ্ধতি, ঢাকা: ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি।
৯. খান, ড. মোঃ আবদুল আউয়াল ও অন্যান্য (১৯৯৮), শিক্ষার ভিত্তি, ঢাকা: মিতা ট্রেডার্স।
১০. বেগম, কামরুন্নেসা ও আখতার, সালমা (২০০০), প্রাথমিক শিক্ষা : বাংলাদেশ, ঢাকা: ইউনিক প্রেস
১১. বেগম, হোসনে আরা ও হোসেন, মোঃ জাকির (১৯৯৮), শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, ঢাকা: মানামা প্রিন্টার্স।
১২. মালেক, আব্দুল, ও অন্যান্য (২০০৯), শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
১৩. রায়, সুশীল (২০১০-২০১২), শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ, কলিকাতা: সোমা বুক এজেন্সি
১৪. রহমান, মোহাম্মদ মুজিবর (২০০৮), শিক্ষার দার্শনিক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, ঢাকা: প্রভাতী লাইব্রেরী
১৫. হক, মুজাম্মেল ও অন্যান্য (২০১০), শিক্ষানীতি ও শিখন পদ্ধতি, গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিট ৭ : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জীবনদক্ষতার অনুশীলন

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের। এ সময়টাতে পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মানুষ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন– পরিবারের আর্থিক প্রয়োজনে পিতামাতা দুজনেই বাইরে কাজ করেন। যৌথ পরিবারের ধারণা ভেঙে একক পরিবারে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় পিতামাতা সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে পারেন না। তাছাড়া সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির প্রভাবে ভালোমন্দ দু'ধরনের তথ্যই সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। আধুনিকতা ও উন্নয়নের ছোঁয়া সমাজে প্রতি নিয়ত নতুন বিষয়, নতুন তথ্যের সন্ধান দিচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি মানুষকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও লক্ষ্যের মুখোমুখি করছে। মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে যেমন উন্নতি ও পরিবর্তন ঘটছে তেমনি সামাজিক জীবনেও সংযোজিত হচ্ছে বিভিন্নমুখী বিন্যাস। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে। আর এ প্রতিযোগিতায় যেমন অভিভাবকগণ সামিল হচ্ছেন তেমনি হচ্ছে কোমলমতি শিশু কিশোররা। প্রতিদিনকার এ চ্যালেঞ্জকে সাথে নিয়েই তাদের এগোতে হচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে অনেক কিছুই তাদের কাছে ও অজানা। অনেক ক্ষেত্রে পিতামাতা বা অভিভাবকগণও সমাজের নানামুখী পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জের সাথে তাল মিলাতে পারেন না।

বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের এ ধরনের পরিস্থিতিতে যে বিষয়টি সমস্যা তৈরি করছে সেটি হচ্ছে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সংযোগ। বিশেষত কিশোর ও বয়ঃসন্ধিকালটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় ছেলেমেয়েরা যেসব সমস্যায় ভোগে অনেক সময়ই তারা সে সম্পর্কে বিষয়গতভাবে অবগত থাকে না। পিতামাতা কিংবা আত্মীয়-স্বজনের সাথে শেয়ার করতে পারে না। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমস্যা নিয়ে তারা প্রায়শই বিষণ্ন ও বিপন্নতায় ভোগে। বর্তমান সময় শিশু কিশোরদের বহুমুখী সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে জটিল। একটি সময় ছিল যখন শিশু কিশোরা খেলাধুলা, বইপড়া, প্রকৃতির সাথে মেলবন্ধনের মাধ্যমে সময় কাটত। হয়ত বা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঝগড়া-বিবাদ হত কিন্তু মারাত্মক বিষয় তাদের আক্রান্ত করত না। শিশু পাচার, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, শিশু ও কিশোরী নির্যাতন, ধর্ষণ, অকাল গর্ভধারণ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, মাদকাসক্তি, এইচআইভি/এইডস ও বিভিন্ন যৌনরোগ, শিশুশ্রম, সহিংসতা, সন্ত্রাসের মতো নানাবিধ বিষয় সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্লীন। প্রায় সব গুলো সমস্যাই পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের যা পরবর্তীকালে সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। পারিবারিক জীবনে অভিভাবকগণও এ ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির সংগে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হচ্ছেন না। শিশু কিশোররা এ ধরণের সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে কিংবা বুদ্ধিমত্তার সাথে মোকাবিলা করতে পারছে না। পিতামাতা অভিভাবক বা আত্মীয় স্বজনও অনেক ক্ষেত্রে এসব বিষয় মনোযোগী হন না। সব মিলিয়ে কিশোর কিশোরীদের এ ধরনের ভয়াবহ সামাজিক সমস্যার অনেকক্ষেত্রেই তাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। অল্প বয়সেই মাদকাসক্তি কিংবা যৌননির্যাতনের মতো ভয়াবহ সমস্যায় অকালে তাদের জীবন ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। প্রশ্ন হলো কিভাবে তারা এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ বা নিষ্কৃতি পেতে পারে।

প্রথমেই বলতে হবে কিশোর কিশোরীদের সাহস, দক্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধি ঘটিয়ে সামর্থবান করে তুলতে হবে। যে কোনো ধরনের বিবাদ ও সমস্যা কাটিয়ে ওঠার দক্ষতা তৈরি করা যেন তারা ভীত সন্তস্ত হয়ে বিপথগামী না হয়। কিশোর কিশোরীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের Concept বা ধারণা খুবই জরুরি সেটি হলো জীবন দক্ষতা। জীবন দক্ষতার সুফল ছেলেমেয়েদের প্রতিদিনকার জীবনযাপনের প্রবাহকে বৈরি পরিবেশের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিশোর ও তরুণ সম্প্রদায় ক্ষমতায়িত হবে। গতিশীল সমাজ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সংগে খাপ খাইয়ে চলার সক্ষমতা অর্জন করবে।

এই ইউনিটে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হলো-

৭.১ জীবন দক্ষতার ধারণা

৭.২ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ১০টি জীবন দক্ষতা

৭.৩ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোকে জীবনদক্ষতা চিহ্নিতকরণ ও অনুশীলন

৭.১ জীবন দক্ষতার ধারণা

জীবন দক্ষতা হলো এক ধরণের বিমূর্ত বিষয়। এটি অর্জন করা ও লালন করে চলার বিষয়। ব্যক্তি মানসিকতার সামাজিক সম্পর্কায়ন। অর্থাৎ ব্যক্তি মানসের সাথে সমাজের সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতা যা চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে সক্ষম। জীবন দক্ষতা ব্যক্তির সম্ভাবনা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে বিকশিত করে জীবনের সব ক্ষেত্রে সাফল্য তৈরিতে সহায়তা করে। জীবন দক্ষতাকে মানবদক্ষতা, মনোসামাজিক দক্ষতা, ব্যক্তিদক্ষতা, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা, আত্ম নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা বলেও অভিহিত করা হয়। জীবন দক্ষতার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

জীবন দক্ষতার ধারণার সাথে সুস্থ দেহ, সুস্থ মন ও সুস্থ বিকাশের সম্পর্ক রয়েছে। সুস্বাস্থ্য শব্দটি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সম্পর্কিত। দক্ষ মানুষ হয়ে উঠতে চাইলে সুস্থ মন ও দেহের অধিকারী হতে হবে। তাহলে সমাজে সুস্থতা তৈরি হবে। শিক্ষার্থী তেমন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আগ্রহী হবে তেমনি নানা রকম ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহারে সমর্থ হবে ফলে বিভিন্ন সংক্রমণজনিত রোগ থেকে রেহাই পাবে।

জীবন দক্ষতা তৈরিতে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার ধারণা

জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা এমন একটি শিখন-শেখানো অভিজ্ঞতা বা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন দক্ষতাসমূহ অর্জন করে। যে কোনো শিক্ষা প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের আচরণিক পরিবর্তন ঘটানো। আচরণিক পরিবর্তন ঘটে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি/মানসিকতা এগুলো পরিবর্তনের সম্মিলিত প্রভাবে। সুতরাং যে কোনো শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, জ্ঞানকে প্রয়োগের জন্য দক্ষতার অনুশীলন এবং দক্ষতাকে কাজে লাগানোর মানসিকতা সৃষ্টির ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যিক। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতাসমূহ আয়ত্ত ও আত্মস্থ করানোর উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি শিক্ষা। এটি শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা কার্যক্রমে এমনভাবে পরিকল্পিত ও প্রণীত হয় যে পাঠসমূহ ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্যেই দক্ষতাসমূহ অর্জন করার একটি অন্তলীন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়।

জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষার্থীকে সুরক্ষামূলক আচরণ করতে এবং ঝুকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে সামর্থ করে
- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতার মধ্যে ভারসাম্য বিধান করে শিক্ষার্থীর আরচণিক পরিবর্তন ঘটায়
- জীবন দক্ষতা সনাক্ত করা যায়, প্রদর্শন করা যায় উপদক্ষতা ও অনুদক্ষতায় বিভাজন করা যায়, অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায়
- জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা জেন্ডারপ্রবণ, অধিকারভিত্তিক ও বয়সোপযোগী
- অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান ও দক্ষতা জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার একটি বড় উপাদান
- এ শিক্ষাকে স্বাস্থ্যশিক্ষাও বলা হয়
- এ শিক্ষা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে
- এ শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের জন্য কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা আবশ্যক

জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার সার্বিক/সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

শিক্ষক কর্তৃক বয়সোপযোগী জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতাসম্পন্ন উপযুক্ত ও দক্ষ কিশোর কিশোরী গড়ে তোলা। তাদের মধ্যে নিজেদের সকল সম্ভাবনা ও প্রচ্ছন্ন শক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটিয়ে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার সামর্থ্য ও প্রণোদনা সৃষ্টি করা।

- শিক্ষার্থীদের আধুনিক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করা এবং সফলতা লাভের জন্য আত্মবিশ্বাসী করে তোলা
- শিক্ষার্থী কর্তৃক দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ও প্রতিকূলতা উত্তরণে সক্ষমতা অর্জন
- শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, সবল ও নিরাপদ জীবনযাপনে সক্ষমতা অর্জন
- ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে অবদান রাখার সামর্থ্য অর্জন

জীবন দক্ষতা তৈরিতে শিক্ষার্থীর দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তিজীবনে একজন শিক্ষার্থীকে জীবন দক্ষতা অর্জন করতে হলে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষকরাই এ দায়িত্ব পালন করবেন। তারাই জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে প্রকৃত সহায়কের ভুমিকা পালন করতে পারেন।

এ দক্ষতা শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সকল শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফল হওয়ার ভিত্তি তৈরি করে দেয়। জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হতে, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ, সূক্ষ্ম ও সৃজনশীল চিন্তনে কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টিতে, সুস্থ সম্পর্ক গড়তে, অন্যের প্রতি সহমর্মী হতে এবং চাপ ও আবেগ মোকাবিলায় সমর্থ করে তোলে। এর ফলে শিক্ষার্থী ইতিবাচক আচরণ আত্মস্থ করার মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তুলতে

পারে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতার মধ্যে ভারসাম্য বিধান করে শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তন ঘটে। এ শিক্ষা প্রদানে অংশ গ্রহণমূলক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন শেখানো পদ্ধতি অবশ্য এ শিক্ষা জেন্ডার প্রবণ, অধিকার ভিত্তিক ও বয়স উপযোগী। এটি ছেলে মেয়ে উভয়েরই ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকূলতা মোকাবিলার ও মানবাধিকারের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়। এ শিক্ষা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন করে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কে উন্নয়ন সাধন করে। বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করে ও শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাস করে। এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে সক্ষম, সুস্থ, দক্ষ, নীতিবান ও বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলে সুষ্ঠু সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর আধুনিক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করা এবং সফলতা লাভের জন্য আত্মবিশ্বাসী করে তোলা। স্থান, কাল, পাত্র সামাজিক মূল্যায়ন, রীতিনীতি ও গোষ্ঠীর প্রত্যাশাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

প্রধানত উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের শিশু কিশোরদের এসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা বেশি করতে হয়। বিশ্বব্যাপী ও অঞ্চল বিশেষে বিরাজমান সমস্যা উভয় ক্ষেত্রেই জীবন দক্ষতা কার্যকর সমাধান দেয়। এসব ছাড়াও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যেমন অটিজম আক্রান্ত বা শারীরিকভাবে অসমর্থ এমন শিশুদের সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা অত্যন্ত কার্যকর। এসব শিশুদের স্বাবলম্বী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মনোসামাজিক এবং মনোদৈহিক দক্ষতাগুলো জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। এ কারণে শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এসব শিশুর নানা রকম চাহিদা পূরণের বিষয়টি জীবনদক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার আওতাভুক্ত। এই শিক্ষা কর্মসূচির সাথে সমাজ কল্যাণ বা সমাজ কর্ম বিষয়ক কর্মসূচির সম্পৃক্ততা আছে। জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাকে অনেক সময় 'দক্ষতাভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা হিসাবে অভিহিত করা হয়। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলায় জীবন দক্ষতা অত্যন্তকার্যকর এবং সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। ওপরের বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ কথা বলা যায় যে, জীবন ও দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাকে বাংলাদেশের সকল স্কুল, মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করা হলে শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো জ্ঞান আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং বাস্তব পরিস্থিতি আরও বেশি মোকাবিলা করে চলতে পারবে। ত্রিমাত্রিক স্বাস্থ্যশিক্ষা জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বিষয়বস্তু। যেহেতু জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার অন্যতম উপায় বা হাতিয়ার সেহেতু এই শিক্ষা কর্মসূচির সাথে সমাজকল্যাণ বা সমাজকর্ম বিষয়ক কর্মসূচিরও সম্পৃক্ততা রয়েছে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক বিষয়বস্তুর আওতাভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মাতৃত্ব পিতৃত্ব শিক্ষা। গর্ভকালীন অবস্থা থেকে শুরু করে শিশুর জন্ম ও বেড়ে ওঠার পুরো সময়েই যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য মাতাপিতাকে জীবন দক্ষতা শিক্ষা দেওয়া জরুরি। এছাড়া মাতাপিতার আচরণের কারণে, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে বা সন্তানের বিভিন্ন রকম ঝুকিপূর্ণ আচরণের (যেমন– মাদকাসক্তি, সমাজবিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়া, মাতাপিতার সাথে অসদাচরণ) কারণে-যে কারণেই হোক না কেন সনাতন পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে যেতে পারে বা পরিবারের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব দেখা দিতে পারে। এসব পরিস্থিতির মোকাবিলায় জীবন দক্ষতা অত্যন্তকার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সহিংসতা, সংঘর্ষ মোকাবিলায় ও এ সকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

৭.২ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সনাক্তকৃত ও সংজ্ঞায়িত দশটি জীবন দক্ষতা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১০টি মূল জীবন দক্ষতাকে সনাক্ত ও সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ সংস্থাটির মতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অবশ্যই এ দক্ষতাগুলো অর্জন করবে।

১। আত্মসচেতনতামূলক দক্ষতা (Self awareness) **:** নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি ও পোষণ করা, নিজ সামর্থ্য, সবলতা, দুর্বলতা, গুণাবলি ও ত্রুটি নিরূপণ করা। শিক্ষার্থীর নিজ আচরণ সংশোধন করা, স্বনির্দেশনা এবং নিজের ও অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা। নিজ আবেগ ও অনুভূতি সম্পর্কে সচেতনতা, নিজ বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সনাক্ত করা, অনভিপ্রেত ও নেতিবাচক চিন্তাভাবনা বন্ধ করা।

২। সহমর্মিতা দক্ষতা (Empathy) **:** প্রত্যেকের অন্যের সমস্যা মন দিয়ে কোনো, অন্যের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করা, অন্যের গুণগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা। অপরের যে কোনো বিষয়ে ইতিবাচক হওয়া, অনুভূতিতে সাড়া দেওয়া এবং প্রয়োজনে সাহায্য ও সহযোগিতা করার প্রস্তাব করা।

৩। আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা (Interpersonal relationships) **:** ব্যক্তির নিজের আবেগ জানা, বোঝা ও নিয়ন্ত্রণে রাখার সক্ষমতা তৈরি করা। নিজের সবল ও দুর্বল দিকগুলো জানা, রাগ, ক্ষোভ তথা অপ্রত্যাশিত আবেগের বহি:প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে রাখা। আত্ম-প্রত্যয়/আত্ম-বিশ্বাসী হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ, কর্মসম্পাদনে সীমিত ঝুঁকি নিতে তৈরি থাকা, সমস্যা সমাধানে নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাওয়া, পরিস্থিতি ভেদে ক্ষমা করার এবং তা ভুলে যাওয়ার মানসিকতা অর্জন এবং ব্যর্থতা উত্তরণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা।

৪। বিশ্লেষণমূলক গভীর চিন্তন দক্ষতা (Critical thinking) : সঙ্গী, সাথী ও মিডিয়ার প্রভাব, তথ্য ও পরিস্থিতি, বিজ্ঞাপন, বিবৃতি ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার দক্ষতা। প্রাসঙ্গিক তথ্য চিহ্নিত করা, তথ্যের উৎস অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা। সংগৃহীত তথ্য প্রণালীবদ্ধভাবে বিশ্লেষণের ও যৌক্তিক উপসংহারে উপনীত হওয়ার দক্ষতা।

৫। যোগাযোগ দক্ষতা (Effective communication) : মন দিয়ে কোনোর অভ্যাস গড়ে তোলা, বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা করা, নিজে যখন বলবেন বা লিখবেন-সুস্পষ্ট স্বরে, সঠিক শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ বাক্য বলা বা লেখার অভ্যাস করা। অন্যকে দোষারোপ করে কথা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করা, আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার না করা, কথা বলার সময় যাচাই করা যেন সবাই বুঝতে পারছেন কিনা, কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনায় আগ্রহ দেখানো, সততার সঙ্গে কথা বলা, বর্ণনার সময় খুঁটিনাটি বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ না দেওয়া, প্রয়োজন হলে ক্ষমা চাওয়া।

৬। সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative thinking) : শিক্ষার্থীর প্রচুর পড়াশোনা ও ভাবনাচিন্তা করার অভ্যাস করা, গতানুগতিকতার বাইরে কিছু করার চেষ্টা করা, সব বিষয়ে নতুন ধারণা সৃষ্টি করা, নতুন কোনো রচনা, বস্তু তৈরি করা, নতুন যুক্তি উপস্থাপন করা।

৭ ও ৮। সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জনের ধাপসমূহ (Problem solving and Decision making) : পরিস্থিতি, সমস্যা, বিপদ, চ্যালেঞ্জ বা কাজ ঠিক মতো বুঝে নেওয়া, সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা, সম্ভাব্য সমাধানসমূহ চিহ্নিত করা, প্রতিটি বিকল্প সমাধানের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ফলাফল বিবেচনা করা (মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ঝুঁকি, অনুভূতি বিবেচনায় নেওয়া), বিকল্পসমূহ থেকে এটি সমাধান/সিদ্ধান্ত নির্বাচন করা, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

৯। চাপ মোকাবিলার দক্ষতা (Stress Managment) : মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী উপাদন/পরিস্থিতি/ব্যক্তি সনাক্ত করতে পারা। ব্যক্তির শরীর ও মন কিভাবে এই সকল চাপ সৃষ্টিকারী উপাদানের প্রতি সাড়া দেয়, তা সনাক্ত করতে পারা। নিজেকে শান্তরাখা, চাপ বা আবেগ এর জন্য দায়ী উপাদান হ্রাস করা বা দর করার চেষ্টা করা। বন্ধু বা নির্ভরযোগ্য কারো সাথে আলোচনা করা। সহমর্মী কারো সাথে মনের কষ্টের কথা বললে চাপ লাঘব হয়, গ্রহণযোগ্য পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা।

১০। আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা (Emotion Managment) : আবেগ (রাগ, ভয়, হিংসা, ঈর্ষা, হতাশা ইত্যাদি) এর কারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে কারণগুলো দর করা বা সেগুলোর তীব্রতা হ্রাস করার ব্যবস্থা করা। আবেগ কাটিয়ে ওঠার জন্য দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা, মনে রাখতে হবে, কোনো অবস্থাই স্থায়ী নয়-ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কোনো আনন্দময় বা খুশির ঘটনা মনে করা, যে কোনো পরিস্থিতিতেই মনোবল বজায় রাখা, নিজেকে শান্ত থাকতে বলা এবং ধৈর্য ধারণ করা। নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত আত্মীয়, বন্ধু, শিক্ষক এর সাথে মানসিক অবস্থা শেয়ার করা এবং তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া।

৭.৩ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোকে জীবন দক্ষতা চিহ্নিতকরণ ও অনুশীলন

একবিংশ শতাব্দীতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে চলছে। তারা বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা, মাদকাসক্তি, যৌনও প্রজনন স্বাস্থ্য এইচ আইভি/এইডস, শিশু পাচার, বাল্য বিবাহ, যৌতুক, যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও সহিংসতার মতো অনেক সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। এসব সমস্যা সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করতে বন্ধু ও সহপাঠীরা এবং অনেক সময় পিতা মাতা ও সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দিতে পারে না। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনো-সামাজিক দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষকগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিকূল অবস্থা ও সমস্যা মোকাবিলা এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করতে পারেন। জীবন একটি অসীম ও বহুমাত্রিক বিষয়। একে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। জীব বিজ্ঞানীরা বলেছেন, জড় ও জীবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে জীবন। আবার কেউ, কেউ বলেন, জীবন ক্ষণস্থায়ী, স্বপ্নের মতো। মৃত্যুই একমাত্র সত্য। তাছাড়া এ কথাও বলা যায় যে, মাতৃগর্ভে প্রাণ সঞ্চারের সময় থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময় হচ্ছে জীবন। কিন্তু শুধু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় অবস্থা এবং ঘটনা প্রবাহের সমষ্টিই হচ্ছে জীবন। আর দক্ষতা হচ্ছে লব্দ জ্ঞানকে জীবনের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করার সামর্থ বা সক্ষমতা। মানুষ তখনই কিছু করতে পারে যখন সে বিষয়টি সম্পর্কে জানে, কী করতে হবে এবং কেমন করে করতে হবে তা জানে এবং সেগুলো অনুশীলনও করে। অর্থাৎ জ্ঞান, অনুশীলন, ইতিবাচক মানসিকতা এই তিনটির সম্মিলন ঘটলে দক্ষতা অর্জন করা যায়, যা ব্যক্তির আচরণে প্রকাশ পায়। জীবন দক্ষতা এবং জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এক নয়। জীবন দক্ষতা হলো ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা সমাজের সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতা যা বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণে সাহায্য করে। ব্যক্তির নিজ জীবনের বা মনোগত সমস্যা সঙ্কট উত্তরণের দক্ষতা। এ দক্ষতা শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সকল শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফল হওয়ার ভিত্তি তৈরি করে দেয়। জীবন দক্ষতা ধারণাটি সুস্বাস্থ্যের সাথেও সম্পর্কিত। এ দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক আচরণ করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে অভ্যস্ত করে নানা রকম রোগের সংক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে জীবন দক্ষতা

জীবন দক্ষতা হচ্ছে মনোসামাজিক দক্ষতা (Psychosocial Skills) যা একজন শিক্ষার্থীকে তার জীবনের সম্ভাব্য যে কোনো সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা এবং যে কোনো পরিস্থিতি নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম করে তোলে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে এ দক্ষতাগুলো আরো নানাভাবে বর্ণিত আছে। যেমন– আত্মনিয়ন্ত্রণের দক্ষতা, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা। কারণ শিক্ষার্থীরা যেন নিজ জীবনের প্রয়োজন পূরণ এবং সমস্যা মোকাবিলার জন্য ব্যক্তিকে সমাজের অপরাপর মানুষের সাথে নানারকম সম্পর্কে আবদ্ধ হতে হয়, সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা আয়ত্ত করতে হয়। এজন্য এ দক্ষতাগুলোকে মানব দক্ষতা হিসেবেও অভিহিত করা হয়। বর্তমান কিশোর-কিশোরীদের জীবনের প্রেক্ষাপট এবং সমস্যা তাদের পূর্বসুরিদের সমস্যার চেয়ে অনেকটাই অন্যরকম। বর্তমান সময়ে কিশোর বয়সীরা মাদকে আসক্ত হওয়া, মিডিয়ার কুপ্রভাব, বিপথগামী সমবয়সী এবং সমাজের নানা অপরাধী চক্রের কবলে পড়া, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের বলি হওয়া, দেশে-বিদেশে পাচারের শিকার হওয়া এসব ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। এছাড়াও রয়েছে শারীরিক, মানসিক ও যৌননির্যাতনের শিকার হওয়া। এসকল নির্যাতন শিশুদের, কর্মস্থলে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এমনকী নিজ পরিবারেও ঘটতে পারে। জীবন দক্ষতা শিক্ষার্থীকে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সক্ষম করে তোলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, æLife skill are abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life"
জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা এমন একটি শিখন- শেখানো অভিজ্ঞতা বা Approach যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন দক্ষতাসমূহ অর্জন ও আত্মস্থ করে এবং নিজ জীবনের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করার অনুশীলন করে। জীবন দক্ষতা শিক্ষার্থীকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে এবং অন্যের প্রতি সহমর্মী হতে শেখায়। সমস্যার সমাধানে চিন্তাভাবনা প্রসূত যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, সুস্থ্য সম্পর্ক গড়তে, সকল অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিতে এবং ইতিবাচক আচরণ করতে সক্ষমতা দেয়। ফলে তারা সুস্থ্য, নিরাপদ এবং প্রাণবন্তভাবে বাঁচে এবং দক্ষ ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠে। জীবন দক্ষতা সম্পন্ন কিশোর-তরুণেরা নিজের, পরিবারের, গোষ্ঠির এবং সমাজের উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

তাছাড়া বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের নানারকম শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন নিয়ে বিব্রত ও অসহায় বোধ করে। আবার পরিবর্তনশীল বিশ্বে তাদের বহুবিধ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য তাদের সামর্থ্য সৃষ্টির একটি বড় উপায় হচ্ছে জীবন দক্ষতা অর্জন ও তার প্রয়োগ। জীবন দক্ষতার উপদানগুলিকে ১০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–(১) আত্মসচেতন মূলক দক্ষতা (২) সহমর্মিতার দক্ষতা (৩) অন্ত:ব্যক্তিক দক্ষতা (৪) চিন্তন দক্ষতা (৫) যোগাযোগ দক্ষতা (৬) সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (৭) সমস্যা সমাধান দক্ষতা (৮) সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (৯) চাপ মোকাবিলার দক্ষতা (১০) আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা।

মূলত এই দশটি উপাদানের ওপর ভিত্তি করে জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষার্থীদের পুরোপুরিভাবে দক্ষ করে তোলার জন্য এই দশটি উপাদানের ভূমিকা মুখ্য হিসেবে কাজ করবে। জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে আত্মসচেতন ও অবিশ্বাসী হতে, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ, সূক্ষ্ম ও সৃজনশীল চিন্তনে কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টিতে, সুস্থ্য সম্পর্ক গড়তে, অন্যের প্রতি সহমর্মী হতে এবং চাপ ও আবেগ মোকাবিলায় সমর্থ করে তোলে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ইতিবাচক আচরণ আত্মস্থ করার মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার (৬ষ্ঠ- ১০ম শ্রেণি) বর্তমান শিক্ষাক্রমে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি

২০০৪ সাল থেকে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টির সূচনা হয় । কিন্তু আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলো তাদের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত এবং বাস্তবায়ন করেছে প্রায় দেড় দশকেরও বেশি সময় থেকে। অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নেতৃত্বে ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর আর্থিক ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় "মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণ" শীর্ষক একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্টেকহোল্ডার এর সমন্বয়ে একটি ওয়াকিং গ্রুপ গঠন করা হয়। এই ওয়ার্কিং গ্রুপের ক্রমান্বয়ে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন শিক্ষাক্রমভিত্তিক বিষয়বস্তু নির্ধারণ, বিষয়বস্তু সংশিষ্ট পাঠসমূহ প্রণীত হয়। দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোকে মোট ৭৫টি পাঠ প্রণীত হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের (১১-১৫) অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীদের প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করতে হয় এমন সব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ যা জীবন দক্ষতা ভিত্তিক পাঠসমূহের বিষয়বস্তু। এর মধ্যে রয়েছে ইনজুরি, মাদকাসক্তি, শিশুশ্রম ও শিশু পাচার, শারীরিক, মানসিক ও যৌননিপীড়ন, যৌনরোগ ও এইচআইভি /এইডস এর ব্যাপক বিস্তার, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক, বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা, মেয়েদের ক্ষেত্রে

অকাল গর্ভধারণ, নানা রকম বৈষম্য ও বঞ্চনা। এই মনোসামাজিক সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের উপায় হচ্ছে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও উক্ত শিক্ষাক্রমভিত্তিক পাঠসামগ্রী প্রণয়নকালে চারটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে। যেমন–

১. বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর-কিশোরীরা প্রতিনিয়ত যে সকল সমস্যা বা বিপদের সম্মুখীন হয়, সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা

২.শিক্ষাক্রম ও পাঠসামগ্রী দক্ষতাভিত্তিক করা এবং বিভিন্ন পাঠে ১০টি জীবন দক্ষতা অঙ্গীভূত করা

৩. শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করা

৪.শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাহিরে পাঠসমূহ শিক্ষণ-শিখনকালেই যেন শিক্ষার্থীরা দক্ষতাসমূহ আয়ত্ত করতে পারে, সে লক্ষ্যে কর্মপত্র সন্নিবেশ করা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করা

মাধ্যমিক পর্যায়ের ষষ্ঠ-দশম শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে জীবন দক্ষতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চারটি বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন– ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা, এইচআইভি এবং এইডস, মাদকদ্রব, বয়ঃসন্ধি ও প্রজনন স্বাস্থ্য।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের দক্ষতাসমূহ শ্রেণিভিত্তিক অনুশীলন

শ্রেণি: ষষ্ঠ

অধ্যায়-একাদশ

বাংলাদেশের শিশুর বেড়ে ওঠা ও প্রতিবন্ধকতা এখানে জীবন দক্ষতার আত্মসচেতনতা ও সহমর্মিতা বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন-

<table>
<tr><th colspan="2">ব্যক্তিগত নিরাপত্তা</th></tr>
<tr><th>বিষয়বস্তু</th><th>অনুশীলনী</th></tr>
<tr><td>শিশুশ্রম, কারণ ও প্রভাব</td><td>বোর্ডে ‘শিশুশ্রম’ লিখে শিক্ষার্থীদের ধারণাগুলো মাইন্ড ম্যাপিং আকারে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন-
আমাদের দেশের শিশুরা সাধারণত কোনো ধরনের শিশুশ্রমে নিয়োজিত? শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। পরবর্তীতে শিক্ষক পত্রিকা বিক্রি, বোঝা বহন, মোটরগাড়ির ওর্যাকশপে কাজ, টেম্পোতে সাহায্যকারীর কাজ, বিপজ্জনক গাড়ির পাশে ফুল বা ফুলের মালা বিক্রি প্রভৃতি ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।
জোড়ায় আলোচনা করে একটি করে শিশুশ্রমের কারণ ও ফলাফল লিখতে বলবেন। প্রত্যেক জোড়া আলোচনা শেষে নিচের ছকটি পূরণ করবে।
<table><tr><td rowspan="2">ক্রমিক নং</td><td rowspan="2">শিশুশ্রমের ধরন</td><td colspan="2">ক্ষতিকর দিক</td></tr><tr><td>শারীরিক</td><td>মানসিক</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রতি সহমর্মিতা</td><td>ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীদের দিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে কোনো একটি শিশুশ্রম উপস্থাপন করাবেন এবং এদের প্রতি সহমর্মিতার বিষয় তুলে ধরবেন। যেমন বাসা-বাড়ির কাজে নিয়োজিত শিশু এবং এদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ।</td></tr>
<tr><td>শিশুপাচার, শিশুপাচারের কৌশল, কারণ ও ক্ষতিকর দিক</td><td>শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুপাচার সম্পর্কে আলোচনা , এ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, পরবর্তীতে শিক্ষক শিশুপাচারের কৌশলের ছবি/ভিডিও উপস্থাপনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন। শিশুপাচারের বিভিন্ন পরিস্থিতি ভিপকার্ডে লেখা থাকবে শিক্ষার্থীরা সনাক্ত করবে কোনোটি ঝুঁকিপূর্ণ অথবা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। যেমন বন্ধুর আমাণে তার বাড়িতে রাত্রি যাপন, অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া খাদ্য গ্রহণ, আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া, পাশের বাড়ির বন্ধুর সাথে খেলা করা, অপরিচিত ব্যক্তির আমন্ত্রণে তার সাথে যাওয়া প্রভৃতি। শিক্ষার্থীদের মতামত নিয়ে শিক্ষক পোস্টার পেপারে শিশুপাচারের কৌশল ও করণ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন।</td></tr>
<tr><td>শিশুপাচার প্রতিরোধ</td><td>শিক্ষার্থীরা দলগত আলোচনা করবে শিশুপাচার রোধে শিক্ষার্থীদের করণীয়, এলাকাবাসীর করণীয়। আলোচনা শেষে দলনেতা বিষয়টি উপস্থাপন করবে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীদের দিয়ে বিদ্যালয়ে র‍্যালি প্রদর্শন।</td></tr>
</table>

সপ্তম শ্রেণি

অধ্যায় দশম -বাংলাদেশের সামজিক সমস্যা

এপাঠে জীবন দক্ষতার অত্মসচেতন বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে

<table>
<tr><th>বিষয়বস্তু</th><th>অনুশীলন</th></tr>
<tr><td colspan="2">ব্যক্তিগত নিরাপত্তা</td></tr>
<tr><td>যৌতুক</td><td>আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক পরিবেশ তৈরি করে যৌতুক শব্দটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণাসমূহ বোর্ডে লিখতে বলবেন। পরবর্তীতে উদাহরণ দিয়ে ধারণা স্পষ্ট করবেন।</td></tr>
<tr><td>যৌতুকের কারণ ও প্রভাব</td><td>জোড়ায় আলোচনা করে ভিপকার্ডে যৌতুকের একটি করে প্রভাব লিখে শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করাবেন। শিক্ষক পোস্টার পেপার/ স্লাইডের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করবেন।</td></tr>
<tr><td>যৌতুক নিরোধ আইন</td><td>যৌতুক নিরোধ আইনটি পোস্টার পেপার/ স্লাইডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন।</td></tr>
<tr><td>যৌতুক প্রতিরোধ ও সামাজিক আন্দোলন</td><td>শিক্ষক এককভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে পোস্টার পেপার/ স্লাইডের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ উপস্থাপন করবে-
মেয়েদের অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে।
মেয়েদের তাদের অধিকার এবং মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।
মেয়েদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
যৌতুক না নিয়ে বিয়ে করতে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বোঝাতে হবে এটি তার আত্মমর্যাদার জন্য ক্ষতিকর।
বেকার সমস্যা দূর করতে হবে।
সমাজে যৌতুকের প্রতি ঘৃণা ও যৌতুকবিরোধী সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে যৌতুক সংক্রান্তবির্তক ও নাটিকা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে।
সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে যৌতুকবিরোধী প্রচার চালাতে হবে।
যৌতুকবিরোধী আইন সম্পর্কে সচেতন ও এর প্রয়োগ নিশ্চত করতে হবে।</td></tr>
<tr><td>বাল্যবিবাহ</td><td>আলোচনা, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। শিক্ষক এ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্য একটি ছক প্রদর্শন করবেন। যেমন গত বছর শিবরামপুর গ্রামে ৬টি বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিচে তার ছক দেওয়া হলো
<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>কনের বয়স</th><th>বরের বয়স</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১</td><td>১৫</td><td>১৯</td><td></td></tr>
<tr><td>২</td><td>১২</td><td>২২</td><td></td></tr>
<tr><td>৩</td><td>২০</td><td>২৫</td><td></td></tr>
<tr><td>৪</td><td>১৯</td><td>৩০</td><td></td></tr>
<tr><td>৫</td><td>১৭</td><td>২৮</td><td></td></tr>
<tr><td>৬</td><td>২০</td><td>২০</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>বাল্যবিবাহের কারণ ও প্রভাব</td><td>শিক্ষার্থীদের দু'টি দলে ভাগ করে একদল বাল্যবিবাহের কারণ অন্যদল বাল্যবিবাহের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।</td></tr>
<tr><td>বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয়</td><td>শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করবে
বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কী কী করা যায়? শিক্ষক নিজে ও এ সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করবেন।</td></tr>
<tr><td>বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ব্যাখ্যা</td><td>বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি পোস্টার পেপার/স্লাইডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন। "বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন রয়েছে।এ আইনে কোনো মেয়ে ১৮ বছর এবং কোনো ছেলে ২১ বছর পূর্ণ না হলে বিয়ে দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ।" শিক্ষক বড় করে বোর্ডে লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে বলবেন।</td></tr>
</table>

অষ্টম শ্রেণি

অধ্যায় দশম -বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

এপাঠে জীবন দক্ষতার আত্মসচেতন বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে

<table>
<tr><th>বিষয়বস্তু</th><th>অনুশীলন</th></tr>
<tr><td colspan="2">মাদকদ্রব্য</td></tr>
<tr><td>মাদকাসক্তির কারণ</td><td>শিক্ষক বোর্ডে কয়েকটি শব্দ (কৌতূহল, হতাশা, দরিদ্রতা, পারিবারিক অশান্তি, বন্ধু বান্ধবের চাপ, বেকারত্ব, মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনার অভাব ইত্যাদি) লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিবেন। প্রত্যেক দলকে মাদকাসক্তি বিস্তারে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কোনো কোনো কারণ বেশি প্রযোজ্য সেগুলো সনাক্ত করতে বলবেন। প্রত্যেক দলকে তিনটি করে কারণ সম্পর্কে আলচনা করতে বলবেন। আলোচনা শেষে প্রত্যেক দল তাদের যুক্তি উপস্থাপন করে নিচের ছকটি পূরণ করবে। এক্ষেত্রে অন্যদল প্রসঙ্গিক মতামত দিতে চাইলে সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষক এ সম্পর্কে নিজে ব্যাখ্যা দিবেন।
<table>
<tr><th>সামাজিক কারণ</th><th>ব্যক্তিগত কারণ</th></tr>
<tr><td>▪</td><td>▪</td></tr>
<tr><td>▪</td><td>▪</td></tr>
<tr><td>▪</td><td>▪</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>মাদকাসক্তির প্রভাব ও প্রতিকার</td><td>শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করতে মাদকদ্রব্য গ্রহণের পাঁচটি কুফল লিখতে বলবেন যা ভাবলে তুমি কখনো মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে পারবে না। পোস্টার পেপারে লিখে দলনেতার সহতায় উপস্থাপন করবে।</td></tr>
</table>

নবম-দশম শ্রেণি

অধ্যায়-পঞ্চদশ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকার

এপাঠে জীবন দক্ষতার আত্মসচেতন, সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

<table>
<tr><th>বিষয়বস্তু</th><th>অনুশীলন</th></tr>
<tr><td colspan="2">ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা, এইচআইভি এবং এইডস</td></tr>
<tr><td>এইচআইভির ধারণা</td><td>শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবেন-এইচআইভি কী? আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে এইচআইভি-এর নিরাময়ের কোনো চিকিৎসা বা প্রতিষেধক আজও আবিষ্কৃত হয়নি।তাই মৃতুই এর একমাত্র পরিণতি।</td></tr>
<tr><td>এইডসের কারণ, বাংলাদেশ ও বিশ্বে এইচআইভি / এইডস পরিস্থিতি</td><td>শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে নিম্নলিখিত কর্ম পত্রটি আলোচনা করে দলনেতার সাহায্যে উপস্থাপন করাবেন।
"ইদানিং তোমরা বিভিন্ন মাধ্যম যেমন রেডিও, টেলিভিশন,খবরের কাগজ ইত্যাদিতে প্রায়ই এইচআইভি এবং এইডস সম্পর্কে শুনে এবং দেখে থাকো। পৃথিবীতে এইচআইভি এবং এইডস ছাড়াও ক্যান্সার, হৃদরোগ, হেপাটাইটিস ইত্যাদি মারাত্মক রোগ রয়েছে। কিন্তু এইচআইভি এবং এইডস সম্পর্কে আলোচনা, প্রচার এবং লেখালেখির পরিমাণ বেশি। এর কারণ কী বলে তুমি মনে কর?"

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে বর্তমানে বাংলাদেশের পরিস্থিতিও শিক্ষক তুলে ধরবেন।</td></tr>
</table>

বিষয়বস্তু	অনুশীলন
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা, এইচআইভি এবং এইডস	
এইডস-এর প্রভাব	শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এইডস এর প্রভাব শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীদের চারটি দলে ভাগ করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখে মার্কেট পেস এর মাধ্যমে উপস্থাপন করাবেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের দিয়ে এইচআইভি এবং এইডস-এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের উপর একটি জারিগঠন রচনা করে উপস্থাপন করাবেন।
বাংলাদেশে এইডস প্রতিরোধের উপায়	শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবেন- বাংলাদেশে এইডস প্রতিরোধের উপায়সমূহ কী কী? শিক্ষার্থীরা উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবে। এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর লিখতে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন। শিক্ষক পরবর্তীতে বাংলাদেশে এইডস প্রতিরোধে সরকারের পদক্ষেপগুলো শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।
এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আমাদের করণীয়	শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং এ বিষয়ে কীভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় তা বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে প্রত্যেককে যদি কোনো পরিচিত ব্যক্তি এইডস এ আক্রান্ত হয় তবে তার প্রতি কোনো ধরনের আচরণ করবে তা ভূমকাভিনয়ের করে দেখাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবেন। শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে ভাগ করে নিম্নলিখিত ঘটনাটির আলোকে তিন ধরনের ভূমিকায় (শিক্ষক, বাবা-মা/অভিভাবক, অন্য শিক্ষার্থী) নির্ধারণ করে দিবেন। এবার ঘটনাটি পড়ে নিজ নিজ দলের ভূমিকা অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দলে আলোচনা করে লিখবে। " রুবেল নামের একটি ছেলের শরীরে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এইচআইভি ভাইরাস প্রবেশ করে। এ ব্যাপারটি তার বিদ্যালয়ের শিক্ষক জানতে পারে। সহপাঠীদের বাবা-মা তাদের ছেলে মেয়েদের রুবেলের পাশে বসতে নিষেধ করেন। তার সাথে খেলতে নিষেধ করেন, এমনকি রুবেল যে পায়খানা ব্যবহার করে সেটা ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। ফলে সে একা হয়ে যায়। এমনকি এক সময় তাকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ে আসতেও নিষেধ করে দেয়। " -এ অবস্থায় তারা কী ভাবছে? - রুবেলের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ কী আদৌ এইচআইভি সংক্রমণ বন্ধ হবে? -এই ঘটনার প্রভাব কী হতে পারে? -এর সমাধান কী হতে পারে? এ পরিস্থিতিতে রুবেলের প্রতি কীভাবে সহমর্মিতা প্রকাশ করবে? আলোচনা শেষে প্রত্যেক দল ফলাফল উপস্থাপন করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবেন।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জীবন দক্ষতা কী ?
২. জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ কী কী ?
৩. জীবন দক্ষতাসমূহ কী কী ?
৪. জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য গুলো কী কী ?
৫. আত্মসচেতনতা মূলক দক্ষতা কী ?
৬. যোগাযোগ দক্ষতা বলতে কী বোঝায় ?
৭. সপ্তম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের দক্ষতাটি কী ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জীবন দক্ষতা শিক্ষা বলতে কী বোঝায় ?
২. জীবন দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
৩. জীবন দক্ষতা তৈরিতে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব লিখুন।
৪. জাতিসংঘ কর্তৃক সনাক্তকৃত দশটি জীবনদক্ষতা লিখুন।
৫. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা শিক্ষা কেন প্রয়োজন ব্যাখ্যা করুন।
৬. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার অবস্থান নির্ণয় করুন।
৭. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা, এইচআইভি এবং এইডস বিষয়বস্তুটি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের কোনো শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং জীবন দক্ষতার ভিত্তিতে এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।

তথ্যসূত্র

১. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার শিক্ষক নির্দেশিকা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ঢাকা।
২. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ষষ্ঠ শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, সপ্তম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৪. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, অষ্টম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৫. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৬. ইন্টারনেট
৭. জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক প্রশিক্ষকদের জন্য) (২০১৩), ইউনিসেফ।
৮. পৌরনীতি ও সুশাসন (২০১৬) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক সিপিডি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, টিকিউআই-২, ঢাকা।
৯. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানবৃন্দের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম, মাউশি, ঢাকা ।

ইউনিট ৮ : প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মূল্যায়ন

যে কোনো শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মূল্যায়ন। অধিকাংশ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। সুতরাং শিক্ষক হিসেবে আপনি যদি মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারেন, সেটা আপনার পেশাগত সমৃদ্ধির পথকে প্রসারিত করবে। এর জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনাকে যেমন দক্ষ হতে হবে, তেমনি নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আপনাকে হতে হবে নিরপেক্ষ। আলোচ্য ইউনিটে আমরা মূল্যায়নের প্রাথমিক ধারণা, ধারাবাহিক মূল্যযাচাই, ক্ষেত্রসমূহ ও নম্বরবণ্টন-এর প্রয়োগ অনুশীলন, বিষয়বস্তু অনুযায়ী সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিকরণ এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন তৈরিকরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো কয়েকটি পাঠে বিভক্ত করে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

৮.১ মূল্যায়নের প্রাথমিক ধারণা
৮.২ ধারাবাহিক, মূল্য যাচাই, ক্ষেত্রসমূহ ও নম্বর বণ্টন এর প্রয়োগ অনুশীলন
৮.৩ বিষয়বস্তু অনুযায়ী সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিকরণ
৮.৪ বিষয়বস্তু অনুযায়ী বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তৈরিকরণ
৮.৫ সেমিস্টার পরীক্ষার প্রশ্নের ধরণ ও মানবণ্টন

৮.১ মূল্যায়নের প্রাথমিক ধারণা

মূল্যায়ন (Evaluation)

শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির আচরণের সার্বিক বিকাশ ও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন শ্রেণিতে, বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তথা ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ বা পরিবর্তন কতটা সাধিত হয়েছে তার জন্য প্রয়োজন মূলত মূল্যায়ন। অন্যভাবে বলা যায়, মূল্যায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থীরা কতটুকু এগিয়েছে তা নিরূপিত করা। মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়াও বটে। শ্রেণি শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়।

মূল্যায়ন (Evaluation) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কিছুর উপর মূল্য আরোপ করা। কোনো বিষয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা নিরূপণের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিচার বিশ্লেষণও প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন বলে।
মূল্যায়ন চারটি বিষয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এগুলো হলো-

- শিখনের উদ্দেশ্য: শিক্ষার সংজ্ঞায়িত লক্ষ্য
- শিখনের বিষয়বস্তু: শিক্ষণীয় বিষয়
- শিখন অভিজ্ঞতা, পরীক্ষণ, আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন ইত্যাদি।
- মূল্যায়ন কৌশল ও উপকরণ: লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

মূল্যায়নের প্রকারভেদ

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধানত দুই ধরণের মূল্যায়ন হয়ে থাকে।

১. গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative Assessment)
২. সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summative Assessment)

গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative Assessment)

কোন একটি বিষয় বা কোর্সের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য অব্যাহতভাবে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে গাঠনিক মূল্যায়ন বলে। শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণত কোনো কোর্স বা কার্য এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গাঠনিক মূল্যায়ন চলতে থাকে। শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বা অগ্রগতি জানা যায় গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে। গাঠনিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক পরবর্তীতে শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

উদাহরণের মাধ্যমে গাঠনিক মূল্যায়ন বিষয়টি তুলে ধরা হলো-রহিম ৭ম শ্রেণির একজন ছাত্র। শিক্ষক কিছুদিন পড়ানোর পর শ্রেণি পরীক্ষা নিলেন বাংলা বিষয়ে। ১৫ নম্বরের শ্রেণি পরীক্ষায় রহিম সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখলেও অধিকাংশ বানান ভুল লিখেছে। পরবর্তীতে শিক্ষক রহিমকে যেমন বানানের ব্যাপারে সতর্ক হতে বললেন, তেমনি শ্রেণিতে পাঠদানের সময় শিক্ষকও বানানের প্রতি গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন। পরবর্তী শ্রেণি পরীক্ষায় রহিম খুব কম বানান ভুল লিখল। সুতরাং আমরা বলতে পারি শ্রেণি পরীক্ষা হলো গাঠনিক মূল্যায়নের একটি উপায় যেখানে মূল্যায়নের ফলাবর্তন বা ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের উত্তরোত্তর উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। তবে মূল্যায়নের সবক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির বিষয়টি শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়নের উপায়সমূহ হলো–

- শ্রেণির কাজের মাধ্যমে
- বাড়ির কাজের মাধ্যমে
- শ্রেণি পরীক্ষার মাধ্যমে
- সাপ্তাহিক পরীক্ষার মাধ্যমে
- পাক্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে
- মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে
- ষান্মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে
- অর্পিত কাজের মাধ্যমে
- সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে
- গৃহ পরিদর্শণের মাধ্যমে
- হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে
- দলীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে (দলীয় কাজ উপস্থাপনের মাধ্যমে)।

সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summative Assessment)

শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট স্তর বা শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে উক্ত কার্যক্রমের ফলাফল, প্রভাব ও অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণের জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন বলে। এ ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণিতে বা স্তরে উত্তরণের জন্য সাফল্যের মাপকাঠির আলোকে গ্রেড বা সনদ প্রদান করা হয়। যেমন- অষ্টম শ্রেণি শেষে যে জেএসসি পরীক্ষা নেওয়া হয় এটা এক ধরনের সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন। তাছাড়া বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষাও এক ধরণের সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন। সাধারণত সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়নের ফিডব্যাক বা ফলাবর্তনের সুযোগ থাকে না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়–মিতুল জেএসসি পরীক্ষা দিয়ে A গ্রেড †পল। মিতুল এবং মিতুলের বাবা মায়ের স্বপ্ন ছিল সে A+ পাবে। মিতুল এবং মিতুলের বাবা মায়ের মন খারাপ হলেও তাদের জানার সুযোগ নেই কী কী কারণে মিতুলের A+ পাওয়া হয়নি। কারণ এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক প্রদান করা হয় না। অর্থাৎ সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন হলো শিক্ষার্থীদের নিজেদের অবস্থা বা যোগ্যতা প্রমাণ করার মূল্যায়ন।

সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়নের উপায়গুলো হলো-

- রচনামূলক অভীক্ষা
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা
- মৌখিক অভীক্ষা
- ব্যবহারিক অভীক্ষা
- মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা

৮.২ ধারাবাহিক মূল্য যাচাই, ক্ষেত্রসমূহ ও নম্বরবণ্টন-এর প্রয়োগ অনুশীলন

ধারাবাহিক মূল্য যাচাই

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্য যাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সঠিক উন্নতির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এর সাহায্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, অভ্যাস, প্রবণতা, চিন্তাধারা সম্পর্কে জানা যায়। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, চারিত্রিক ব্যক্তিত্বের গতিশীল পরিবর্তন ইত্যাদির পরিমাপ এবং শিক্ষণে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয়। ব্যক্তির আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর এই পরিবর্তন কতটুকু সাধিত হয়েছে তা জানতে হলে মূল্য যাচাই দরকার। এটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল করে। মূলত শিখন ও শিক্ষণের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে মূল্য যাচাই বুঝায়। বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন কৌশল, নির্ধারিত কাজ, প্রজেক্ট প্রদান বা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যযাচাই করা হয়। মূল্যযাচাইয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান পরিধি ও গুণাগুণ বিচার করা নয় বরং জ্ঞানার্জনে তাদের উৎসাহিত করা। কিভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতার পরিধি আরো বাড়ানো যায় ধারাবাহিক মূল্য যাচাই বা নিরূপণ হলো তারই একটি প্রক্রিয়া।

ধারাবাহিক মূল্য যাচাই এর বিবেচ্য দিক

- নিয়মিত হাজিরা
- যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করা
- সুন্দর হাতের লেখা
- উচ্চ চিন্তন ক্ষমতা
- সহ-পাঠক্রমিক কাজে অংশগ্রহণ
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
- মৌখিক প্রশ্ন
- পরীক্ষার নম্বর
- বিভিন্ন আচরণিক দক্ষতা
- শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ।

মূল্য যাচাই কার্যকর করতে লক্ষ্যণীয় দিক

- পরিবেশ বান্ধব শিক্ষণ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি
- নিয়মিত শ্রেণি অভীক্ষার প্রয়োগ
- সতীর্থ শিক্ষণ জোরদারকরণ।
- দলগতভাবে সমস্যার সমাধানকরণ
- অংশগ্রহণ পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনা করা
- শিক্ষার্থী উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ
- মৌখিক উপস্থাপন নিশ্চিতকরণ।

মূল্য যাচাইয়ের নির্ণায়ক (হাতিয়ার)

- কাগজে-কলমে পরীক্ষা
- বিশেষ পরীক্ষা
- শারীরিক পরীক্ষা
- কেস স্টাডি
- শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দ্রব্য
- কর্ম অভিজ্ঞতা
- শিক্ষার্থীর নিজস্ব রচনা ও সাহিত্য
- যাচাই তালিকা
- ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড
- বিশেষ ঘটনার রেকর্ড
- স্ব-মূল্যায়ন
- শারীরিক ইতিহাস
- পর্যবেক্ষণ
- উপস্থিতি রেকর্ড
- পরিবার থেকে প্রাপ্ত তথ্য
- সাক্ষাৎকার
- প্রশ্নোত্তর
- শিক্ষার্থীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা
- পারিবারিক সম্পর্ক
- আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া
- শ্রেণি রেকর্ড।

ধারাবাহিক মূল্য যাচাই, ক্ষেত্রসমূহ ও নম্বরবণ্টন-এর প্রয়োগ অনুশীলন

জ্ঞানের তিন ধরণের ক্ষেত্র রয়েছে যে ক্ষেত্রগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণের বা জ্ঞানের পরিধির পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিকভাবে যত প্রকার বিকাশ ঘটুক না কেন সবই জ্ঞানের এই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য জ্ঞানের তিনটি ক্ষেত্রের বিকাশই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং একজন আদর্শ ও কার্যকর শিক্ষক হিসেবে জ্ঞানের তিনটি ক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ এবং বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সময় এই তিনটি ক্ষেত্র বিবেচনায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগে নম্বর বণ্টন-এর ক্ষেত্রে জ্ঞানের এ তিনটি ক্ষেত্রের সমন্বয় ঘটানো অত্যন্ত জরুরি। ক্ষেত্রগুলো হলো-

১) জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র বা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)
২) আবেগিক বা অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র (Affective Domain)
৩) মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)

শিক্ষার যেসব উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর জ্ঞানের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের পরিধিকে প্রসারিত করে সেগুলো জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র বা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের আবার ৬ টি উপক্ষেত্র রয়েছে। উপক্ষেত্রগুলো হলো- জ্ঞান (Knowledge), অনুধাবণ (Comprehensive), প্রয়োগ (Application), বিশ্লেষণ(Analysis), সংশ্লেষণ (Synthesis), মূল্যায়ন (Evaluation)। শিক্ষক হিসেবে আপনি যখন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করবেন তখন জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের উপক্ষেত্রগুলো যথাসম্ভব বিবেচনা করার চেষ্টা করবেন। উদাহরণ হিসেবে আপনি যদি রচনামূলক অভীক্ষার বিভিন্ন প্রশ্নে জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের উপক্ষেত্রগুলো সমন্বয় করার চেষ্টা করুন তাহলে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার প্রবণতা কমবে এবং অন্যান্য দক্ষতা যেমন চিন্তাশীলতা, বিশ্লেষণমূলক ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে।

আবেগিক ক্ষেত্র (Affective Domain)

জ্ঞানের এই ক্ষেত্রটি শিক্ষার্থীর আবেগ অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত। শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, আগ্রহ, অনুভূতি, প্রশংসা, সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ, অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতার বিকাশ সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলো জ্ঞানের আবেগিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষকের কাজ শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন নয়, বরং শিক্ষার্থীর আবেগিক বিকাশ কতটুকু হচ্ছে তা মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ আবেগিক বিকাশে সহায়তা করা। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের আবেগিক ক্ষেত্রের মূল্যায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মনোপেশিজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

জ্ঞানের এই ক্ষেত্রটি শিক্ষার্থীর মন ও দেহের সাথে সম্পৃক্ত। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের যে পরিবর্তন ঘটবে সেটা হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করাই হলো মনোপেশিজ ক্ষেত্রের মূল কথা। এক্ষেত্রে শিখনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মন ও শরীরের বিভিন্ন পেশী একসাথে কাজ করে। জ্ঞানের এই ক্ষেত্রটির সাথে শিক্ষার্থীর দক্ষতার বিকাশ গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সাধারণত হাতে কলমে কাজ তথা বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোপেশীজ ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের মনোপেশীজ ক্ষেত্রের বিকাশ এবং এই ক্ষেত্রের মূল্যায়নের ব্যাপারে শিক্ষক হিসেবে আপনার সজাগ থাকা দরকার। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিয়ে এ ধরনের বিকাশ ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

৮.৩ বিষয়বস্তু অনুযায়ী সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিকরণ

বর্তমান সময়ে শিক্ষক হিসেবে আপনার জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন অতি পরিচিত একটি বিষয়। তারপরও প্রচলিত সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে এখানে ধারণা প্রদান করা হলো। একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমানে আমাদের দেশে সৃজনশীল প্রশ্নের যে ধারণা ব্যবহার করা হচ্ছে এটাই সৃজনশীল প্রশ্নের একমাত্র ধারণা নয়। সৃজনশীল প্রশ্ন আরও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের সাধারণত চারটি স্তর থাকে। স্তরগুলো হলো-

ক) জ্ঞান (Knowledge)	(১ নম্বর)
খ) বুঝা/ উপলব্ধি (Comprehensive/Understanding)	(২ নম্বর)
গ) প্রয়োগ (Application)	(৩ নম্বর)
ঘ) উচ্চতর চিন্তন (Higher Order Thinking)	(৪ নম্বর)

জ্ঞান (Knowledge)

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশ (ক) হলো জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন। এ ধরনের প্রশ্ন সহজ ও নিতান্তই মুখস্থ নির্ভর। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও তা অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় । সাধারণত কোনো কিছু স্মরণ বা মনে করতে বলা হয়। "কে, কি, কোথায়, কখন, কয়টি, কার" ইত্যাদি শব্দ সাধারণত এই স্তরের প্রশ্নে ব্যবহার করা হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

বুঝা/ উপলব্ধি (Comprehensive/Understanding)

সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। কোনো কিছু বর্ণনা, ব্যাখ্যা করা, তুলনা করা ইত্যাদি বিষয় সৃজনশীল প্রশ্নের এই স্তরের সাথে সম্পৃক্ত। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেওয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রয়োগ (Application)

সৃজনশীল প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হলো প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। এখানে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান দক্ষতা, নীতিকে ব্যবহার করতে বলা হয়। সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল । অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে। পাঠ্যপুস্তকের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

উচ্চতর চিন্তন (Higher Order Thinking)

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের এই অংশে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির প্রখরতা ও যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করা হয়। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্দীপকে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণের, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মূল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। শিক্ষাক্রম উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য। প্রশ্নের চতুর্থ অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

উদ্দীপক না পড়ে বা না দেখেও প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব। তবে উদ্দীপকের সাথে প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের একটি পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। যে বিষয় বা বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক তৈরি করা হয় সে বিষয় বা বিষয়সমূহের আলোকেই 'ক' ও 'খ' প্রশ্নসমূহ করা হয়। কিন্তু 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর উদ্দীপক বিবেচনায় না এনে করা সম্ভব হবে না।

সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক প্রণয়নে নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে সচেষ্ট হতে হবে-

- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে
- পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, রেডিও , টেলিভিশনের প্রচারিত তথ্য বা ঘটনা, প্রামান্য চিত্র,
- বিজ্ঞাপন উদ্দীপকের উৎস হতে পারে
- উদ্দীপকের ভাষা হবে আর্কষণীয়, সহজে বোধগম্য, সংক্ষিপ্ত
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ / বাক্য উদ্দীপকে থাকবেনা
- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে
- প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্দীপকে থাকবে
- একটি প্রশ্নের উত্তর / উত্তরের ইঙ্গিত অন্য কোনো প্রশ্নের উদ্দীপকে থাকবে না
- ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনে এমন বিষয় উদ্দীপকে উল্লেখকরা যাবে না
- উদ্দীপক হবে মৌলিক, অথাৎ পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না
- পাঠ্যপুস্তকে একাধিক অধ্যায়ের সমন্বয় করেও উদ্দীপক তৈরি করা যায়
- দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে

সৃজনশীল নমুনা প্রশ্ন

জামিল 'ক' নামক দেশের নাগরিক। তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশে ব্যক্তিগত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় না। জামিলের বাবা উক্ত 'ক' দেশে যে কারখানায় কাজ করতেন তার প্রাপ্য মজুরির একটি অংশ প্রয়োজন অনুসারে তাকে দেয়া হতো। সাম্প্রতিক কালে জামিল 'খ' নামক দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন। তিনি এক লক্ষ ডলার খরচ করে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি তার আয় দিয়ে আরও একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।

ক. সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ? ১
খ. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জামিলের 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার ধরণটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'খ' দেশে যে ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত তার সাথে 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থার পার্থক্য রয়েছে- যুক্তি দাও। ৪

৮.৪ বিষয়বস্তু অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্ন তৈরিকরণ

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন, প্রয়োগ, ফল নির্ণয়, নম্বর প্রদান এমনকি উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রেও পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অভিমত, পছন্দ প্রভৃতি মুক্ত থাকে। প্রশ্নটি সকল দিক থেকেই ব্যক্তি নিরপেক্ষ হবে। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কোনো বিবরণ বা ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ থাকে না। শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত উত্তরমালা থেকে উত্তর প্রদান করতে হয়। সৃজনশীল প্রশ্নের ন্যায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন তৈরিকরণে ৪টি স্তরকে প্রাধান্য দিতে হয়। বহুনির্বাচনি প্রশ্নের মধ্যে থাকে সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন। যথেষ্ট চিন্তা করে বহুপদী সমাপ্তিসূচক ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। কারণ বহুপদী সমাপ্তিসূচক ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সরাসরি বই থেকে নেওয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার ব্যবহার করতে হয়। ফলে বহুপদী সমাপ্তিসূচক ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দিতে সময়ও বেশি লাগে।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উদ্দীপক প্রণয়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্নে একটি উদ্দীপক বা নির্দেশনা থাকে এবং তার ভিত্তিতে ৪টি বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর এবং বাকি ৩টি বিক্ষেপক। এ বিক্ষেপকগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীর সবগুলো বিক্ষেপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উদ্দীপকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে। এর ভাষা হবে সহজ, অর্থপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত। উদ্দীপক অপ্রাসংগিক উপাদানমুক্ত হবে। উদ্দীপক 'হ্যাঁ' বোধক হতে হবে (আর 'না' বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)। উদ্দীপকে এমন কোনো ইঙ্গিত থাকবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।

বিকল্প উত্তর প্রণয়ন

বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সংগে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হবে। প্রতিটি বিকল্প ন্যূনতম ৫%পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। বিকল্পসমূহ সংখ্যাবাচক হলে ঊর্ধ্বানুসার অথবা নিম্নানুসারে সাজাতে হবে। এলোমেলোভাবে সাজানো পরিহার করতে হবে। বিকল্পসমূহের দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়।Mutually exclusive/Mutually inclusive সম্ভব পরিহার করতে হবে।

সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সাধারণত শুরু হয় প্রশ্নের আকারে। কখনো কখনো অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়েও প্রশ্ন শুরু হতে পারে। বাক্যের শেষে বিকল্পসমূহকে পৃথকভাবে যুক্ত করলে এটি একটি অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিণত হয়। এ ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে জ্ঞান স্তর পরিমাপ করা হয়। এখানে ৪টি বিকল্প উত্তর থাকে, যার মধ্যে সঠিক উত্তর থাকে ১টি।

যেমন–

১. পাল রাজারা কোনো দেশের অধিবাসী ছিলেন?

ক) তুরস্কের গ) ইরানের

খ) দক্ষিণ-ভারতের ঘ) বাংলাদেশের

২. ২০০৯–২০১০ সালের জিডিপিতে বাংলাদেশের মৎস্য খাতের অবদান কত শতাংশ ছিল?

ক) ৪.৫১ গ) ১৪.৩০

খ) ১০.৭ ঘ) ২৯.৯৫

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

একটি অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে এধরণের প্রশ্নের সূচনা করা হয়। এর পর তিনটি বিবৃতি বা তথ্য থাকে। প্রতিটি বিবৃতি/তথ্যকে অসম্পূর্ণ বাক্যের শেষে যুক্ত করলে এটি একটি অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিণত হয়। ৩টি তথ্য/বিবৃতিকে বিন্যাস করে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। এখানে ১টি/২টি/৩টি সঠিক উত্তর হতে পারে। এ ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে জ্ঞান স্তর পরিমাপ করা হয় না, অনুধাবন স্তর থেকে উচ্চতর স্তরের দক্ষতার প্রশ্নের পরিমাপ করা হয়। যেমন–

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ–

I. লীগ অব নেশনস এর ব্যর্থতা

II. জাতিপুঞ্জ ভূক্ত দেশের স্বার্থপরতা

III. জাতিপুঞ্জ যুদ্ধকে প্রতিহত করতে পারেনি

নিচের কোনোটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

২. গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপায়-

i. কৃষি কাজে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার
ii. কৃষি জমির সঠিক ব্যবহার
iii. নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি

নিচের কোনোটি সঠিক?

(ক) i (গ) iii
(খ) ii (ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহূনির্বাচনী প্রশ্ন একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/সূচনা বক্তব্য দিয়ে শুরু হবে । উদ্দীপক হতে পারে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (৩-৫ লাইন) অথবা লেখচিত্র অথবা চার্ট বা সারণি কিংবা কোনো চিত্র উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে বিশ্লেষণ, যুক্তি প্রদর্শন, সিদ্ধান্তগ্রহণ, মূল্যায়ন করতে পারবে। উদ্দীপক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সকল তথ্য সরবরাহ করবে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর উদ্দীপকে থাকবে না। এ ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার স্তর যাচাই করা হয়। এ ধরনের বহূনির্বানী প্রশ্নে একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/তথ্য থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়, প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে।

যেমন-

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১-২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সরাসরি জনগনের ভোটে নির্বাচিত A রাষ্টের রাষ্ট্রপতি তার মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের নিয়োগ দেন। B

রাষ্ট্রের একজন মন্ত্রি পদত্যাগ করলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি নতুন একজন মন্ত্রি নিয়োগ দেন।

১. অনুচ্ছেদের বর্ণনামতে B রাষ্টের সরকার ব্যবস্থা কোনো ধরনের?

ক) এককেন্দ্রিক গ) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত

খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ) রাষ্ট্রপতি শাসিত

২. অনুচ্ছেদে বর্ণিত A ও B রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে-

i. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়

ii. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়

iii. মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতায়

নিচের কোনোটি সঠিক?

(ক) i (গ) iiও iii

(খ) ii (ঘ) i, ii ও iii

৮.৫ সেমিস্টার পরীক্ষার প্রশ্নের ধরণে ও মানবণ্টন

বি.এড শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত অর্থনীতিতে উন্নীত করার লক্ষ্যে সকারের প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করার মাধ্যমেই তা সম্ভব, তাই সরকার মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বমহলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। মানুষকে সময়ের চাহিদাভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা মোকাবিলায় সক্ষম করার জন্য শিক্ষাক্রম পরিমার্জনর অপরিহার্য। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষক, শিক্ষা, শিক্ষাক্রমেরও গুণগত পরিবর্তন ও পরিমার্জন জরুরি হয়ে পড়ে। সেই লক্ষ্যে গণপ্রজাতী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (TQI-SEP-II) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক পর্যায়ে 'শিক্ষক শিক্ষা' বর্তমান শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গঠিত কমিটিসমুহ প্রচলিত শিক্ষাক্রম দীর্ঘ সময় বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রতিটি ধাপ যথাযথভাবে অনুসরণ করে শিক্ষক, শিক্ষা, শিক্ষাক্রমের বর্তমান পরিমার্জিত ও পূর্ণাঙ্গ অবয়বটি তৈরি করেন। পরিমার্জিত এ শিক্ষাক্রমটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন দক্ষ প্রশিক্ষিত শিক্ষক তৈরি সহজ হবে তেমনি মাধ্যমিক পর্যায়ে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে সব মৌলিক নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগ বিধি, পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার ও জাতীয় শিক্ষক শিক্ষার প্রমিতমান ইত্যাদি সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় রেখে বি এড শিক্ষাক্রমের পরিমার্জিত করা হয়। বর্তমান প্রচলিত বিএড শিক্ষাক্রম ২০০৬ থেকে চালু আছে। এতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর দৃষ্টিভঙ্গি, মাধ্যমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০১২-এর চাহিদা, তথ্য প্রযুক্তির আমূল পরিবর্তন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত নেই। এসব আঙ্গিক শিক্ষাক্রমে সংযোজন এ উদ্যোগের লক্ষ্যে চলমান একবছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সকে দুটি সেমিস্টারে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম সেমিস্টারের ব্যাপ্তিকাল-জানুয়ারি থেকে জুন এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারের ব্যাপ্তিকাল জুলাই থেকে ডিসেম্বর। প্রশিক্ষণের ফলাফল বিভাগের পরিবর্তে লেটার গ্রেডে প্রকাশ করা হবে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বি. এড কোর্সের সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বি.এড শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য

- যে সব বিশ্ববিদ্যালয়-ডিগ্রিধারি ভবিষ্যতে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার জন্য প্রস্তুত হতে চান তাদের জন্য চাকরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- মাধ্যমিক স্তরের মানসম্মত শিখন-শেখানোর চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাপকের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে পেশাগত ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ করে তোলা
- মাধ্যমিক স্তরের শিখন-শেখানোর নবতর ধারণা ও পদ্ধতি, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও কনটেন্ট শিখন সমন্বিত করে শিখন প্রণালীর আধুনিকায়ন ও গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধন করা

বি.এড শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, মানসিক পরিণমন ও ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার উন্নয়ন
- তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়বস্তু সমন্বিতভাবে শিখন-শেখানোর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণপাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- বাংলাদেশের বর্তমান সমাজব্যবস্থার পটভূমিতে শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধি
- মানবসম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সমকালীন উদ্দেশ্য ও নীতির সমন্বয় সাধনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করে তোলা
- শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে নবতর জ্ঞান, উপলব্ধি এবং সমকালীন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা
- শিখন-শেখানোর গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তি সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষার্থীকে দক্ষ শিক্ষক হিসেবে প্রস্তুত করা
- বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সহকর্মী ও অন্যান্যদের প্রতি পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনে সমর্থ করে তোলা
- শিক্ষক হিসেবে নিজের কৃতিত্ব মূল্যায়ন, বিদ্যালয়ের চলমান পরিবেশ উন্নয়নে স্বচেষ্ট থাকা এবং সহকর্মীর প্রয়োজনে সর্বদা সংবেদনশীল আচরণে উদ্বুদ্ধ করা
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ বিষয়ক দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনে সমর্থ করে তোলা
- কনটেন্ট শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মাধ্যমে জেন্ডার, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য নির্বিশেষে সকলের জন্য সহায়ক শিখন পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা

বি.এড কোর্সের বিষয়াবলি

শিক্ষা বিষয়াবলি

- মাধ্যমিক শিক্ষা
- শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশল
- শিখন ও শিখন যাচাই
- শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- একীভূত শিক্ষা
- শিক্ষা গবেষণা

বি.এড কোর্সের শিক্ষণ বিষয়াবলি

মানবিক শাখা

বাংলা শিক্ষণ, ইংরেজি শিক্ষণ, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা শিক্ষণ, অর্থনীতি শিক্ষণ, পৌরনীতি ও নাগরিকতা শিক্ষণ, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় শিক্ষণ, ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষণ, এডভান্স আইসিটি শিক্ষণ

বিজ্ঞান শাখা

গণিত শিক্ষণ, পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষণ, রসায়ন শিক্ষণ, জীববিজ্ঞান শিক্ষণ, এ্যাডভান্স আইসিটি শিক্ষণ

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণ, হিসাববিজ্ঞান শিক্ষণ, অর্থায়ন ও ব্যাংকিং শিক্ষণ, এডভান্স আইসিটি শিক্ষণ

নৈর্বাচনিক বিষয়াবলি

প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, চারুও কারুকলা শিক্ষণ, শারীরিক শিক্ষা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা শিক্ষণ, কৃষি শিক্ষা শিক্ষণ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি শিক্ষণ, ইসলাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষণ, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষণ, বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষণ, খ্রিস্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষণ

বি.এড কোর্সের মূল্যায়ন পদ্ধতি

১. সেমিস্টার মূল্যায়ন
   - প্রথম সেমিস্টার - ১জানুয়ারি-৩০জুন - মোট কর্মদিবস ১৮২ দিন
   - দ্বিতীয় সেমিস্টার -১জুলাই-৩১ডিসেম্বর -মোট কর্মদিবস ১৮৩ দিন
২. অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন
   - ১ম ইনকোর্স
   - ২য় ইনকোর্স
৩. বহিঃপরীক্ষা
৪. চূড়ান্তপাঠদান
৫. মৌখিক পরীক্ষা
৬. কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা

বি.এড কোর্সের সেমিস্টারভিত্তিক বিষয়, ক্রেডিট ও ক্রেডিট ঘন্টা বিভাজন

প্রথম সেমিস্টার ১ জানুয়ারি- ৩০ জুন	ক্রেডিট	ক্রেডিট ঘন্টা *	দ্বিতীয় সেমিস্টার ১ জুলাই- ৩১ ডিসেম্বর	ক্রেডিট	ক্রেডিট ঘন্টা
মাধ্যমিক শিক্ষা	৪	৪০	কনটেন্ট শিক্ষা	৪	৪০
শিখন- শেখানো দক্ষতা ও কৌশল	৪	৪০	শিক্ষায় গবেষণা	৪	৪০
শিখন ও শিখনযাচাই	৪	৪০	নৈর্বাচনিক বিষয় (যে কোনো ১টি)	৩	৩০
শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৪	৪০	অনুশীলন পাঠদান ২ (৮ সপ্তাহ) *** (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ শ্রেণি পাঠদান)	১৬	১৬০
২টি শিক্ষণ বিষয়াবলি (৪২)	৮	৮০	কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা	২	২০
পাঠদান অনুশীলন-১ (৪ সপ্তাহ)	৬	৬০	মৌখিক পরীক্ষা	১	১০

* ৬০ মিনিট /১ ঘন্টার ১০টি ক্লাস ১ ক্রেডিট হিসেবে গণ্য হবে।

** অনুশীলন পাঠদান ১ ও ২, কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে উল্লিখিত ক্রেডিট হিসাব (১ ক্রেডিট=১০ ঘণ্টা) প্রযোজ্য হবে না।

প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে- যার মধ্যে ৬০ নম্বরের ৩ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হবে এবং ৪০ নম্বরের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা কলেজ কর্তৃক গৃহীত হবে।

বি.এড কোর্সের সেমিস্টার ও সেমিস্টার ফাইনালের নম্বর বিভাজন নিম্নরুপ

বিষয়ের ধরণ	বিষয়ের নাম	নম্বর বণ্টন		
		অভ্যন্তরীণ	বহিঃ	মোট
আব্যশিক বিষয়	মাধ্যমিক শিক্ষা	৪০	৬০	১০০
	শিখন- শেখানো দক্ষতা ও কৌশল	৪০	৬০	১০০
	শিখন ও শিখন যাচাই	৪০	৬০	১০০
	শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৪০	৬০	১০০
	কনটেন্ট শিক্ষা	৪০	৬০	১০০
	শিক্ষা গবেষণা পরিচিতি	৪০	৬০	১০০
পাঠদান অনুশীলন ও মৌখিক	পাঠদান অনুশীলন-১	৫০	-	৫০
	পাঠদান অনুশীলন-২	৫০	৫০	১০০
	মৌখিক পরীক্ষা		৫০	৫০
যে কোনো একটি শাখা থেকে ২টি বিষয় নির্বাচিত করতে হবে				
শিক্ষণ বিষয়াবলি	মানবিক শাখা	৪০+৪০=৮০	৬০+৬০=১২০	২০০
	বাংলা শিক্ষণ			
	ইংরেজি শিক্ষণ			
	বংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা শিক্ষণ			
	পৌরনীতি ও নাগরিকতা শিক্ষণ			
	অর্থনীতি শিক্ষণ			
	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় শিক্ষণ			
	ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষণ			
	এডভান্স আইসিটি শিক্ষণ			
	বিজ্ঞান শাখা			
	গণিত শিক্ষণ			
	পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষণ			
	রসায়ন শিক্ষণ			
	জীববিজ্ঞান শিক্ষণ			
	এডভান্স আইসিটি শিক্ষণ			
	ব্যবসায় শিক্ষা শাখা			
	ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণ			
	হিসাববিজ্ঞান শিক্ষণ			
	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণ			
	এডভান্স আইসিটি শিক্ষণ			

বিষয়ের ধরণ	বিষয়ের নাম	নম্বর বণ্টন		
		অভ্যন্তরীণ	বহিঃ	মোট
নৈর্বাচনিক বিষয়াবলি	প্রাথমিক শিক্ষা	৪০	৬০	১০০
	গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান			
	চারু ও কারুকলা শিক্ষণ			
	শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও ক্রীড়া শিক্ষণ			
	কৃষিশিক্ষা শিক্ষণ			
	গার্হস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষণ			
	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা			
	হিন্দু ও নৈতিক শিক্ষা			
	বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষণ			
	খ্রিস্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষণ			
কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা	৬টি আবশ্যিক বিষয়ের উপর ২ ঘন্টার একটি কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা		১০০	১০০
		৪৬০	৭৪০	১২০০

বি.এড কোর্সের সেমিস্টার পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মানবণ্টন

অভ্যন্তরীণ	নম্বর(৪০)
প্রথম ইনকোর্স	১৫
দ্বিতীয় ইনকোর্স	১৫
অর্পিত কাজ	০৫
উপস্থিতি	০৫

সেমিস্টার ফাইনাল/ চূড়ান্ত পরীক্ষা	নম্বর(৬০)
নৈর্ব্যক্তিক (এমসিকিউ, শূন্যস্থান পূরণ, সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন)	২০
দীর্ঘ উত্তরমূলক প্রশ্ন ও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন	৪০

গ্রেডিং সিস্টেম

গ্রেডিং সিস্টেম নিম্নোক্তভাবে লেটার গ্রেডে গণনা করা হবে		
নম্বরের ব্যাপ্তি	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
৮০% ও এর উপরে	A+	4.00
৭৫%–৭৯%	A	3.75
৭০%–৭৪%	A-	3.50
৬৫%–৬৯%	B+	3.25
৬০%–৬৪%	B	3.00
৫৫%–৫৯%	B-	2.75
৫০%–৫৪%	C+	2.50
৪৫%–৪৯%	C	2.25
৪০%–৪৪%	D	2.00
৪০%-এর নিচে	F	0.00
গ্রেডকে গ্রেড পয়েন্ট এভারেজে রূপান্তর করে কিউমিউলেটিভ গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ		

গ্রেডিং সিস্টেম নিম্নোক্তভাবে লেটার গ্রেডে গণনা করা হবে		
নম্বরের ব্যাপ্তি	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট

কোর্স বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা

সুদর প্রসারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বি.এড শিক্ষাক্রমের এই মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। কোর্সের সেমিস্টার পরীক্ষা একটি নতুন সংযোজন। অতএব, এর বাস্তবায়নে মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রশিক্ষকবৃন্দকে। তাই প্রশিক্ষকবৃন্দকে এই মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। তবে শুধু ধারণাই নয়, এর বাস্তবায়নে কর্মতৎপর ও হতে হবে। বলা হয় 'Teacher is the best method' প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। তাই এর সফলতার জন্য পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষককে শিখন- শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সহায়তা দানের ক্ষেত্রে কার্যকর শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করা প্রয়োজন। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। উপর্যুক্ত শিখন-শেখানো কলাকৌশল ছাড়াও শিক্ষক প্রশিক্ষক পরিবেশ পরিস্থিতি উপর ভিত্তি করে তাঁর চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা মাফিক যে কোনো কলাকৌশল ব্যবহার করতে পারেন।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায় ?
২. গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কিভাবে করা হয় ?
৩. সৃজনশীল প্রশ্নে সাধারণত কয়টি স্তর থাকে এবং কী কী ?
৪. ধারাবাহিক মূল্যযাচাই বলতে কী বোঝায় ?
৫. বি.এড কোর্সের শিক্ষা বিষয়াবলি কী কী ?
৬. বি.এড কোর্সের শিক্ষণ বিষয়াবলি কী কী ?
৭. বি.এড কোর্সের মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহ কী কী ?
৮. প্রতিটি বিষয়ে কত নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ?
৯. অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার নম্বর বিভাজন কীভাবে ?
১০. বহিঃপরীক্ষার নম্বর কত ?
১১. প্রথম সেমিস্টারের সময়কাল উল্লেখ করুন ?
১২. দ্বিতীয় সেমিস্টারের সময়কাল উল্লেখ করুন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগে ও নম্বর বণ্টন-এর ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয়ের সমন্বয় ঘটানো অত্যন্ত জরুরি? বিস্তারিত লিখুন।
২. একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরিপূর্বক তার বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা লিখুন।
৩. বি.এড কোর্স মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৪. বি. এড কোর্সের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৫. বি.এড কোর্সের সেমিস্টার পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মানবণ্টন বর্ণনা করুন।

তথ্যসূত্র

১. আক্তার, মাহবুবা (২০১৫), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা: সংরক্ষণ প্রকাশন
২. আলী, শাহানুর, ও রিয়াদ, আলমগীর হোসেন (২০০৩), মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ, ঢাকা: ন্যাশনাল আইডিয়াল প্রকাশনী।
৩. এহসান, মোঃ আবুল (১৯৯৭), শিক্ষাক্রম উন্নয়ন: নীতি ও পদ্ধতি, ঢাকা: ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি।
৪. তপন, শাহজাহান ও হোসেন, মনিরা (২০১২), শিক্ষা মূল্যায়ন, গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
৫. মালেক, আব্দুল, ও অন্যান্য (২০০৯), শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
৬. হক, মুজাম্মিল ও অন্যান্য (২০১০), শিক্ষানীতি ও শিখন পদ্ধতি, গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
৭. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
৮. বি.এড সিলেবাস ২০১৭
৯. ইন্টারনেট